IFAD
Enabling poor rural people to overcome poverty

Government of the Netherlands

# প্রতিকূল পরিবেশে উপকূলের কৃষি

## (উপকূলীয় কৃষক রিসোর্স বই)

# Coastal Agriculture under Unfavourable Ecosystem

## (Coastal farmers resource book)

প্রকাশনায় ঃ

চর উন্নয়ন ও বসতি স্থাপন প্রকল্প-৪

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর-অংগ

# বাংলাদেশ উপকূলীয় জোনের মানচিত্র

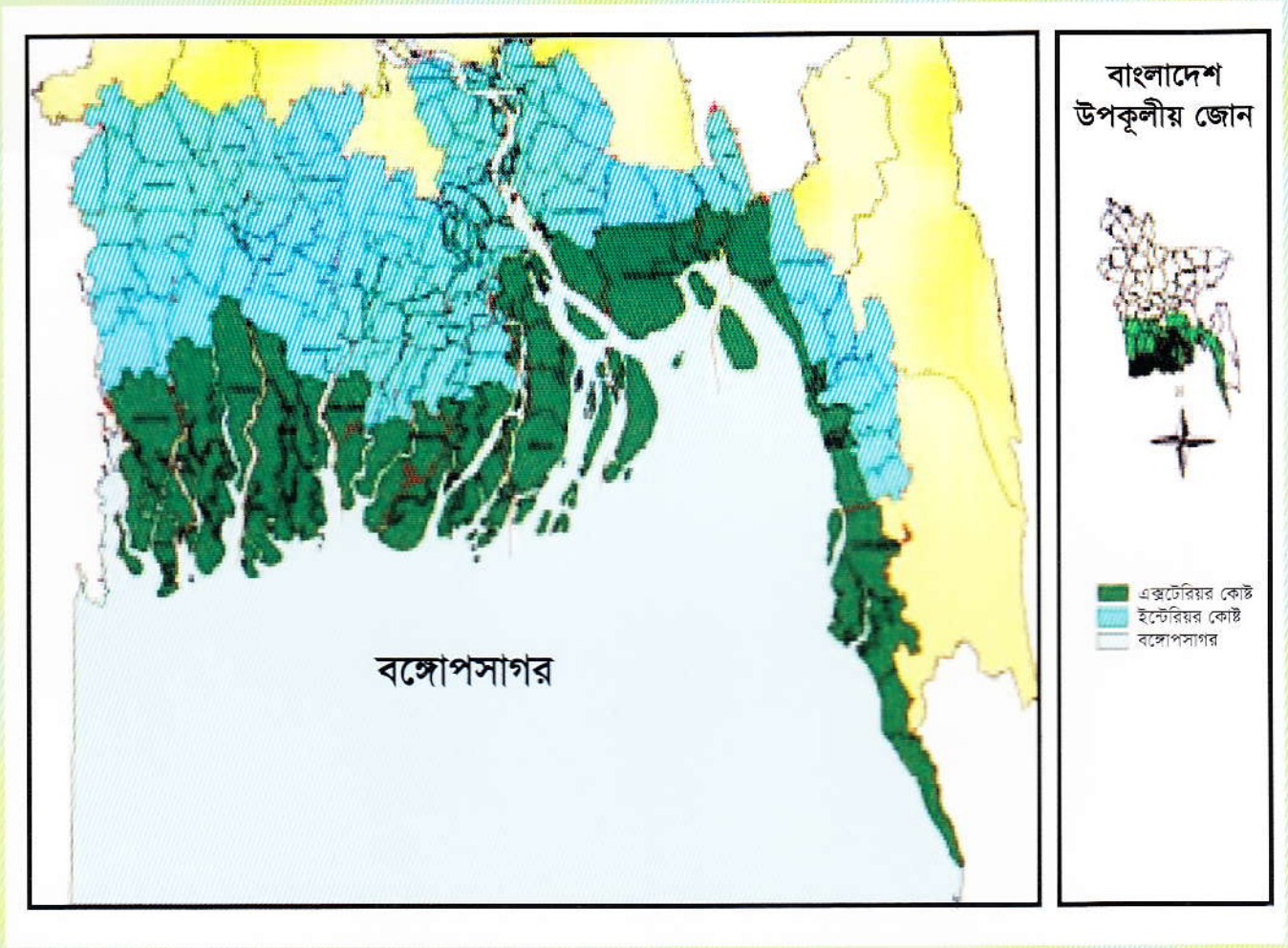

# প্রতিকূল পরিবেশে উপকূলের কৃষি

(উপকূলীয় কৃষক রিসোর্স বই)

# Coastal Agriculture under Unfavourable Ecosystem

(Coastal farmers resource book))


রচনা ও সংকলন : কৃষিবিদ মোঃ বজলুল করিম
কৃষিবিদ মো: রবিউল ইসলাম



১ম প্রকাশকাল : অক্টোবর, ২০১৩

প্রকাশনায় ঃ

**চর উন্নয়ন ও বসতি স্থাপন প্রকল্প-৪**

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর-অংগ

অক্টোবর - ২০১৩

# প্রতিকূল পরিবেশে উপকূলের কৃষি

(উপকূলীয় কৃষক রিসোর্স বই)

# Coastal Agriculture under Unfavourable Ecosystem

(Coastal farmers resource book)

প্রকাশনায় ঃ

**চর উন্নয়ন ও বসতি স্থাপন প্রকল্প-৪**

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর-অংগ

অক্টোবর - ২০১৩

# ভূমিকা

বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চল ঘন বসতিপূর্ণ ও ঝুঁকিপূর্ণ তবে খুবই সম্পদশালী এলাকা। ইহা বঙ্গোপসাগরের সমুদ্রতীরবর্তী প্রায় ৭২০ কি.মি. পর্যন্ত বিস্তৃত। কিন্তু জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে ঘুর্নিঝড়, জলোচ্ছাস, বন্যা, ভূমিকম্প, সুনামি, নদীভাঙ্গন ইত্যাদি বহুমূখী ঝুকিপূর্ণ ও প্রাকৃতিক দুর্যোগবহুল এলাকা হিসেবে উপকূলীয় অঞ্চলকে বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক ইতিমধ্যে চিহ্নিত করেছে। উপকূলীয় এলাকা হিসেবে বাংলাদেশের মূলত: ৪টি বিভাগের ১৯টি জেলার ১৪৭টি উপজেলায় ৩২% এলাকার মোট ২৮ লক্ষ হেক্টরের মধ্যে প্রায় ১০.৭ লক্ষ হেক্টর লবনাক্ততায় আক্রান্ত। তন্মধ্যে বিগত ৩৬ বছরে ২.২৩ লক্ষ হেক্টর আবাদী জমি নতুনভাবে লবনাক্ততায় আক্রান্ত হয়েছে। শুকনো মৌসুমে অতিরিক্ত লবনাক্ততা থাকায় গ্রীষ্মকালীন ফসল উৎপাদন অত্যন্ত সীমিত। এছাড়াও বর্ষা মৌসুমে উপকূলীয় এলাকার একমাত্র আমন ধান বন্যা ও খরায় অনিশ্চিত হয়ে পড়ে। আরও রয়েছে কৃষকের আধুনিক প্রযুক্তি জ্ঞানের অভাব, উফশী জাতের বীজের দুষ্প্রাপ্যতা এবং লবণাক্ততা সহিষ্ণু জাতের অপ্রতুলতা ইত্যাদি। সমুদ্রতীরবর্তী এলাকা নদী ভাঙ্গনের কবলের ঝুঁকিতে থাকলেও বিশেষত: উপকূলীয় মধ্যবর্তী জোনে নতুন নতুন চর জেগে উঠছে। ফলে নতুন সম্ভাবনাময় একটি দিক উন্মোচিত হচ্ছে। যেখানে দেশের অন্যান্য অঞ্চলে প্রতি বছর প্রায় ১ লক্ষ হেক্টর আবাদী জমি চাষাবাদের বাইরে চলে যাচ্ছে সেখানে এই সম্ভাবনাকে কাজে লাগাতে হবে যাতে খাদ্য উৎপাদন বাড়ানো যায় এবং খাদ্য নিরাপত্তার যোগান দেয়া সম্ভব হয়। তবে সেক্ষেত্রে এই প্রতিকূলতার চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগ ও গবেষনা প্রতিষ্ঠান সমূহের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। আরো নীবিড়ভাবে উপকূলীয় সমস্যা সমাধানে আধুনিক লাগসই প্রযুক্তির উদ্ভাবন ও প্রয়োগে এর উত্তরন সম্ভব।

এ পর্যন্ত প্রাপ্ত গবেষণা লব্ধ প্রযুক্তি সমূহকে কৃষকদের মাঠ পর্যায়ে প্রয়োগে চর উন্নয়ন ও বসতি স্থাপন প্রকল্পের অংগীভূত কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগ বিগত ১৬ বছর যাবত নিরলস ভাবে কাজ করে সফলতার সাথে এগিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু প্রতিকূল পরিবেশে ফলিত গবেষণার প্রযুক্তিসমূহ উপকূলীয় এলাকায় প্রয়োগের ক্ষেত্রে উপযুক্ত পুস্তিকার অপ্রতুলতাই আমাদেরকে এই বই রচনা ও সংকলনে উৎসাহিত করেছে। বইটি কৃষক ও কৃষি মাঠ কর্মীদের মাঠ পর্যায়ে কাজ করার ক্ষেত্রে সহায়ক হবে এবং গবেষনা প্রতিষ্ঠান সমূহের তথ্য উপাত্ত পাওয়ার উৎস হিসেবে ব্যবহার উপযোগী হবে বলে মনে করি।

এতদসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের উদ্ভাবিত প্রযুক্তি সমূহ পুস্তিকাটি রচনা ও সংকলনে বিশেষভাবে সহায়তা করেছে। বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইন্সষ্টিটিউট, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইন্সষ্টিটিউট, কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগ, বিনা, জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচী, এসআরডিআই, ডানিডা ইত্যাদি প্রতিষ্ঠান সহ বিভিন্ন লেখকের প্রকাশনার তথ্য ও প্রযুক্তি সমূহ অর্ন্তভূক্ত করা হয়েছে সেজন্য আমরা তাদের অবদানকে অকুণ্ঠচিত্তে স্মরণ করছি এবং কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

চর উন্নয়ন ও বসতি স্থাপন প্রকল্প-৪ এর অংগীভূত কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগের প্রকল্প পরিচালক জনাব মো: শাহ আলম এবং শস্য উৎপাদন বিশেষজ্ঞ জনাব শ্রীনিবাস দেবনাথ আমাদেরকে বিভিন্ন ভাবে সহায়তা করেছেন বলে এই ধরনের হালনাগাদ তথ্যবহুল প্রকাশনা উপহার দেয়া সম্ভব হয়েছে।

সর্বোপরি চর উন্নয়ন ও বসতি স্থাপন প্রকল্প-৪ এর কারিগরী পরামর্শক টিমের টিম লিডার Jan van der Wal, ডেপুটি টিম লিডারদ্বয় জনাব মো: জয়নাল আবেদিন এবং জনাব মো: সাদিকুল ইসলাম বইটি প্রকাশের জন্য অনুপ্রাণিত এবং সহায়তা প্রদান করায় আমরা তাদের কাছে কৃতজ্ঞ। পুস্তিকাটির বাংলায় কম্পিউটার কম্পোজ কাজে সার্বিক সহায়তার জন্য অত্র অফিসের জনাব মো: আবুল কাসেম এর প্রতি আমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

পুনশ্চ: পুস্তিকাটি তথ্য সমৃদ্ধ করতে গিয়ে বিভিন্ন সূত্র ও সহায়ক গ্রন্থের সাহায্য নিতে হয়েছে সেক্ষেত্রে যদি কোন তথ্যগত ভূল থাকে সেজন্য আমরা দু:খিত। এছাড়া সম্মানিত পাঠকদের যদি কোন মতামত থাকে তা জানালে বাধিত হবো।

**মো: বজলুল করিম**
**মো: রবিউল ইসলাম**

# সূচীপত্র


| অধ্যায় | বিষয় | পৃষ্ঠা নং |
|---|---|---|
| অধ্যায়-১: | **উপকূলের কৃষি** | ০৭ |
| | পটভূমি | ০৭ |
| | উপকূলীয় চরাঞ্চলে চর উন্নয়ন ও বসতি স্থাপন প্রকল্প (সিডিএসপি) এলাকাসমূহ | ০৭ |
| | সিডিএসপি কর্তৃক কর্মসূচি বাস্তবায়ন এলাকার মানচিত্র | ০৮ |
| অধ্যায়-২: | **উপকূলীয় কৃষি পরিবেশ অঞ্চল** | ০৯ |
| | কৃষি পরিবেশ অঞ্চল ও বৈশিষ্ট্য | ০৯ |
| | চরাঞ্চলের মাটির বৈশিষ্ট্য | ১১ |
| | চরাঞ্চলের মাটির পুষ্টি মাত্রা | ১১ |
| | দোআঁশ মাটির বৈশিষ্ট্য | ১১ |
| | বৃহত্তর নোয়াখালী অঞ্চলে বন্যার পানির গভীরতার ভিত্তিতে ভূমির শ্রেণীবিন্যাস | ১১ |
| | সেচ সুবিধা | ১২ |
| | জমির আর্দ্রতা | ১২ |
| | লবণাক্ততা | ১২ |
| | বর্ষা মৌসুমে জলোচ্ছাস | ১২ |
| | চরাঞ্চলের শস্য মৌসুম | ১২ |
| | কৃষকদের করনীয় | ১২ |
| | মাটির উর্বরতা সংরক্ষণ | ১২ |
| অধ্যায়-৩: | **চরাঞ্চলের উপযোগী কৃষি প্রযুক্তি** | ১৪ |
| | উপযোগী ফসল ও জাত সমূহ | ১৪ |
| | বিভিন্ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান হতে অবমুক্ত লবণ সহিষ্ণু জাত | ১৫ |
| | উপকূলীয় মধ্যাঞ্চলে চরসমূহে মাটি লবণাক্ততার নমূনা | ১৫ |
| | ফসলে লবণাক্ততার সহিষ্ণু মাত্রার স্তর | ১৬ |
| | শস্য উৎপাদনশীল জোন | ১৬ |
| | উৎপাদন জোনের বৈশিষ্ট্য | ১৭ |
| | উৎপাদন জোন-১ | ১৭ |
| | উৎপাদন জোন ২ | ১৭ |
| | উৎপাদন জোন ৩ | ১৮ |
| | উৎপাদন জোন ৪ | ১৮ |
| | সিডিএসপি প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন চরের উৎপাদনশীলতা জোন চিহ্নিতকরণ | ১৯ |
| | লবণাক্ততার প্রতিক্রিয়া এড়ানোর জন্য বিভিন্ন ফসলের উপযুক্ত বপন সময় | ২৪ |
| | চরাঞ্চলে কৃষক পর্যায়ে লাগসই প্রযুক্তি সমূহ | ২৪ |
| | লবণাক্ত এলাকায় মালচ ব্যবহার করে আলু ও টমেটো উৎপাদন | ২৪ |
| | ডিবলিং পদ্ধতিতে আউশ ধানের চাষ | ২৫ |
| | রবি মৌসুমের বিশেষ প্রযুক্তি | ২৫ |
| | জমিতে উঁচু বেড ও নালা পদ্ধতি | ২৫ |
| | সর্জান পদ্ধতিতে সবজি ও ফলের চাষ | ২৫ |
| | আগাম ভূমি কর্ষণ | ২৬ |
| | জাবরা বা মাল্চ ব্যবহার | ২৬ |
| | ড্রিপ পদ্ধতিতে সেচ প্রদান | ২৬ |

| | | |
|---|---|---|
| অধ্যায়-৪: | **বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব** | ২৭ |
| | জলবায়ু পরিবর্তনের প্রাথমিক ধারণা | ২৭ |
| | বাংলাদেশে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব | ২৮ |
| | বাংলাদেশে কৃষি সম্পদের সম্ভাব্য ঝুঁকিসমূহ | ২৮ |
| | বাংলাদেশের উপকূলীয় এলাকায় জলবায়ু পরিবর্তন ও প্রভাব | ২৯ |
| | জলবায়ু পরিবর্তনে অভিযোজন কৌশল | ৩০ |
| | বাংলাদেশে ঘুর্ণিঝড়ের সংকেত ব্যবস্থা | ৩১ |
| | জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ে আন্তর্জাতিক উদ্যোগ | ৩২ |
| | জলবায়ু পরিবর্তন প্রশমনে বনায়ন | ৩২ |
| | সড়ক বনায়ন | ৩৩ |
| | বাঁধ বনায়ন | ৩৫ |
| | ফোরসোর বনায়ন | ৩৫ |
| | ম্যানগ্রোভ বনায়ন | ৩৭ |
| অধ্যায়-৫: | **চর অঞ্চলের সরেজমিনে মাঠ ফসল চাষ প্রযুক্তি** | ৪০ |
| | উফশী জাতের ধান চাষ | ৪০ |
| | স্থানীয় ধান রাজাশাইল, কাজলশাইল, বেতিচিকন ও গিগজ এর উৎপাদন কৌশল | ৪৭ |
| অধ্যায়-৬: | **সবজি ফসলের আবাদ** | ৪৮ |
| | টমেটো | ৪৮ |
| | বেগুন | ৪৯ |
| | ঢেঁড়শ | ৫১ |
| | শসা | ৫২ |
| | মিষ্টিকুমড়া | ৫২ |
| | আলু | ৫৩ |
| | মিষ্টি আলু | ৫৪ |
| | বাঁধাকপি ও ফুলকপি | ৫৬ |
| | করলা | ৫৬ |
| | বরবটি | ৫৮ |
| অধ্যায়-৭: | **মসলা ফসলের আবাদ** | ৬০ |
| | পেঁয়াজ | ৬০ |
| | রসুন | ৬১ |
| | মরিচ | ৬১ |
| | হলুদ | ৬২ |
| | ধনিয়া | ৬৩ |
| অধ্যায়-৮: | **তৈল ফসলের আবাদ** | ৬৫ |
| | সরিষা | ৬৫ |
| | চিনা বাদাম | ৬৬ |
| | সয়াবীন | ৬৭ |
| | তিশি | ৭০ |
| অধ্যায়-৯: | **ডাল ফসলের আবাদ** | ৭১ |
| | ফেলন | ৭১ |
| | মুগডাল | ৭১ |
| | খেসারী | ৭২ |

| | | |
|---|---|---|
| অধ্যায়-১০: | **বসতবাড়ির আঙ্গিনায় চাষাবাদ** | ৭৩ |
| | বসতবাড়ির আঙ্গিনায় সবজি চাষ ও আট কপালিয়া মডেল | ৭৩ |
| | লাউ | ৭৩ |
| | দেশী সীম | ৭৪ |
| | বাটিশাক | ৭৪ |
| | বিলাতী ধনিয়া | ৭৫ |
| | পুদিনা | ৭৫ |
| অধ্যায়-১১: | **চরাঞ্চলে ফলের চাষ** | ৭৬ |
| | তরমুজ | ৭৬ |
| | পেঁপে | ৭৬ |
| | কুল | ৭৮ |
| | নারিকেল | ৭৯ |
| | কলা | ৮১ |
| অধ্যায়-১২: | **ফসলের রোগবালাই ও পোকামাকড় দমন** | ৮৩ |
| | সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা | ৮৩ |
| | রাসায়নিকভাবে ফসলের রোগবালাই ও পোকামাকড় দমন | ৮৭ |
| | বালাইনাশকের প্রয়োগবিধি | ৮৭ |
| | ছত্রাকনাশক ব্যবহারের গুরুত্ব ও বৈশিষ্ট্য | ৮৮ |
| | বালাই নাশক ব্যবহারে সাবধানতা | ৮৮ |
| | ধান ক্ষেতের পোকামাকড় এর নাম, ক্ষতির ধরন ও প্রতিকার | ৮৮ |
| | সবজির বিভিন্ন রোগবালাই ও পোকামাকড় এবং প্রতিকার | ৯৫ |
| অধ্যায়-১৩: | **বীজ উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও সংরক্ষণ** | ১০২ |
| | কৃষিতে উন্নত বীজের ভূমিকা | ১০২ |
| | বীজের শ্রেণী বিভাগ | ১০৩ |
| | ভাল বীজ কি? | ১০৩ |
| | বীজের জীবনে আর্দ্রতার প্রভাব (দানা শস্য) | ১০৫ |
| | বীজ উৎপাদনের বিভিন্ন ধাপসমূহ | ১০৬ |
| | গুদামজাত বীজের কীটপতঙ্গ ও প্রতিকার | ১০৮ |
| অধ্যায়-১৪: | **চরাঞ্চলে কৃষি পণ্য বাজারজাতকরণ** | ১১০ |
| | চরাঞ্চলে কৃষি পণ্য বিপনন | ১১০ |
| | ঢেঁড়শ, সয়াবীন, তরমুজ | ১১০ |
| | কলা, সীমের বীচি, বনতিল/তালমাখনা | ১১১ |
| অধ্যায়-১৫: | **কৃষি যন্ত্রপাতি** | ১১২ |
| | সহায়ক গ্রন্থাবলী | ১১৩ |

# অধ্যায়-১
# উপকূলের কৃষি

**পটভূমি**

ভূ-প্রকৃতির বৈশিষ্টের দিক থেকে বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় উপকূলীয় অঞ্চলটি অত্যন্ত সক্রিয়। দেশের প্রধান প্রধান নদ নদীগুলো এ অঞ্চলের ওপর দিয়েই বঙ্গোপসাগরে গিয়ে পড়েছে। মেঘনা ও পদ্মার প্রবল জলপ্রবাহ একদিকে যেমন ভাঙ্গনের মাধ্যমে ভূমির ক্ষয় ঘটায় তেমনি অন্যদিকে মোহনা এলাকায় ক্রমাগত পলি সঞ্চয়ের দ্বারা নতুন নতুন ভূখন্ড গড়ে তোলে। নদীবাহিত পলি সাগরে পড়ার পর জোয়ার ভাটার টানে উপকূলের দিকে ফিরে আসে ও তটরেখা বরাবর সঞ্চিত হয়। এই প্রক্রিয়ায় ২০ থেকে ৩০ বছরের পলি সঞ্চয়ের ফলে সৃষ্টি হয় নতুন চর। শুরুতে জেগে উঠা ঐ চরটি থাকে সমতল কর্দমাক্ত ভূমি (muddy flat)। এ ধরনের চর ভাটার সময় শুকনো থাকে এবং জোয়ারে তলিয়ে যায়। এই অবস্থায় সেখানে জেলেরা মাছ ধরে। ক্রমে পলি সঞ্চয়ের ফলে চরটি আরও উঁচু হয় এবং ঘাস (উরি) জন্মায়। পরবর্তীতে একই নিয়মে আরো উঁচু হয়ে আবাদ উপযোগী হয়। তবে প্রথমদিকটায় শুধু স্থানীয় জাতের আমন ধানের চাষ হয়। ক্রমে জমি স্থিতি লাভের পর নদী ভাঙ্গনের শিকার জনগোষ্ঠি সে সব চরের বন কেটে অবৈধ বসবাস শুরু করে। প্রকৃতি এবং মানব সৃষ্ট এই প্রতিকূলতার মধ্য দিয়ে শুরু হয় আবারো নতুন জীবন গড়ার প্রয়াস।

বাংলাদেশের প্রতিকূল কৃষি বিভাগের বিভিন্ন জেলার পরিবেশ অঞ্চলের মধ্যে বৃহত্তর নোয়াখালী, বরিশাল, খুলনা, ঢাকা এবং চট্টগ্রামের অংশ নিয়ে বিস্তৃত। এই এলাকার কৃষি পরিবেশ দেশের অন্যান্য অঞ্চল হতে ভিন্নতর। দেশের ১৯টি জেলার ১৪৭টি উপজেলায় প্রায় ২৮ লক্ষ হেক্টর এর মধ্যে ১০.৭ লক্ষ হেক্টর জমি লবণাক্ততায় আক্রান্ত। মোট জনসংখ্যার শতকরা ২৫ ভাগ উপকূলীয় এলাকায় বসবাস করে তার মধ্যে অধিকাংশ হল শ্রমিক, যাদের কৃষিই জীবিকা নির্বাহের প্রধান উপায়। এই সকল প্রতিকূল পরিবেশের সাথে যুক্ত রয়েছে জলোচ্ছ্বাস, ঘুর্ণিঝড়, খরা, জমির লবণাক্ততা, জলাবদ্ধতা, সেচযোগ্য পানির অভাব ইত্যাদি। বিগত ৩৬ বছরে (১৯৭৩ থেকে ২০০৯) ২.২৩ লক্ষ হেক্টর জমিতে নূতন এলাকা যেমন মাগুরা, নড়াইল, ফরিদপুর, গোপালগঞ্জ, পটুয়াখালী এবং বরিশাল ইত্যাদি লবণাক্ততায় আক্রান্ত হয়েছে। পক্ষান্তরে পদ্মা, মেঘনা, ব্রহ্মপুত্র এবং যমুনা তীরবর্তী অঞ্চল সমূহে প্রতি বছর প্রচুর পরিমান পলি দ্বারা নূতন চর সৃষ্টি হচ্ছে। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে বাৎসরিক শতকরা ১ ভাগ আবাদী কৃষি জমি চাষের বাইরে চলে যাচ্ছে। বর্তমানে আবাদী জমিতে বারবার চাষাবাদের চাপের কারণে হেক্টর প্রতি ফলন একটি স্থিতাবস্থার দিকে চলে যাচ্ছে। তাই নূতন ভাবে উপকূলীয় চরাঞ্চলে বাড়তি প্রাপ্ত চর সমূহ ভবিষ্যতে কৃষি উৎপাদনের সম্ভাবনাময় এলাকায় পরিণত হতে পারে। এতদঅঞ্চলে কৃষি উৎপাদনের সম্ভাবনা প্রাকৃতিক প্রতিকূলতার কারণে এবং লাগসই প্রযুক্তির অভাব সত্ত্বেও কৃষকগণ কৃষি ব্যবস্থাকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। তবে এই সম্ভাবনাকে কাজে লাগিয়ে কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠান সমুহের আরো অধিক মনোনিবেশ এবং লাগসই গবেষনার ফলে উদ্ভাবিত প্রযুক্তির প্রয়োগে এসকল সমস্যার সমাধান অনেকাংশে সম্ভব। এব্যাপারে দীর্ঘ ১৬ বছর যাবত চর উন্নয়ন ও বসতি স্থাপন প্রকল্প (সিডিএসপি) উপকূলীয় অঞ্চলের বৃহত্তর নোয়াখালী ও চট্টগ্রামের বিভিন্ন চর অঞ্চলের কৃষি উন্নয়নে যথেষ্ট অবদান রেখে আসছে। এতদঞ্চলের প্রতিকূল অভিজ্ঞতার আলোকে বিভিন্ন ফসল ও জাতের উৎপাদনশীলতা মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়ন কাজে কৃষকদের উপযুক্ত সহায়তা দিয়ে আসছে।

**উপকূলীয় চরাঞ্চলে চর উন্নয়ন ও বসতি স্থাপন প্রকল্প (সিডিএসপি) এলাকাসমূহ**

বিগত ১৯৯৪ সাল থেকে সিডিএসপি বৃহত্তর নোয়াখালীর প্রত্যন্ত চরাঞ্চলে বন্যা নিয়ন্ত্রণ, অবকাঠামোগত উন্নয়ন, বনাঞ্চল সৃষ্টি, ভূমিহীনদের পুণর্বাসন, জনস্বাস্থ্য এবং কৃষি উন্নয়নে ব্যাপক ভূমিকা পালন করে আসছে। ইতিমধ্যে ৩টি পর্যায়ে সিডিএসপি ১, ২ ও ৩ চট্টগ্রাম, ফেনী, নোয়াখালী ও লক্ষীপুর এর বিভিন্ন চর অঞ্চলে কৃষি উন্নয়নে এক বিশেষ ভূমিকা পালন করে আসছে এবং বর্তমানে ৪র্থ পর্যায়ে ৫টি চর নিয়ে প্রকল্প কর্মসূচী বাস্তবায়ন করছে। যে সমস্ত চরে সিডিএসপি কার্যক্রম সমাপ্ত হয়েছে সে গুলি হলো :

চর বাগ্‌গারদোনা-১, চর বাটির টেক, চর মজিদ, চর বাগ্‌গারদোনা-২, মরাদোনা, গাংচিল-তোরাবালি, চর লক্ষী, পোল্ডার ৫৯/৩ বি, পোল্ডার ৫৯/৩ সি, দক্ষিন হাতিয়া, নিঝুম দ্বীপ, বন্দর টিলা ও বয়ার চর।

বর্তমানে ৪র্থ পর্যায়ে চট্টগ্রাম ও নোয়াখালী জেলার চর নাঙ্গুলিয়া, নলের চর, ক্যারিং চর, চর জিয়াউদ্দিন ও উড়ির চর এলাকায় এই প্রকল্পের কাজ অব্যাহত রয়েছে।

**চিত্র-১: সিডিএসপি কর্তৃক কর্মসূচি বাস্তবায়ন এলাকার মানচিত্র**

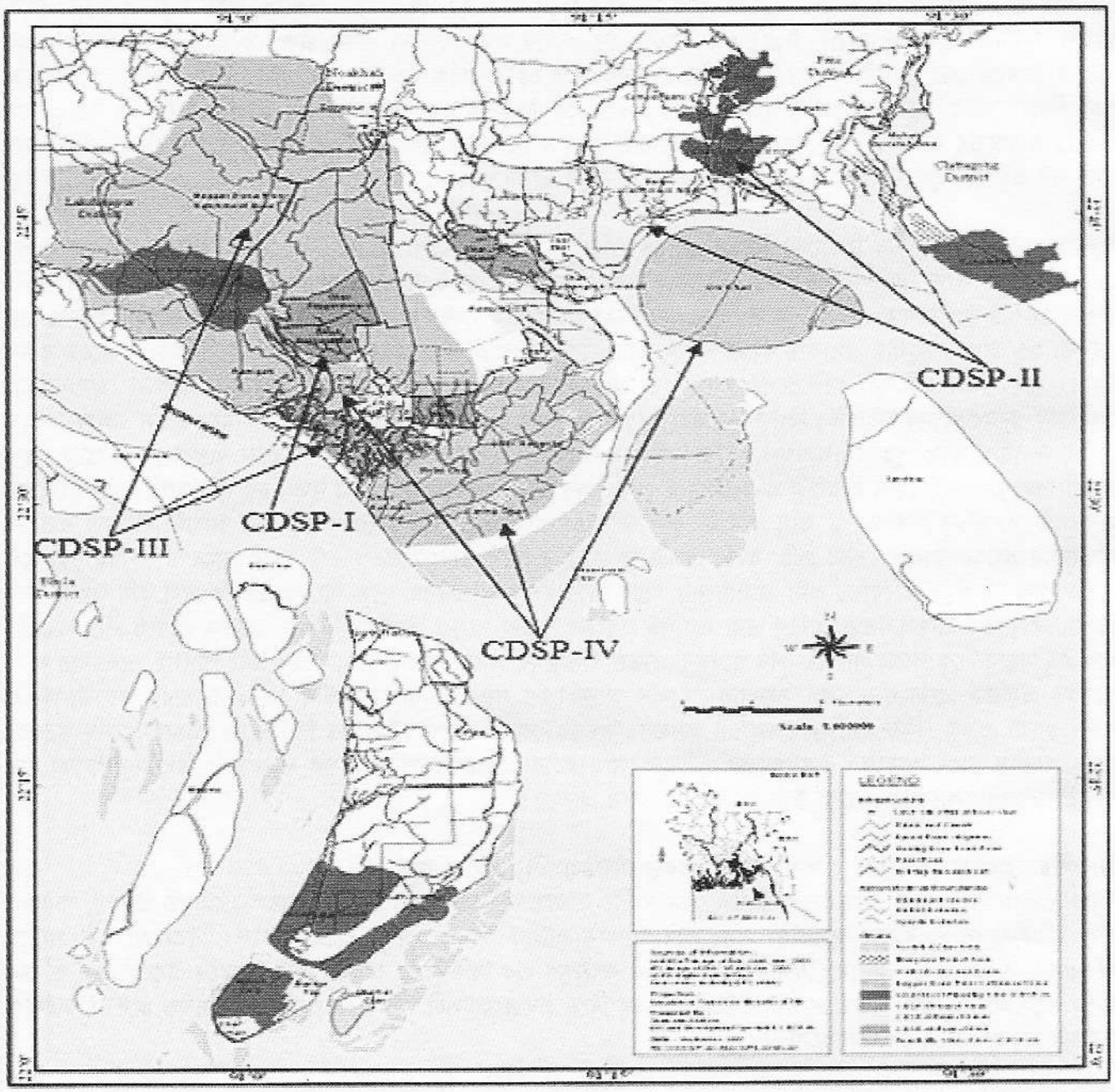

# অধ্যায়-২
# উপকূলীয় কৃষি পরিবেশ অঞ্চল ও বৈশিষ্ট্য

**কৃষি পরিবেশ অঞ্চল ও বৈশিষ্ট্য**

বাংলাদেশ মোট ৩০টি কৃষি পরিবেশ অঞ্চলে বিভক্ত। ভূপ্রকৃতি ও বন্যা প্রকৃতির উপর ভিত্তি করে কোন কোন পরিবেশ অঞ্চলকে আবার উপ অঞ্চলে ভাগ করা হয়েছে। তবে এখানে শুধুমাত্র উপকূলীয় চরাঞ্চলের জন্য প্রযোজ্য কৃষি পরিবেশ অঞ্চল সমূহের তথ্যাদি দেয়া হয়েছে।

**কৃষি পরিবেশ অঞ্চল ১৩**

| | |
|---|---|
| এলাকা সমূহ | জেলা: বরিশাল, ঝালকাটি, পিরোজপুর, পটুয়াখালী, ভোলা, বরগুনা, বাগেরহাট, সাতক্ষীরা ও খুলনা। |
| | উপজেলা: বরিশাল সদর, বাকেরগঞ্জ, বাবুগঞ্জ, মেহেন্দীগঞ্জ, মূলাদি, নাজিরপুর, নলছিটি, উজিরপুর, স্বরূপকাটি, ঝালকাটি সদর, কাউখালী, রাজাপুর, কাঠালিয়া, পিরোজপুর সদর, ভান্ডারিয়া, মঠবাড়িয়া, বানরীপাড়া, পটুয়াখালী সদর, দুমকি, বেতাগী, মির্জাগঞ্জ, বাউফল, বামনা, গলাচিপা, মনপুরা, কলাপাড়া, বরগুনা সদর, পাথরঘাটা, আমতলী, বাগেরহাট সদর, কটিয়াঘাটা, রামপার, ফকিরহাট, চিতলমারী, কচুয়া, সাতক্ষীরা সদর, আশাশুনি, দেবহাটা, কালিগঞ্জ, মোংলা, মোড়েলগঞ্জ, স্বরনখোলা, তালা, শ্যামনগর, ডুমুরিয়া, দাকোপ, দিঘলিয়া, খালিশপুর, খানজাহান আলী, কয়রা ও সোনাডাংগা। |
| বৈশিষ্ট্য | শুষ্ক মৌসুমে জলোচ্ছাস, লবণাক্ততা। বেশীরভাগ এঁটেল মাটি, মাঝে মাঝে দো-আঁশ। অতিবর্ষণ, জোয়ারের সময় বর্ষাকালে এবং কোথাও সারা বছর অগভীর থেকে মাঝারি গভীর বন্যা, বন্যাকাল কোন কোন বৎসর কয়েক সপ্তাহ। |

**কৃষি পরিবেশ অঞ্চল ১৪**

| | |
|---|---|
| এলাকা সমূহ | জেলা: যশোর, নড়াইল, খুলনা, বাগেরহাট, মাদারীপুর, বরিশাল ও গোপালগঞ্জ। |
| | উপজেলা: মনিরামপুর, অভয়নগর, কেশবপুর, নড়াইল সদর, কালিয়া, খুলনা মেট্রো, ফুলতলা, দৌলতপুর, ডুমুরিয়া, তেরখাদা, মোল্লাহাট, চিতলমারী, মাদারীপুর সদর, নাজিরপুর, কাশিয়ানী ও গোপালগঞ্জ সদর। |
| বৈশিষ্ট্য | দক্ষিন পশ্চিম অঞ্চলে লবণাক্ততা, এঁটেল বা এঁটেল দোআঁশ মাটি, দক্ষিণাঞ্চলে শুষ্কমৌসুমে জোয়ারের সময় আকস্মিক বন্যার পানি ধীরে নিষ্কাশন। |

**কৃষি পরিবেশ অঞ্চল ১৭**

| | |
|---|---|
| বিস্তৃতি | জেলা: চাঁদপুর, লক্ষীপুর ও নোয়াখালী। |
| | উপজেলা: চাঁদপুর সদর, হাজিগঞ্জ, ফরিদপুর, হাইমচর, রায়পুর, লক্ষীপুর সদর, চাটখিল ও নোয়াখালী সদর। |
| বৈশিষ্ট্য | বেশীর ভাগ দো-আঁশ মাটি। শুষ্ককালে লবণাক্ততা, সেচের জন্য মিষ্টি পানির অভাব। গভীর থেকে অগভীর, আগাম ও আকস্মিক বন্যা। দ্রুত পানি বৃদ্ধি, ধীরে নিষ্কাশন, |

**কৃষি পরিবেশ অঞ্চল ১৮**

| | |
|---|---|
| এলাকা সমূহ | জেলা: ভোলা, পটুয়াখালী, বরিশাল, ফেনী, চট্রগ্রাম, |
| | উপজেলা: ভোলা সদর, দৌলতখান, তজুমদ্দিন, বোরহানউদ্দিন, চরফ্যাশন, মনপুরা, দশমিনা, গলাচিপা, হিজলা, লালমোহন, সন্দ্বীপ, সোনাগাজী, লক্ষ্মীপুর সদর, রামগতি, রায়পুর, কোম্পানীগঞ্জ, হাতিয়া ও নোয়াখালী। |
| বৈশিষ্ট্য | প্রায় সমস্ত এলাকা দোআঁশ মাটি। শুষ্ককালে লবণাক্ততা, সেচের জন্য মিষ্টি পানির অভাব। গভীর থেকে অগভীর আগাম ও আকস্মিক বন্যা। দ্রুত পানি বৃদ্ধি, ধীরে নিষ্কাশন, জলাবদ্ধতা, জমিতে দেরীতে জো আসা। |

**কৃষি পরিবেশ অঞ্চল ১৯**

| | |
|---|---|
| এলাকা সমূহ | জেলা: নোয়াখালী, ফেনী, বরিশাল, চাঁদপুর, কুমিল্লা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, হবিগঞ্জ, শরীয়তপুর, মাদারীপুর, গোপালগঞ্জ, ঢাকা, নারায়নগঞ্জ, মুন্সীগঞ্জ ও কিশোরগঞ্জ। |
| | উপজেলা: বেগমগঞ্জ, চাটখিল, সেনবাগ, দাগনভূঁইয়া, উজিরপুর, আগৈলঝরা, কালকিনি, সরাইল, চান্দিনা, দাউদকান্দি, দেবীদ্বার, বরুড়া, বুড়িচং, মুরাদনগর, শাহরাস্তি, কচুয়া, আখাউড়া, নাসিরনগর, বি. বাড়িয়া সদর, কসবা, বানিয়াচং, হবিগঞ্জ সদর, লাখাই, মাধবপুর, নবিগঞ্জ, শরীয়তপুর সদর, নড়িয়া, গোশাইর হাট, কোটালীপাড়া, তেজগাঁও, কেরানীগঞ্জ, সোনারগাঁও, নারায়নগঞ্জ সদর, টংগীবাড়ী, নিকলি, মিঠামইন ও অষ্টগ্রাম। |
| বৈশিষ্ট্য | প্রায় সমস্ত এলাকায় দোআঁশ মাটি। গভীর থেকে অগভীর আগাম ও আকস্মিক বন্যা। দ্রুত পানি বৃদ্ধি, ধীরে নিষ্কাশন, জলাবদ্ধতা, জমিতে দেরীতে জো আসা। |

**কৃষি পরিবেশ অঞ্চল ২৩**

| | |
|---|---|
| এলাকা সমূহ | জেলা: কক্সবাজার, চট্টগ্রাম, ফেনী |
| | উপজেলা: কুতুবদিয়া, চকরিয়া, টেকনাফ, উখিয়া, মহেশখালী, বাঁশখালী, আনোয়ারা, ডবলমুরিং, মিরেরসরাই, পাঁচলাইশ, সীতাকুন্ড, ফটিকছড়ি, পটিয়া, রাঙ্গুনিয়া, রাউজান, হাটহাজারী, কোতয়ালী, সাতকানিয়া, বোয়ালখালী, লোহাগড়া, পরশুরাম। |
| বৈশিষ্ট্য | বেশীরভাগ দোআঁশ মাটি, কোথাও কোথাও এঁটেল মাটি। অগভীর থেকে মাঝারি বন্যা, শুষ্ক মৌসুমে লবণাক্ত পানি, মাঝে মাঝে আকস্মিক বন্যা। বালিতে জমির উর্বরতা হ্রাস। |

**কৃষি পরিবেশ অঞ্চল ২৪**

| | |
|---|---|
| এলাকা সমূহ | জেলা: কক্সবাজার (সেন্ট মার্টিন দ্বীপ) |
| বৈশিষ্ট্য | কোথাও কোথাও বৃষ্টিতে বা জোয়ার ভাটার পানিতে লবণাক্ত পানিতে প্লাবন, বেলে মাটি। |

## চরাঞ্চলের সাধারণ তথ্যসমূহ

**চরাঞ্চলের মাটির বৈশিষ্ট্য**

অগভীর প্লাবন, নীচু জমিতে দীর্ঘদিন বন্যা, অতিবর্ষণ, শুষ্ককালে লবণাক্ততা সেচ যোগ্য পানির অভাব, বেশীর ভাগই দোআঁশ মাটি। এতদাঞ্চলের মাটি দো-আঁশ থেকে এঁটেল দোআঁশ প্রকৃতির এবং মাটিতে জৈব পদার্থের পরিমান শতকরা ০.৮৬-২.৪৪ ভাগ

**চরাঞ্চলের মাটির পুষ্টি মাত্রা:**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| নাইট্রোজেন | : | কম | ফসফরাস | : | কম/মধ্যম |
| পটাশ | : | মধ্যম | সালফার | : | কম |
| দস্তা | : | কম | বোরন | : | মধ্যম |
| ম্যাগনেশিয়াম | : | বেশী | মাটির পিএইচ | : | ৬.৫-৭.৫ |

**দোআঁশ মাটির বৈশিষ্ট্য:**

- বালি (৫০%), পলি (২৫%) ও এঁটেল (২৫%) মিশ্রিত। এ মাটির সামান্য আঠালো গুন আছে। ভিজা অবস্থায় দলা বা রান্না করা সেমাইর মত গাঢ় রূপ দেয়া যায়, কিন্তু আংটি তৈরী করলে মাঝে মাঝে ফেটে যায়।
- উদ্ভিদের আহরণযোগ্য রস বেশী
- বর্ষার পর ২/৩ দিন পানি দাড়ানো থাকে।

**বৃহত্তর নোয়াখালী অঞ্চলে বন্যার পানির গভীরতার ভিত্তিতে ভূমির শ্রেণীবিন্যাস**

বর্ষাকালে সাধারন বন্যার গভীরতার ভিত্তিতে এই এলাকার ভূমিকে পাঁচটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। ভূমির প্রকৃতি এবং পানির গভীরতার ভিত্তিতে শ্রেণীবিন্যাস দেখানো হলো:

| ভূমির শ্রেণী | বন্যার পানির গভীরতা | সরেজমিনে অবস্থা | বন্যার প্রকৃতি | বৈশিষ্ট্য |
|---|---|---|---|---|
| উঁচু | ০-৩০ সে.মি. (১ ফুটের কম) | বর্ষাকালে হাঁটুর নীচে | বন্যা মুক্ত | স্বাভাবিক |
| মাঝারী উঁচু | ৩০-৯০ সে.মি. (১-৩ ফুট) | বর্ষাকালে সর্বোচ্চ কোমর পর্যন্ত | স্বল্প থেকে মাঝারী বন্যা | স্বল্প মেয়াদী জলাবদ্ধতা |
| মাঝারী নীচু | ৯০-১৮০ সে.মি. (৩-৬ ফুট) | বর্ষাকালে সর্বোচ্চ দেহের উচ্চতা পর্যন্ত | মাঝারী থেকে গভীর প্লাবন | স্বল্প থেকে দীর্ঘমেয়াদী জলাবদ্ধতা |
| নীচু জমি | ১৮০ সে.মি. এর উর্ধ্বে (৬ ফুটের বেশী) | বর্ষকালে মানুষের উচ্চতা থেকে বেশী | গভীর প্লাবন | দীর্ঘমেয়াদী জলাবদ্ধতা |
| অতি নীচু জমি | ১৮০ সে.মি. এর উর্ধ্বে (৬ ফুটের বেশী) | সারা বছর পানির গভীরতা দেহের উচ্চতার বেশী থাকে | গভীর প্লাবন | হাওড়, বিল, নদীর পাড় |

**সেচ সুবিধা**

শুষ্ক মৌসুমে সেচযোগ্য পানির উৎস খুবই সীমিত। শুধুমাত্র কৃষকদের বসতবাড়ির অঙ্গিনায় পুকুর অথবা ডোবা এবং খালের উৎস থেকে অপর্যাপ্ত পরিমান পানি পাওয়া যায় যা দ্বারা এই মৌসুমে চাষাবাদ খুবই সীমিত। অপরদিকে ভূগর্ভস্থ সেচের পানির কোন উৎস নেই।

**জমির আর্দ্রতা**

মাটিতে সাধারনত: অগ্রহায়ণ-পৌষ মাস পর্যন্ত অত্যধিক আর্দ্রতায় কাদাময় থাকে বিধায় চাষ উপযোগী জমি পাওয়া যায় না।

**লবণাক্ততা**

বর্ষা মৌসুমে সামান্য লবণাক্ততা অথবা লবণাক্ততা থাকে না। তাই চরাঞ্চলের কৃষি শুধুমাত্র আমন ধান চাষের উপর নির্ভরশীল। উপরন্তু বর্ষা মৌসুমে জলাবদ্ধতার কারণে অধিকাংশ জমিতে স্থানীয় জাতের চাষাবাদ হয়ে থাকে। শুষ্ক মৌসুমে বিশেষত: জানুয়ারী-এপ্রিল মাসে মাত্রাতিরিক্ত লবণাক্ততা থাকে ফলে এই সময়ে কিছু নির্দিষ্ট ফসল যেমন- খেসারী, ফেলন, তিশি ইত্যাদি সনাতন পদ্ধতিতে চাষাবাদ করা যায়।

**বর্ষা মৌসুমে জলোচ্ছাস**

এতদঞ্চলে প্রায় প্রাকৃতিক দূর্যোগ যেমন- জলোচ্ছ্বাস হয়ে থাকে। যা বর্ষা মৌসুমে ৩-৪ মি. সমুদ্র উচ্চতায় এবং শীতে ১২-১৬৭ সে.মি. (৪.৮ ইঞ্চি-৫.৫ ফুট) উচ্চতা পর্যন্ত দেখা যায়।

**চরাঞ্চলের শস্য মৌসুম**

খরিফ-১: আউশ (চৈত্র-আষাঢ়)
খরিফ-২: আমন (শ্রাবন-অগ্রহায়ন)
রবি: বোরো/শীতকালীন ফসল (অগ্রহায়ন-ফাল্গুন)

এ অঞ্চলের ফসল উৎপাদনের প্রধান সমস্যা হল লবণাক্ততা। তাই বিভিন্ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান হতে উদ্ভাবিত লবণ সহিষ্ণু ফসল বা জাতের উপযোগীতা আছে এমন ফসলের জাত উৎপাদন করতে হবে। তাছাড়া বিগত ১৬ বছরের সিডিএসপি এবং স্থানীয় কৃষকদের অভিজ্ঞতার আলোকে যে ফসল ও জাত এতদঞ্চলের উৎপাদন উপযোগী বলে প্রমানিত হয়েছে সে ধরনের লবণাক্ততা সহিষ্ণু জাত উৎপাদন করতে হবে।

**কৃষকদের করণীয়**

উপকুলীয় চরাঞ্চলের মাটি ও পানির লবণাক্ততা এবং চরাঞ্চলের আবহাওয়া উপযোগী বিভিন্ন ফসলের গবেষণা প্রতিষ্ঠান সমূহ হতে সাম্প্রতি বেশ কয়েকটি জাত উদ্ভাবন করা হয়েছে এবং চাষাবাদের জন্য সুপারিশ করা হয়েছে। তাই শুরুতে স্থানীয় কৃষকরা সে সকল জাত সমূহ সীমিত আকারে উৎপাদন করতে পারে। ফলাফল অনুকূলে হলে পরবর্তীতে বৃদ্ধি করা যেতে পারে। ইতিমধ্যে যেসকল উচ্চফলনশীল জাত চরাঞ্চল এলাকায় স্থানীয় জাত থেকে অধিক ফলন পাওয়া গেছে সে সকল জাত অধিক যত্ন সহকারে চাষাবাদ করাই উত্তম।

**মাটির উর্বরতা সংরক্ষণ**

উদ্ভিদের প্রয়োজনীয় পুষ্টি উপাদানের মাত্রা নির্ভর করে মাটিতে উপস্থিত জৈব পদার্থের পরিমানের উপর। ফলে আবাদী জমির উর্বরতা রক্ষার জন্য মাটিতে উপযুক্ত জৈব পদার্থ থাকা খুবই প্রয়োজন। নিচে চিত্রসহ মাটির উর্বরতা সংরক্ষণের কয়েকটি পদ্ধতি উল্লেখ করা হল:

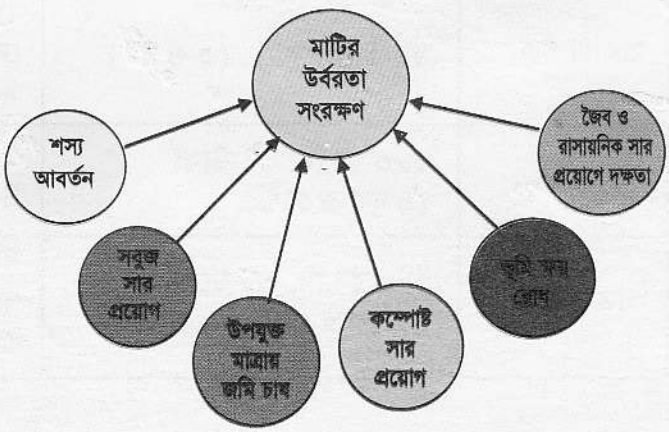


**শস্য বিন্যাস ও শস্য পর্যায় আবর্তন:** একই জমিতে বারবার একই ফসলের আবাদ করার ফলে উর্বরতা শক্তি ক্রমেই হ্রাস পেতে থাকে। তাই এক মৌসুমে বোরো আবাদ করে পরবর্তী মৌসুমে অন্য ফসল যেমন ডাল, তৈল ফসল, গম, সবজি ইত্যাদির চাষ করলে জমির উর্বরতা রক্ষণাবেক্ষণে সহায়ক হয়।

**সবুজ সার প্রয়োগ:** শস্য বিন্যাসে সবুজ সার জাতীয় ফসল অর্ন্তভূক্ত করে জৈব পদার্থের পরিমান বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। যেমন বোরো বা আউশ ধান চাষ করে পরবর্তী ফসল আবাদের পূর্বে ধৈঞ্চা, মটর, ফেলন, বরবটি, শন, মাসকলাই ইত্যাদি শুটি জাতীয় ফসলের চাষ করে মাটিতে সবুজ সার প্রয়োগ করা যায়। ফুল আসার আগে সবুজ অবস্থায় গাছ কেটে মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হয়। শুটি জাতীয় ফসল আবাদে জীবাণু (রাইজোবিয়াম) সার ব্যবহার করা ভাল যা মাটিতে জৈব পদার্থের পরিমান বৃদ্ধি করে।

**উপযুক্ত মাত্রায় জমি চাষ:** বিভিন্ন ফসল চাষ করার পূর্বে ভালভাবে জমি চাষ করতে হবে। ফসল ওয়ারী কোন ফসলে কিভাবে কত চাষ দিতে হবে সে অনুযায়ী চাষ দিলে মাটির উর্বরতা সংরক্ষণ করা যায়। তাই ফসল চাষের সময় চাষী কৃষকদের এব্যাপারে সজাগ থাকা দরকার।

**কম্পোষ্ট সার প্রয়োগ: ফ**সল আবাদের পুর্বে জমিতে পচাঁ গোরব, আবর্জনা, খড়, পাতা, কচুরীপানা, খৈল, ভূষি বা হাড়ের গুড়া প্রয়োগ করা উচিত। এছাড়া ফসলের পরিত্যক্ত অংশ, গোয়ালে ব্যবহৃত খড়, আবর্জনা নির্দিষ্ট গর্তে জমিয়ে রেখে পচেঁ যাওয়ার পর খামারজাত সার/কম্পোষ্ট সার হিসেবে জমিতে ব্যবহার করা যায়।

**ভূমি ক্ষয়রোধ: অ**তিরিক্ত বৃষ্টি বা খরাকালে মাটির উপরিভাগ ক্ষয়রোধে কচুরিপানা, খড়, বা ভূষি দিয়ে ঢেকে রাখতে হবে। এতে অতিবৃষ্টিতে বা খরার সময় বাতাসে মাটির উপরি স্তরের জৈব পদার্থ ক্ষয় থেকে জমি রক্ষা পাবে।

**সার প্রয়োগে দক্ষতা:** কোন জমিতে অনবরত চাষাবাদ করলে মাটিতে উদ্ভিদের জন্য প্রয়োজনীয় পুষ্টি উপাদানের পরিমান কমে যায়। এ জন্যে মাটিতে কৃত্রিম পদ্ধতিতে পুষ্টি উপাদান সার হিসেবে প্রয়োগ করতে হয়। তবে মাটির উর্বরতা ক্ষমতা পরীক্ষা করে অনুমোদিত হারে সময়মত সুষম সার প্রয়োগ করা প্রয়োজন।

# অধ্যায়-৩
# চরাঞ্চলের উপযোগী কৃষি প্রযুক্তি

## উপযোগী ফসল ও জাত সমূহ

| মৌসুম | স্থানীয় জাত | উচ্চফলনশীল (উফশী) জাত/নতুন জাত |
|---|---|---|
| খরিফ-১ | **আউশ ধান:** যাইটা, বৈলাম, চিনা ইরি, কেরানডোল | **আউশ ধান:** বিআর১৪ (গাজী), বিআর২১, **ব্রি ধান২৭*** **ব্রি ধান ৪২ ও ব্রি ধান ৪৩** **অন্যান্য ফসল:** বারি ডাটা-১, বারি ঢেড়শ-১ ও স্থানীয় উন্নত জাত, বারি গিমা কলমি-১, বারি লাউ-১ ও ৩, বারি মরিচ-১, বারি রসুন-২, বারি পেঁয়াজ-২,৩ ও ৫, বিনা মুগ-৫, ৬ ও ৭, বারি তিল-২-৪, বিনা চিনাবাদাম-৫ ও ৬, টমেটো: বিনা টমেটো-২ও ৪, শশা-হাইব্রিড- আলাভি, এলিন, করলা-হাইব্রিড-টিয়া, পাপিয়া। |
| খরিফ-২ | **আমন ধান:** রাজাশাইল, কাজলশাইল, গিগজ, বেতি চিকন, কালিজিরা, কালামোটা, ধলামোটা, ইত্যাদি। | **আমন ধান:** বিআর২২, বিআর২৩, **ব্রি ধান৪০***, **ব্রি ধান৪১***, ব্রি ধান৫২, ব্রি ধান৫৩, **ব্রি ধান৫৪***, ব্রি ধান ৫৬ ও ব্রি ধান ৫৭ এবং বিনা ধান৭ |
| বোরো/রবি | বোরো ধান, খেসারী, মরিচ, মিষ্টি আলু, চিনাবাদাম, বেগুন, ফেলন, ঢেড়শ, সরিষা, তিল, সয়াবীন, তরমুজ, সীম, বাটিশাক ইত্যাদি। | **বোরো ধান:** ব্রি ধান৪৭, ব্রি ধান ৫৫, ব্রি ধান৫৮ এবং **বিনা ধান ৮*** বিনাধান-১০<br>**অন্যান্য:**<br>**গম:** বারি গম-২৫* ও বারি গম ২৬<br>**ভূট্টা:** হাইব্রীডের বিভিন্ন জাত<br>**সরিষা:** বারি সরিষা-১১, বারি সরিষা-১৬, **বিনা সরিষা-৫* ও ৬***<br>**আলু:** বারি আলু-২১, বারি আলু-২৫, বারি আলু-২৭ ও বারি আলু-২৯<br>**মিষ্টি আলু:** বারি মিষ্টি আলু-৬, বারি মিষ্টি আলু-৭<br>**সীম:** বারি সীম-৫ ও ৬ **বাটিশাক:** বারি বাটিশাক-১<br>**বেগুন:** বারি বেগুন-৯ ও বারি বেগুন-১০<br>**বরবটি:** কেগর নটাকী<br>**লাউ:** বারি লাউ-১, ৩, ৪ ও হাইব্রিড<br>**টমেটো:** রুমা ভি.এফ, বিনা টমেটো-৪, ৫, ৬ ও ৭, বারি টমেটো-৪, ৫, ৬ ও ৭, হাইব্রীড জাত সমূহ<br>**মূগ:** বিএম-১, বারি মুগ-৩ ও বারি মুগ-৪, বিনা মুগ-৩ ও বিনা মুগ-৪<br>**খেসারী:** বারি খেসারী-১ ও বারি খেসারী-২<br>**মটর শূটি:** ইপসা মটরশূটি-২ ও ইপসা মটরশূটি-৩<br>**ফেলন:** বারি ফেলন-১ ও বারি ফেলন-২<br>**তিল:** বারি তিল-৪<br>**তরমুজ:** গ্লোরি<br>**সয়াবীন:** সোহাগ, বারি সয়াবিন-৬<br>**বাদাম:** বিনা চিনাবাদাম-৫* ও বিনা চিনাবাদাম-৬*<br>**মরিচ:** স্থানীয় উন্নত, বারি মরিচ-১, হাইব্রিডের বিভিন্ন জাত<br>**পেঁয়াজ:** তাহের পুরী, বারি পেঁয়াজ-১ ও বারি পেঁয়াজ-৪<br>**মেথী:** বারি মেথী-১ ও বারি মেথী-২<br>**ধনিয়া:** বারি ধনিয়া-১<br>**রসুন:** বারি রসুন-১ ও বারি রসুন-২ |

* লবণাক্ততা সহনশীল

## বিভিন্ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান হতে অবমুক্ত লবণ সহিষ্ণু জাত ও বৈশিষ্ট্য

| ফসল | মৌসুম | জাত | বৈশিষ্ট্য |
|---|---|---|---|
| ধান | আমন | ব্রি ধান ৪০, ব্রি ধান ৪১<br>ব্রি ধান ৫৩, ব্রি ধান ৫৪<br><br>বিনাধান-৭ | লবণাক্ততা সহনশীল<br>চারা ও প্রজনন অবস্থায় ৮-১০ ডিএস/মি পর্যন্ত লবণাক্ততা সহনশীল।<br>লবণ সহিষ্ণু জাত চারা অবস্থায় ১২-১৪ ডিএস/মি এবং পাকা অবস্থায় ৮-১০ ডিএস/মি পর্যন্ত। |
| | বোরো | ব্রি ধান ৪৭, ব্রি ধান ৫৫<br>বিনাধান-১০ | এ জাত চারা অবস্থায় ১২-১৪ ডিএস/মি পানি লবণাক্ততা সহ্য করতে পারে বাকী জীবন কালের জন্য ৬ ডিএস/মিটার। |
| | বোরো/আউশ | ব্রি ধান ৫৫<br><br>বিনাধান ১০ | মধ্যম মানের লবণাক্ততা ৮-১০ ডিএস/মিটার খরা ও ঠাণ্ডা সহনশীল।<br>লবণ সহিষ্ণু ১২-১৪ ডিএস/মিটার উন্নত জাত সম্পন্ন। |
| সরিষা | রবি মৌসুম | বিনা সরিষা ৫<br>ও বিনা সরিষা ৬ | লবণাক্ততা সহ্য ক্ষমতা সম্পন্ন উপকূলীয় অঞ্চলে চাষ উপযোগী। |
| আলু | রবি | বারি আলু-২৫ | লবণাক্ততা সহিষ্ণু, চারা অবস্থায় ১০ ডি.এস/সেমি. মাত্রায় লবণ সহিষ্ণু। |
| চীনাবাদাম | রবি | বিনা চীনাবাদাম ৫<br>বিনা চীনাবাদাম ৬ | ফুল ফোটা থেকে পরিপক্ষ পর্যন্ত ৮ ডিএস/মিটার লবণাক্ততা সহ্য করতে পারে। |
| ইক্ষু | অক্টোবর<br>-জানুয়ারী | ঈশ্বরদি ২৮ | লবণাক্ততা সহিষ্ণু। মুড়ি আখ ভাল হয়। গুড়ের জন্য ভাল। |
| | অক্টোবর<br>-জানুয়ারী | ঈশ্বরদি ৩৯ | খরা, জলাবদ্ধতা, বন্যা এবং লবণাক্ততা সহিষ্ণু। উন্নতমানের গুর তৈরী করা যায়। চর ও মার্জিনাল জমির জন্য উপযোগী। |

**উপকূলীয় মধ্যাঞ্চলের চর সমূহে উপরিস্তরের মাটির লবণাক্ততার নমুনা।**

এখানে ২০১১ সালের পরিমাপগুলিই অন্যান্য উন্মুক্ত চরের প্রায় সমমানের লবণাক্ততা। পরবর্তী বছরের পরিমাপ বেড়ীবাঁধ ও অন্যান্য অবকাঠামো নির্মাণাধীন হওয়ায় লবণাক্ততা ক্রমান্বয়ে নিম্নমূখী।

**পরিমাপ ঃ ইসিই, ডিএস/মি**

| | নভেম্বর/২০১১ | এপ্রিল/২০১২ | ডিসেম্বর/২০১২ | এপ্রিল/২০১৩ |
|---|---|---|---|---|
| চর নাঙ্গুলিয়া | ১১.২ | ২৫.৩ | ৫.৩ | ১৬.১ |
| নলের চর | ৪.৮ | ২৮.০ | ৪.২ | ১৩.০ |
| ক্যারিংচর | ৬.৬ | ৩২.২ | ৩.৯ | ১৫.১ |
| চর জিয়াউদ্দিন | ১০৬ | ১৪.২ | ২.৩ | ৩.২ |
| উড়ির চর | ৮.৫ | ১৬.১ | ৭.১ | ১১.১ |
| | ৮.২ | ২৩.২ | ৪.৬ | ১১.৭ |

ইসিই, ডিএস/ইলেকট্রিক্যাল কনডাকটিভিটি ডেসি সিমেন / মিটার

উপরিস্তর = ০-১০ সেমি

**ফসলে লবণাক্ততার সহিষ্ণু মাত্রার স্তর**

**ফসলে লবণাক্ততার সহিষ্ণু মাত্রাকে আর্ন্তজাতিক ভাবে স্বীকৃত পাঁচটি স্তরের বৈশিষ্ট্য দেয়া হলঃ**

| ইসিই (ডিএস/মি.) | বর্ণনা | বৈশিষ্ট্য |
|---|---|---|
| ০-২ | লবণাক্ত নয় | ফসলের উপর তেমন কোন প্রভাব নেই |
| ২-৪ | মৃদু লবণাক্ত | অত্যন্ত সংবেদনশীল, ফসলের ফলন কিছুটা কমতে পারে |
| ৪-৮ | লবণাক্ত | অনেক ফসলের বাড় বাড়ন্তি কমে যেতে পারে |
| ৮-১৬ | উচ্চ লবণাক্ত | কেবল মাত্র লবণ সহিষ্ণু ফসল/জাত থেকে ফলন আশা করা যায় |
| > ১৬ | অতি উচ্চ লবণাক্ত | খুব কম সংখ্যক ফসল থেকে আশানুরূপ ফলন পাওয়া যায় |

সিডিএসপি এর অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে বাংলাদেশের অনেক ফসল/জাত উচ্চ মাত্রার লবণাক্ততায় সন্তোষজনক ফলন দিতে পারে।

## শস্য উৎপাদনশীল জোন

যেহেতু উপকূলীয় চরাঞ্চলের কৃষি উৎপাদন পদ্ধতি অন্যান্য অঞ্চল হতে ভিন্ন প্রকৃতির, সেহেতু বন্যার প্লাবন গভীরতা এবং মৌসুম বিশেষে মাটি ও পানিতে লবণাক্ততার ভিন্নতা রয়েছে সেহেতু কৃষক উৎপাদন প্রক্রিয়ার সুবিধার্থে শস্য উৎপাদন জোনের একটি ধারনা দেয়া হল।

এই উৎপাদন জোন চিহ্নিত করা এবং ফসলের উপযোগিতা নির্ণয় করার জন্য যে বিষয়গুলি বিবেচনায় নেয়া হয়েছে তা হল

- বর্ষা মৌসুমে বন্যার পানির সর্বোচ্চ গভীরতা
- জমি হতে পানি নিষ্কাশন এবং নেমে যাওয়ার দীর্ঘতা
- শুকনো মৌসুমে অর্থাৎ ফাল্গুন-চৈত্র (মার্চ-এপ্রিল) মাসে মাটির উপর স্তরের লবণাক্ততার পরিমান।

উৎপাদন জোনের চারটি সীমানা চিহ্নিত করে এলাকার মাটি ও পরিবেশ অনুযায়ী কৃষি উৎপাদনের সম্ভাব্যতা অনুসারে ভাগ করা হয়েছে। সে অনুযায়ী প্রযুক্তির ব্যবস্থাপনা ও উৎপাদনে কৃষকদেরকে পথ নির্দেশনা দিতে সাহায্য করবে।

| প্লাবন গভীরতা (সে.মি.) | মাটির লবণাক্ততা, ডিএস/মি | | |
|---|---|---|---|
| | ০-৮ | ৮-১৬ | >১৬ |
| অগভীর প্লাবন ০.২০ | জোন-১ | | |
| মাঝারি নিচু প্লাবন ২০-৪৫ | | জোন-২ | |
| নিচু প্লাবন ৪৫-১০০ | জোন-৩ | জোন-৪ | |
| গভীর প্লাবন >১০০ | | | |

উৎপাদন জোনের বৈশিষ্ট্য

**উৎপাদন জোন-১ (PDZ-1):**

ক) অগভীর প্লাবন, লবণাক্ততা কম বলে সকল মৌসুমে ফসল চাষের অনুকূল পরিবেশ থাকে

- উঁচু ও মাঝারি জমি, জমি সাময়িকভাবে ৪৫ সে.মি. (১১/২ ফুট) পর্যন্ত প্লাবিত হতে পারে
- বৃষ্টির পর উঁচু জমি থেকে কয়েক ঘন্টা থেকে ৩ দিনের মধ্যে পানি নিষ্কাশন হয়ে যায়
- অক্টোবর থেকে নভেম্বরের মধ্যে পানি শুকাতে থাকে

খ) আউশ ধান (খরিফ-১)

- সরাসরি ডিবলিং পদ্ধতিতে বীজ বপন করা ভাল
- খরিফ-১ মৌসুমে সব্জি ও অন্যান্য ফসল চাষ করা যায়

গ) আমন ধান (খরিফ-২)

- উফশী আমন ধানের চাষ করা যায়
- উঁচু জমির ধান থোড় আসার সময় বৃষ্টি না হলে খরার কারণে ক্ষতিগ্রস্থ হয় সেক্ষেত্রে বিনা ধান ৭ এবং ব্রি ধান ৫৬ ও ব্রি ধান ৫৭ চাষ করা যায়।

ঘ) আগাম রবি ফসল

- উঁচু জমিতে আগাম রবি ফসল চাষ করে এপ্রিল মাসে (চৈত্র-বৈশাখ) সর্বোচ্চ লবণাক্ততা (১৬ ডিএস/মি) সমস্যা এড়ানো যায়। তবে যদি কোন বছর দেরিতে বৃষ্টিপাত কম হয় তাহলে আগাম ফসলে মাটির আর্দ্রতার ঘাটতি হতে পারে

খরিফ-১: এ মৌসুমের ফসলের জন্য এপ্রিল (চৈত্র-বৈশাখ) মাসের সর্ব্বোচ্চ লবণাক্ততা ফসলের চারা গাছের জন্য বড় সমস্যা হয়ে দাড়ায়। অপর দিকে বর্ষা মৌসুমের পূর্বে আগাম অতি বৃষ্টি হলে নিচু জমিতে দন্ডায়মান ফসল নষ্ট হয়।
খরিফ-২: বর্ষাকালীন ফসলের জন্য জমির প্লাবন গভীরতা একটি বড় বৈশিষ্ট্য, এ সময় জমির লবণাক্ততা তেমন প্রভাব বিস্তার করে না। কারণ লবণ মাটির উপরি স্তর থেকে চুইয়ে গাছের শিকড়ের নিচে চলে যায়।

**উৎপাদন জোন ২ (PDZ-2):**

অগভীর প্লাবন, মধ্যম উচ্চ লবণাক্ততা, আমন ধানের জন্য অনুকূল পরিবেশ, আউশ ও রবি ফসলের জন্য সীমাবদ্ধতা রয়েছে।

- উঁচু জমি ২০ সে.মি. গভীরতা পর্যন্ত প্লাবিত হয়। লবণাক্ততা বেশী
- মাঝারি উঁচু জমি ২০-৪৫ সে. মি. (১-১১/২ ফুট) গভীরতা হয়। লবণাক্ততা মধ্যম
- অগভীর প্লাবিত জমি থেকে দ্রুত পানি নেমে যায়
- সাধারনত বৃষ্টিপাতের পর কয়েক ঘন্টা থেকে ৩ দিনের মধ্যে পানি নেমে যায়
- মধ্যম প্লাবিত জমি মধ্য নভেম্বর থেকে শুকাতে থাকে

খ) খরিফ-১ (আউশ ধান)

- মাঝারি জমিতে রোপা আউশের চাষ করা যায়
- এই মৌসুমে উচু জমিতে কিছু কিছু সব্জি চাষ করা যায়, যেমন-ডাটা, ঢেড়শ, লাউ, কলমীশাক, শশা, করলা, ইত্যাদি।

গ) খরিফ-২ (আমন ধান)

- উফশী জাতের ধান চাষ করা যায় যেমন- ব্রিধান ৪০, ৪১, ৫১, ৫২, ৫৩ ও ৫৪
- দেরিতে বৃষ্টিপাত না হলে বিলম্বে রোপন করা আমন ধানে ফুল ফোটার সময় ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে।
- উঁচু জমিতে আলোক সংবেদনশীল যেমন-কাজলশাইল, রাজাশাইল মাঝারি জমিতে আলোক সংবেদনশীল জাতের আমন ধান চাষের প্রয়োজন দেখা দেয়।

ঘ) আগাম রবি ফসল

- উঁচু জমিতে কম লবণাক্ততা সহনশীল আগাম রবি ফসল চাষ করা যায়। মধ্যম লবণাক্ততা সহনশীল জাতের সবজি বাটিশাক, পালংশাক, ডাটাশাক, ক্ষীরা, শশা মাঝারি উঁচু জমিতে বিলম্বে রোপন করতে হবে।

**উৎপাদন জোন ৩** (PDZ-3) :

লবণাক্ততা কম তবে মধ্যম থেকে গভীর প্লাবনযুক্ত জমি হওয়ায় সকল মৌসুমে ফসল চাষে সীমাবদ্ধতা আছে। তবে দ্রুত বর্ধনশীল রবি ফসল যেমন বাটি শাক, লাল শাক, পালং শাক, ডাঁটা শাক ইত্যাদি চাষ করা যেতে পারে।

বৈশিষ্ট্য

- মাঝারী নিচু ও নিচু এলাকার কম লবণাক্ততা জমি
- ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহের (অগ্রহায়ন) আগে জমি শুকায়না
- আবার বৃষ্টিপাত দেরীতে হলে জমিতে জানুয়ারী (পৌষ মাস) পর্যন্ত পানি থাকতে পারে
- জমির এ অবস্থা উপকূলীয় অঞ্চলের দক্ষিণ-পূর্ব অংশে বেশী দেখা যায়

ক) খরিফ-১ আউশ ধান

বর্ষাকালে গভীর প্লাবন না হলে রোপা আউশ চাষ করা যায়, অন্যথায় রোপা আমনের চাষ করা যেতে পারে।

খ) খরিফ-২ আমন ধান

উফশী ব্রি ধান৪০ ও ব্রি ধান৪১ জাতের আমন ধানের চাষ করা যায় না। তাছাড়া ব্রি ধান ৫১ ও ব্রি ধান ৫২ পরীক্ষামূলক চাষ করা যায় কারণ এজাত গুলি ১০-১৫ দিন পানির নীচে থাকতে পারে। স্থানীয় জাতের আমন যেমন- রাজাশাইল, কাজলশাইল, ইত্যাদি চাষ করা যায়।

গ) রবি ফসল

দেরীতে বৃষ্টিপাতে জমিতে জলাবদ্ধতার আশংকা না থাকলে নাবী রবি ফসল আবাদ করা যায়। শীত ও গ্রীষ্মকালীন সব্জি চাষের জন্য বেড় বা সর্জান পদ্ধতি ব্যবহার করে লবণাক্ততা এড়ানো যায়।

**উৎপাদন জোন ৪** (PDZ-4)

দীর্ঘায়িত গভীর প্লাবন ভূমি, লবণাক্ততা কম থেকে অধিক মাত্রার যেখানে কেবল আমন ধানের আবাদ করা বা ধানের সাথে মৌসুম ভিত্তিক মাছ চাষের সম্ভাবনা আছে। সেচ সুবিধা থাকলে বোরো ধানের আবাদ করা যেতে পারে।

- নিচু ও খুব নিচু জমি যেখানে লবণাক্ততা যে কোন মাত্রায় থাকতে পারে।
- ডিসেম্বরের (অগ্রহায়ন) ১ম সপ্তাহের আগে জমি থেকে পানি সরে না আবার বৃষ্টিপাত দেরীতে হলে জমিতে জানুয়ারী (পৌষ-মাঘ) মাস পর্যন্ত পানি থাকতে পারে।
- জমিতে প্রায় সবসময় আর্দ্রতা থাকে।
- লম্বা গাছ জাতের স্থানীয় আমন ধান যেমন রাজাশাইল, কাজলশাইল ও উফশী জাতের ব্রিধান৪০ ও ব্রিধান ৪১ এ এলাকার উঁচু অংশে চাষ করা যায়।
- খুব নিচু জমিতে কোন ফসল ফলানো সম্ভব নাও হতে পারে অথবা সেচ সুবিধা থাকলে লবণাক্ততা সহিষ্ণু ব্রি ধান৪৭, ৫৫ ও ৫৮ ও বিনাধান ৮ ও বিনাধান ১০ জাতের বোরো ধানের আবাদ করা যেতে পারে।

## সিডিএসপি প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন চরের উৎপাদনশীলতার জোন চিহ্নিতকরণ

সিডিএসপি প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন চরের উৎপাদনশীলতার জোন চিহ্নিত করে মানচিত্রে নিম্নে দেখান হলো-

### উৎপাদনশীল জোন: চর নাঙ্গুলিয়া

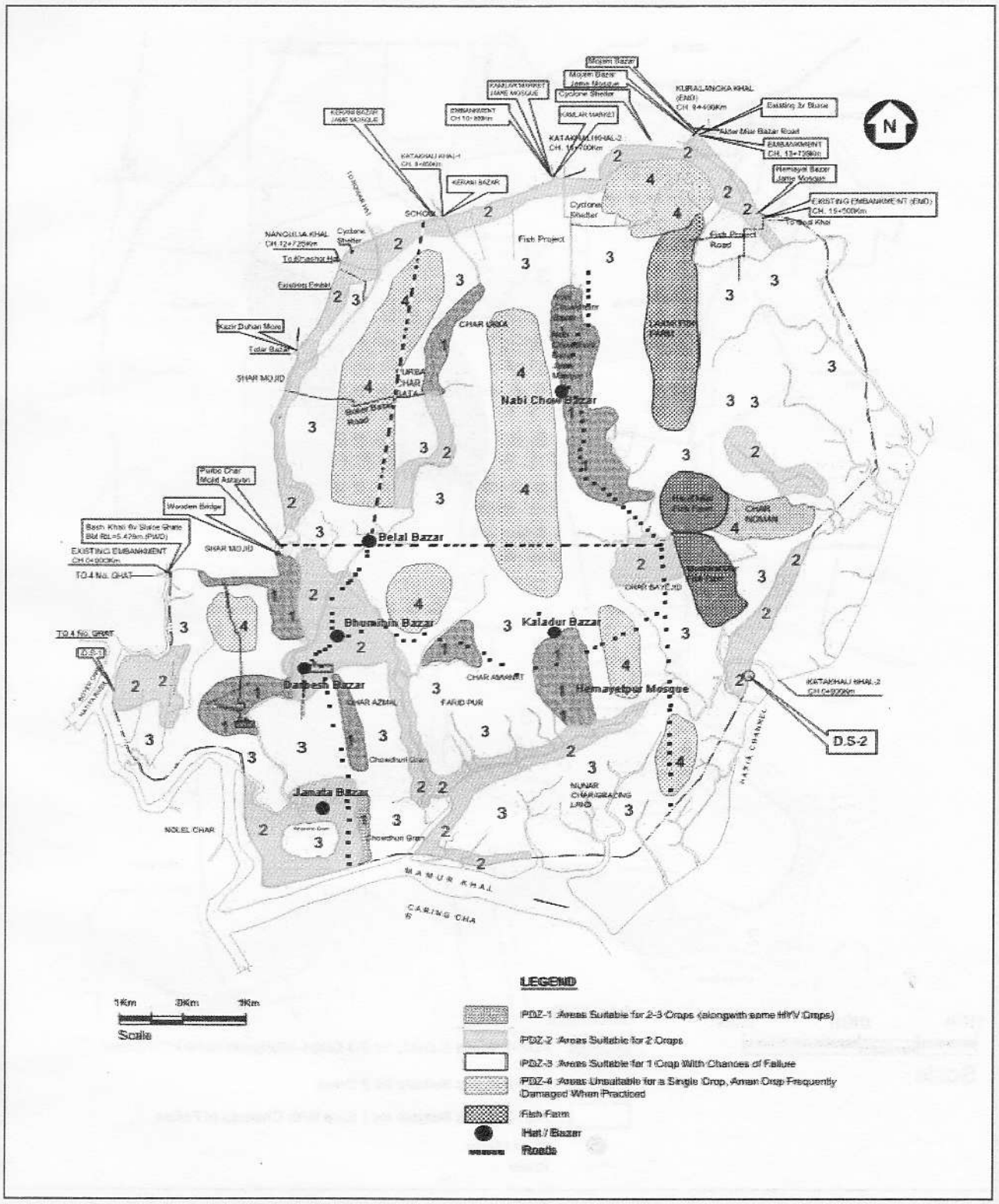

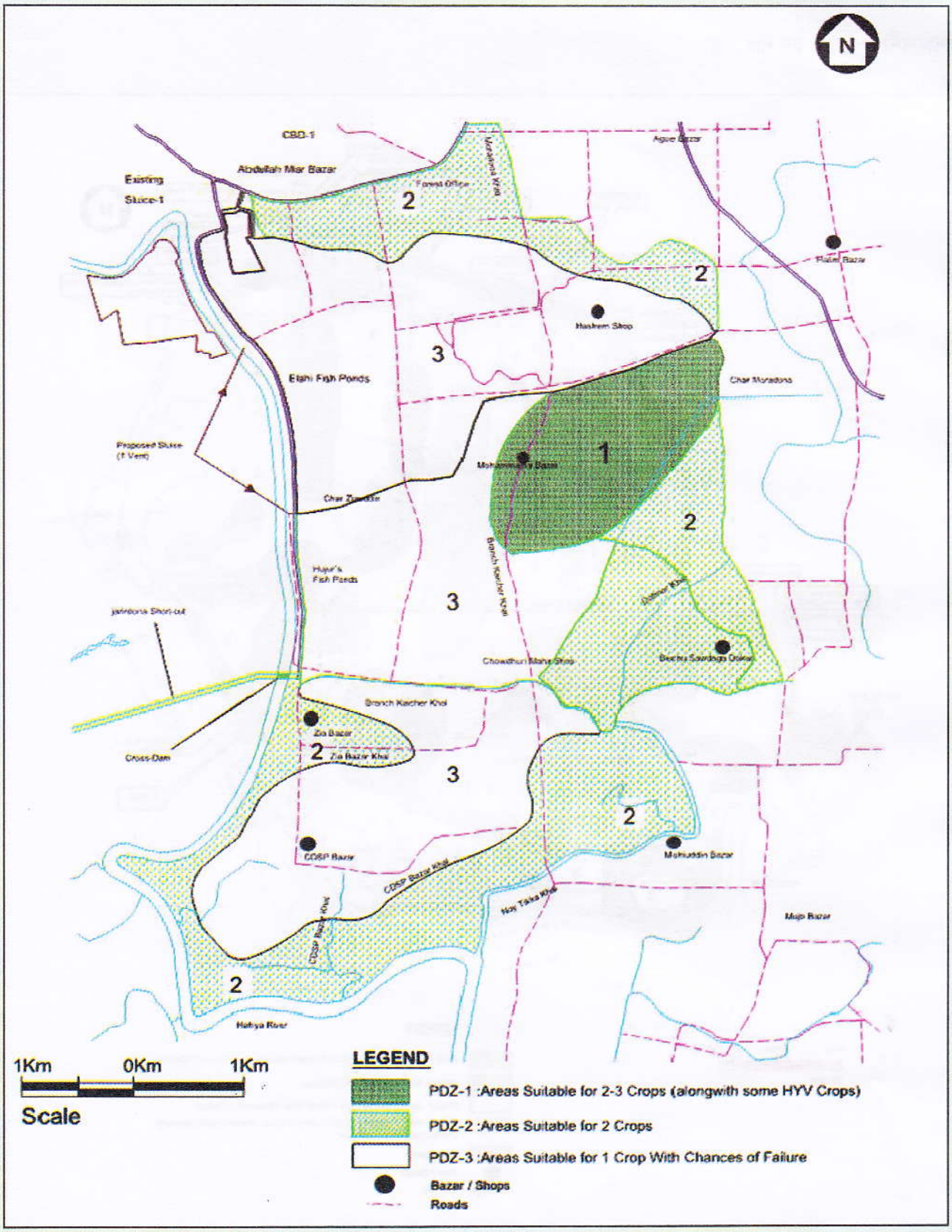

N
CBD-1
Abdullah Miar Bazar
Existing
Sluice-1
Forest Office
Agua Bazar
Hashem Shop
Elahi Fish Ponds
Char Moradona
Proposed Sluice
(1 Vent)
Hujur's
Fish Ponds
Branch Kacher Khal
Chowdhuri Bahar Shop
Beche Saudagar Dokan
Cross-Dam
Zia Bazar
Zia Bazar Khal
CDSP Bazar
CDSP Bazar Khal
Mohiuddin Bazar
Hatiya River
Majo Bazar
1
2
3
1Km
0Km
1Km
Scale
LEGEND
PDZ-1 :Areas Suitable for 2-3 Crops (alongwith some HYV Crops)
PDZ-2 :Areas Suitable for 2 Crops
PDZ-3 :Areas Suitable for 1 Crop With Chances of Failure
Bazar / Shops
Roads

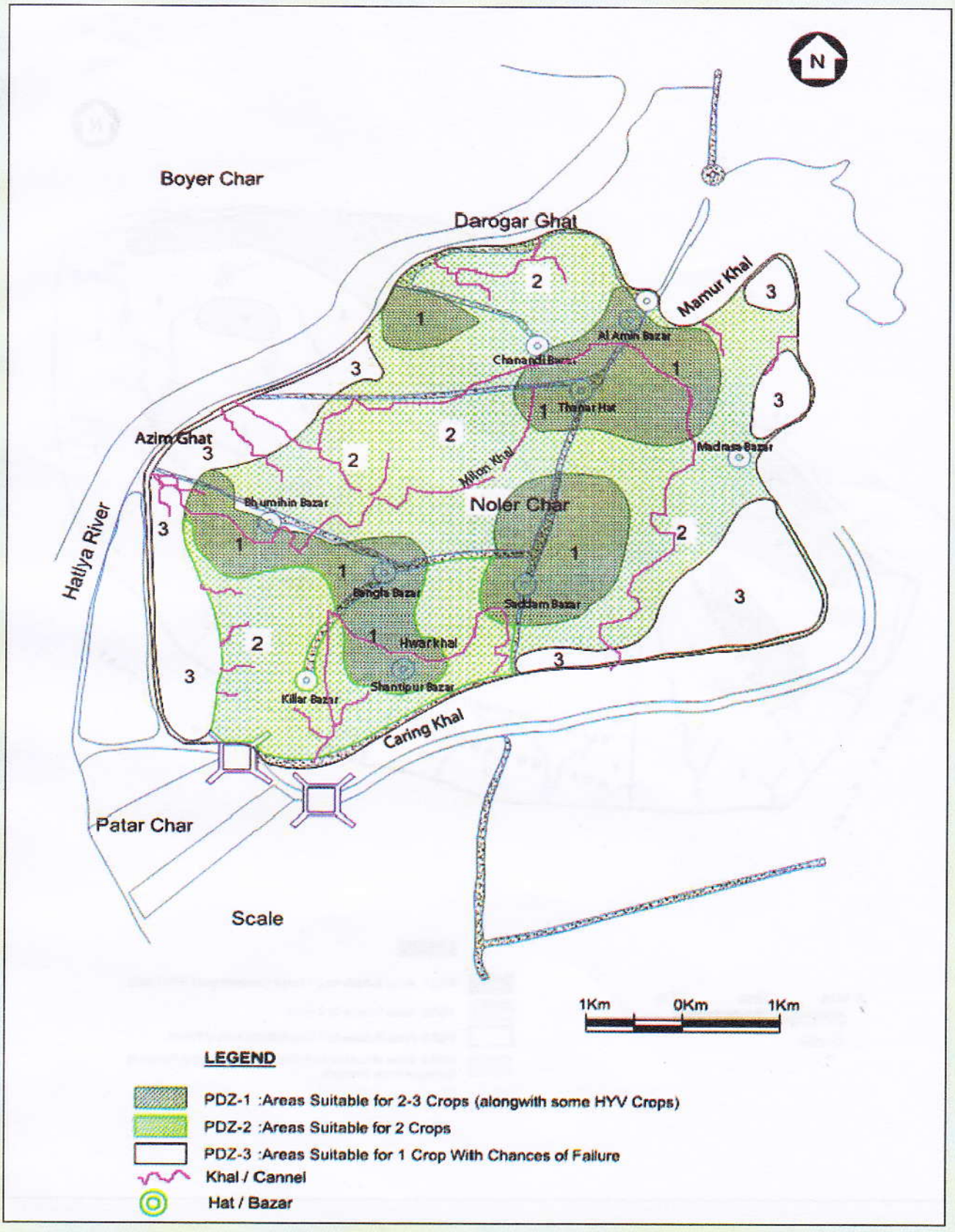
N
Boyer Char
Darogar Ghat
Mamur Khal
Al Amin Bazar
Chanandi Bazar
Thanar Hat
Madrasa Bazar
Azim Ghat
Milton Khal
Bhumihin Bazar
Noler Char
Hatiya River
Bangla Bazar
Saddam Bazar
Hwarkhal
Shantipur Bazar
Killar Bazar
Caring Khal
Patar Char
Scale
1Km
0Km
1Km
LEGEND
PDZ-1 :Areas Suitable for 2-3 Crops (alongwith some HYV Crops)
PDZ-2 :Areas Suitable for 2 Crops
PDZ-3 :Areas Suitable for 1 Crop With Chances of Failure
Khal / Cannel
Hat / Bazar

N
NOLER CHAR
Eastern Drainage Unit
Western Drainage Unit
Southern Drainage Unit
GRAZING LAND
Hatiya Char
Scale
LEGEND
PDZ-1 :Areas Suitable for 2-3 Crops (alongwith some HYV Crops)
PDZ-2 :Areas Suitable for 2 Crops
PDZ-3 :Areas Suitable for 1 Crop With Chances of Failure
PDZ-4 :Areas Unsuitable for a Single Crop, Aman Crop Frequently Damaged When Practiced

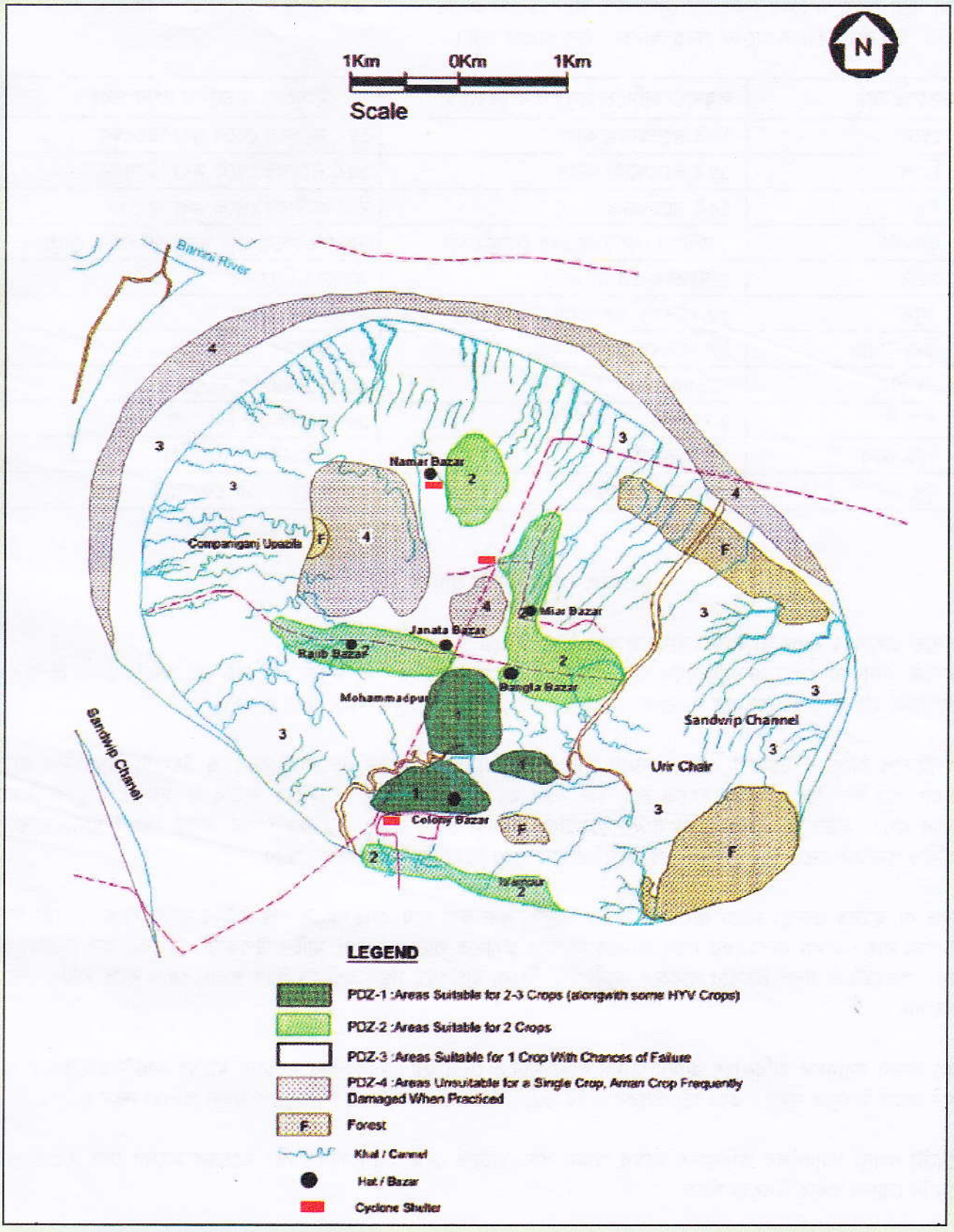

1Km
0Km
1Km
Scale
N
Bamni River
Namar Bazar
Companiganj Upazila
Janata Bazar
Miar Bazar
Rajib Bazar
Bangla Bazar
Mohammadpur
Colony Bazar
Sandwip Channel
Sandwip Chanel
Urir Char
LEGEND
PDZ-1 :Areas Suitable for 2-3 Crops (alongwith some HYV Crops)
PDZ-2 :Areas Suitable for 2 Crops
PDZ-3 :Areas Suitable for 1 Crop With Chances of Failure
PDZ-4 :Areas Unsuitable for a Single Crop, Aman Crop Frequently Damaged When Practiced
Forest
Khal / Cannel
Hat / Bazar
Cyclone Shelter

**লবণাক্ততার প্রতিক্রিয়া এড়ানোর জন্য বিভিন্ন ফসলের উপযুক্ত বপন সময়**

লক্ষ্য করা গেছে বপনের সময় হেরফের করে লবণাক্ততার প্রভাব কিছুটা কমানো যায় অথবা এ সময়টাকে আরো আগে অথবা পরে বপন করলে অনেক সময় অধিক ফলন পাওয়া যায়।

| ফসলের নাম | লবণাক্ত জমিতে অনুকুল বপন সময় | মৌসূমের স্বাভাবিক বপন সময় |
|---|---|---|
| ছোলা | ১৫ই নভেম্বরের আগে | ১৫ই নভেম্বর থেকে মধ্য ডিসেম্বর |
| তিশি | ১৫ই নভেম্বরের আগে | ১৫ই নভেম্বর থেকে মধ্য ডিসেম্বর |
| গম | ১৫ই নভেম্বরের আগে | মধ্য অক্টোবর থেকে মধ্য নভেম্বর |
| টমেটো | সেপ্টেম্বর থেকে নভেম্বর (বীজতলা) | নভেম্বর থেকে মধ্য জানুয়ারী (চারা রোপন) |
| মরিচ | ১ নভেম্বর-১০ ডিসেম্বর | অক্টোবর-ডিসেম্বর |
| রসুন | ১৫ নভেম্বর-২৫ ডিসেম্বর | নভেম্বর-ডিসেম্বর |
| চিনা বাদাম | ১৫ নভেম্বর-১৫ জানুয়ারী | ১৫ অক্টোবর-১৫ নভেম্বর |
| সয়াবীন | নভেম্বর ১-৩০ তারিখ | ১৫ ডিসেম্বর-১৫ জানুয়ারী |
| সুর্যমূখী | ১ নভেম্বর-১৫ নভেম্বর | ১৫ নভেম্বর-১৫ ডিসেম্বর |
| মিষ্টি আলু | ১৫ জানুয়ারী | ১৫ অক্টোবর-১৫ ডিসেম্বর |
| মূগ | ৩১ জানুয়ারী পর্যন্ত | ৩১ জানুয়ারী-১৫ ফেব্রুয়ারী |

## চরাঞ্চলে কৃষক পর্যায়ে লাগসই প্রযুক্তি সমূহ

**লবণাক্ত এলাকায় মালচ বা জাবরা ব্যবহার করে আলু ও টমেটো উৎপাদন**

লবণাক্ত এলাকায় মালচ ব্যবহার করে আলু ও টমেটো উৎপাদনের সাধারন প্রযুক্তি এই বই-এর অধ্যায়-৪ এ বিশদভাবে আলোচনা করা হয়েছে। শুধুমাত্র লবণাক্ত এলাকায় মালচ প্রয়োগের প্রযুক্তি নিম্নে দেয়া হলো।

বাংলাদেশে আলু ও টমেটো অতি জনপ্রিয় দুটি ফসল। দেশের বিভিন্ন এলাকায় আলু ও টমেটো উৎপাদিত হলেও নোয়াখালীর লবণাক্ত এলাকায় সহজে চাষ করা সম্ভব হয় না। লবণাক্ততা ও সেচের অভাব এ অঞ্চলে আলু ও টমেটো চাষের প্রধান অন্তরায়। এমতাবস্থায় গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফল থেকে দেখা যায় কচুরীপানা অথবা খড়ের মালচ ব্যবহারে প্রচলিত পদ্ধতির চেয়ে উলেস্নখযোগ্য পরিমাণ বেশি আলু ও টমেটোর ফলন পাওয় সম্ভব।

**মালচ ব্যবহারের গুরুত্বঃ** মালচ ব্যবহারে মাটির আর্দ্রতা রৰা করা যায় এবং আমন ধান কাটার সাথে সাথে পরবর্তী ফসল লাগানো যায়। মালচ ব্যবহারের ফলে জমিতে আগাছা জন্মাতে পারে না এবং মাটির উপকারী ছত্রাকের কার্যকারীতা বৃদ্ধি পায়। পরবর্তীতে মালচ হিসেবে ব্যবহৃত কচুরীপানা কিংবা খড় পচে গিয়ে জমিতে জৈব পদার্থ যোগ করে মাটির গুণাগুণ বৃদ্ধি পায়।

**আলু বপনঃ** চরাঞ্চলে অধিকাংশ জমির আমন ধান কাটতে দেরী হয়। সাধরনতঃ নভেম্বর মাসের মধ্য সপ্তাহ থেকে আলু বপন করার উপযুক্ত সময়। তবে ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত বপন করলেও আশানুরূপ ফলন পাওয়া সম্ভব।

**টমেটো বপনঃ** চরাঞ্চলের অধিকাংশ জমির আমন ধান কাটতে দেরী হয়। সাধারণতঃ নভেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহ পর্যন্ত টমেটো রোপণ করার উপযুক্ত সময়।

**আলু ও টমেটো উৎপাদনে মালচ প্রয়োগঃ** মালচ হিসেবে কচুরীপানা ব্যবহার করলে কয়েকদিন রোদে শুকিয়ে নিতে হবে।

তারপর কচুরীপানা দিয়ে ২৫-৩৫ সে.মি. পুরু করে মাটি দিয়ে ঢেকে দিতে হবে। কচুরীপানার পরিবর্তে ধানের খড়ও ব্যবহার করা যায়। খড় কেটে ছোট করে দিলে ইঁদুরের উপদ্রব কম হয়। তাছাড়া ধানের খড়ের অবশিষ্টাংশ বা চিটাও মালচ হিসেবে ব্যবহার করা যায়। বিনা চাষেও মালচ ব্যবহার করে টমেটো/ আলুর উৎপাদন করা যায়। এ ক্ষেত্রে সমস্ত সার কাঁদাময় জমিতে ছিটিয়ে মই দিতে হবে। তারপর নির্দিষ্ট রোপণ দূরত্বে টমেটো/ আলু বীজ স্থাপন করে তা মালচ দিয়ে ঢেকে দিতে হবে। পুরু মালচ্ ২৫-৩৫ সে.মি. ব্যবহার করলে আগাছা দমন করার প্রয়োজন হয় না।

**ডিবলিং পদ্ধতিতে আউশ ধানের চাষ**

উৎপাদন জোন-১ এর জমিতে ফাল্গুন-চৈত্র (মধ্য মার্চ থেকে মধ্য এপ্রিল) সময়ে দু একটি মৌসুমী বৃষ্টিপাতের পর ধানের বীজ সরাসরি বপন করতে হবে। তবে উৎপাদন জোন-২ এর ক্ষেত্রে বৈশাখ (মে) মাসের প্রথমার্ধে বীজ ডিবলিং করতে হবে অথবা জৈষ্ঠ্য (জুন) মাসের শেষ দিকে চারা রোপন করতে হবে। যাহোক, লবণাক্ত অঞ্চলে বীজ ডিবলিং করার চেয়ে চারা রোপন করা অধিক সুবিধাজনক। ধানের চারা উৎপাদনের জন্য বীজতলা তৈরী ও চারা রোপন পদ্ধতি স্থানীয় পরিবেশের উপর নির্ভর করে।

**রবি মৌসুমের বিশেষ প্রযুক্তি**

উপকূলীয় চরাঞ্চলে অপেক্ষাকৃত কম লবণাক্ত জমিতে খেসারী, মুগ, ফেলন, সয়াবিন, মিষ্টি আলু এবং মরিচ আবাদ করা হচ্ছে। পরীক্ষায় নিশ্চিৎ হওয়া গেছে যে এ সব জমিতে জাবরা (মালচ) সহ গোল আলু চাষ লাভজনক। উৎপাদন জোন-১ এবং উৎপাদন জোন-২ এর যে সব জমিতে লবণাক্ততা মাত্রা ১৪ ডিএস/মি. এর কম সেখানে খেসারী, মিষ্টি আলু এবং মরিচ এর সাথে সাথে চিনাবাদাম ও তিশি আবাদ করা যায়।

খেসারী সাধারণত: আমন ধানের জমিতে অনুঃফসল বা রিলে ফসল হিসেবে চাষ করা হয়। আমন ধানের জমি থেকে আবদ্ধ পানি শুকিয়ে গেলে খেসারী সরাসরি ছিটিয়ে বপন করা ভাল। তিশি একটু আগাম বপন করলে মৌসুমের শেষের দিকের লবণাক্ততা সমস্যা এড়ানো যায়। উৎপাদন জোন-২ এর জন্য চিনাবাদামের চাষ কিছুটা ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে যায়। কারণ এ জমি বর্ষার প্রারম্ভে জলাবদ্ধ হয়ে পড়ে বিধায় কৃষককে পানিতে ডুবে থাকা বাদাম সংগ্রহ করতে হয়। এরূপ জমি থেকে উঠানো চিনাবাদাম মেঘলা আবহাওয়ার কারণে শুকানো যায় না বলে কৃষক ক্ষতিগ্রস্থ হয়। উৎপাদন জোন-৩ এর জমি জানুয়ারী (পৌষ-মাঘ) মাসের আগে শুকায় না এবং বর্ষার শুরুতেই পানিতে তলিয়ে যায়। এরূপ পরিবেশে কিছু পাতা জাতীয় সবজি যেমন বাটিশাক, ডাটা শাক ও লালশাক চাষ করা যায়।

**উপকূলীয় চরাঞ্চলের কৃষি প্রধানত:** বৃষ্টি-নির্ভর বিধায় জমিতে পানি সংরক্ষণের জন্য কৃষকগন জমির আইলগুলো বেশ উচু করেন। অন্যদিকে মাটিতে পলি বেশির কারণে জমিতে জমে থাকা পানির নিম্নমূখি নিষ্কাশন খুব ধীর গতিতে হয়। এ অবস্থায় জমির পানি স্বাভাবিক ভাবে নিষ্কাশিত হয় না। ফলে জমির উপরিভাগে জমে থাকা লবণাক্ততা বের করে দেয়ার সুযোগ থাকে না। এ ধরনের জমিতে কৃষি উৎপাদন বাড়াতে জমির লবণ ব্যবস্থাপনা মুখ্য ভূমিকা রাখে। কয়েকটি ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন দিক এখানে উল্লেখ করা হল।

**জমিতে উঁচু বেড ও নালা পদ্ধতি (Furrow & Ridge Method):** বিশ্বের প্রায় সব নূতন লবণাক্ত এলাকায় এ পদ্ধতি বিশেষভাবে সমাদৃত। জমিতে পর্যায়ক্রমে উঁচু ও নীচু বেড তৈরী করতে হবে। দু বেডের মাঝ থেকে মাটি তুলে উঁচু বেড আলগা মাটি থেকে বৃষ্টির সময় লবণ ধুইয়ে নালার মধ্যে পড়ে ফলে বেডগুলোর লবণাক্ততা কমে যায়। তাই বেডের উপর বিভিন্ন ধরনের ফসল চাষ করা যায়। সুযোগ থাকলে সব নালাগুলোকে একমূখী করে জমির যে কোন প্রান্তে তৈরী একটি নিষ্কাশন নালার সাথে যোগ করে দিলে জমি থেকে লবণ বের করে দেয়া যাবে। এ পদ্ধতিটি বিশেষ করে উৎপাদন জোন ২ ও ৩ এর বেলায় বেশি প্রযোজ্য।

**সর্জান পদ্ধতিতে সবজি ও ফলের চাষ:** উপকূলীয় চরাঞ্চলের অধিকাংশ জমিতে অতিরিক্ত আর্দ্রতা বা জমে থাকা পানি এবং লবণাক্ততার কারণে সবজি চাষ ব্যাহত হয়। এরূপ পরিবেশে সর্জান পদ্ধতির মাধ্যমে সারা বছরই সবজি চাষ করা সম্ভব। জমিতে উঁচু ও নীচু বেড তৈরী করতে হবে। উঁচু বেডের লবণ বৃষ্টির সময় ধুয়ে নীচের বেডে যায় বলে উঁচু বেডে প্রায় সব ধরনের ফসল বিশেষ করে শাক সবজি চাষ করার উপযোগী হয়। নীচু বেডে ধানের চাষ বা ধানের সাথে মাছ বা লতিরাজ

কচুর চাষ করা যায়। নীচু বেডের এক প্রান্ত নিষ্কাশন নালার সাথে যোগ করে প্রয়োজনের বেশি পানি বের করে দেয়া যায়। এ পদ্ধতিটি ইন্দোনেশিয়ার নিম্নাঞ্চল এবং বাংলাদেশের বরিশাল, ভোলা ও পটুয়াখালী অঞ্চলে বেশ জনপ্রিয়।

**আগাম ভূমি কর্ষণ:** আগাম রবি মৌসুম (আমন ধান কাটার পর) জমি শুকাতে শুরু করলে মাটির নীচের স্তর থেকে উপরে উঠে আসা পানির সাথে সাথে লবণও উঠে এসে মাটির উপরে জমা হয়। ফলে মাটির উপরের স্তরে লবণাক্ততা বেড়ে যায়। পানির এ উপরে উঠে আসা বন্ধ করতে জমিতে আগাম চাষ দিয়ে ফেলে রাখতে হবে। রবি ফসল রোপনের আগে যদি বৃষ্টিপাত হয় তবে প্রতিবার বৃষ্টির পর একবার করে চাষ দিতে হবে। উৎপাদন জোন-১ এবং উৎপাদন জোন-২ এর মাধ্য থেকে উচ্চ লবণাক্ততা জমিতে এ ধরনের ভূমি কর্ষণ খুব উপকারী।

**জাবরা বা মাল্চ ব্যবহার:** নোয়াখালীর উপকূলীয় চরাঞ্চলের কৃষকগণকে জাবরা বা মাল্চ ব্যবহার করে কেবলমাত্র মরিচের বীজতলা তৈরী করতে দেখা গেছে। অথচ এ পদ্ধতি সরাসরি মাঠে ব্যবহার করে সফলভাবে গোল আলুর চাষ করা যায়। ইদানিং এ পদ্ধতি ব্যবহার করে সবজি চাষেরও চেষ্টা করা হচ্ছে।

জমিতে প্রয়োজনীয় সারসহ চাষ দিয়ে বীজ বপন/রোপন করে মাটির উপর ধানের খড় ছিটিয়ে প্রায় দু ইঞ্চি পুরো বিছানা করে দিতে হবে। এতে একদিকে যেমন জমির রস তাড়াতাড়ি শুকাবে না অন্যদিকে মাটির নীচ থেকে লবণও পানির সাথে তাড়াতাড়ি উপরে উঠে আসবেনা। মাল্চ এর কারণে জমিতে আগাছাও জন্মাতে পারবে না। কালক্রমে এ মাল্চ পঁচে গিয়ে মাটির উর্বরতা বাড়াবে।

**ড্রিপ পদ্ধতিতে সেচ প্রদান:** ফসলের গোড়ায় তার দৈনিক প্রয়োজন অনুযায়ী ফোঁটা ফোঁটা আকারে পানি দেয়াকে ড্রিপ সেচ পদ্ধতি বলে। উপকূলীয় চরাঞ্চলে সেচ সুবিধা খুব সীমিত। বসতবাড়ীর পাশে ছোট পুকুর বা জমির নিকট দিয়ে প্রবাহিত খাল সেচের পানির একমাত্র উৎস। কিন্তু খালগুলিতে কখনও পর্যাপ্ত পানি থাকে না। রবি মৌসুমে ঠিক যখনই সেচের প্রয়োজন হয় তার আগেই খালগুলো শুকিয়ে যায়। এরূপ সীমিত পরিমান পানির সর্বোচ্চ ব্যবহার করার জন্য ড্রিপ সেচ পদ্ধতি অনুসরন করা যায়। কিন্তু চারাঞ্চলের গরীব কৃষকগণ এর প্রয়োজনীয় ভৌত অবকাঠামো জোগাড়ে সমর্থ নয়। এ ক্ষেত্রে এ পদ্ধতির ধারনা বা কৌশল কাজে লাগিয়ে স্থানীয় বিকল্প পদ্ধতি অনুরসন করা যেতে পারে। এ ধারনার মূল বিষয় হচ্ছে গাছের গোড়া সব সময় ভিজা রেখে একদিকে লবণাক্ততা সমস্যার মোকাবিলা করা অন্যদিকে সীমিত সেচের মাধ্যমে পানির সর্বোত্তম ব্যবহার করে ফসলের প্রয়োজনীয় রস সরবরাহ করা। চরাঞ্চলের কৃষকগন যেহেতু অল্প জমিতেই সবজির চাষ করে সেহেতু পরিবারের সকল সদস্যগন বিশেষ করে মহিলা ও শিশুদের শ্রমে একটি রাবার পাইপ দিয়ে জমির নিকট উঁচু মাচার উপর স্থাপিত ড্রাম বা এরূপ কোন জলাধার থেকে গাছের গোড়া দৈনিক অন্তত: একবার ভিজিয়ে দেবে। অথবা বদনা, ঝাজরী বা এরূপ কোন পাত্র দিয়েও গাছের গোড়া ভেজাতে পারে। তবে এক্ষেত্রে কিছুটা বাড়তি শ্রমিক প্রয়োজন হবে। যেহেতু এ পদ্ধতিতে কেবলমাত্র অধিক মূল্যবান ফসল যেমন টমেটো, মরিচ, তরমুজ যা সারি করে চারা রোপনের মাধ্যমে চাষ করা হয়, সেহেতু কিছুটা অতিরিক্ত শ্রমকে পুষিয়ে নিবে।

# অধ্যায়-৪
# বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব।

## জলবায়ু পরিবর্তনের প্রাথমিক ধারণা

### আবহাওয়া

কোন নির্দিষ্ট স্থানের কোন নির্দিষ্ট দিন বা সময়ের বায়ুমন্ডলের উষ্ণতা, বায়ুর চাপ, বায়ু প্রবাহ, আপেক্ষিক আর্দ্রতা, মেঘ এবং বৃষ্টির নি:সরণ (Precipitation) ও তাদের মিথষ্ক্রিয়ার সামগ্রিক ফলাফলই হলো আবহাওয়া। সাধারনত: আবহাওয়ার হিসাব প্রতিদিনই নেয়া হয়।

### জলবায়ু

জলবায়ু হল আবহাওয়ার গড় ফলাফল। জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক আন্ত:সরকার প্যানেল (আইপিসিসি) এর মতে কোন নির্দিষ্ট স্থানের নির্দিষ্ট সময়ের আবহাওয়ার উপাদান গুলোর যেমন দৈনিক তাপমাত্রা, বৃষ্টিপাত, আপেক্ষিক আর্দ্রতা ইত্যাদির গড় ফলাফলই হলো জলবায়ু। সাধারনত: এটি কমপক্ষে ৩০ বছরের রেকর্ড হতে হবে।

### জলবায়ু পরিবর্তনের ধারণা

জলবায়ু পরিবর্তন কোন নতুন বিষয় নয়। সৃষ্টির পর থেকে অদ্যাবধি জলবায়ুর প্রতিনিয়ত পরিবর্তন হচ্ছে এবং ভবিষ্যতেও হতে থাকবে। কিন্তু বিগত কয়েক দশকে জলবায়ু পরিবর্তনের বিষয়টি বিশেষ করে মানুষের সৃষ্ট কারণ গুলি পর্যালোচনা করে বর্তমানে এটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা হিসাবে চিহ্নিত। পৃথিবীর বহুদেশে এখন জলবায়ুর প্রভাব লক্ষ্য করা যাচ্ছে। তন্মধ্যে বাংলাদেশ এবং বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চল সবচাইতে বেশী ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা হিসেবে চিহ্নিত।

জলবায়ু পরিবর্তন বলতে জলবায়ুর উপাদান গুলোর গড় দীর্ঘমেয়াদী গড় পরিবর্তনকেই বুঝায়। জলবায়ু পরিবর্তন সাধারনত: প্রাকৃতিক ও মানুষের দ্বারা সৃষ্টির কারণে জলবায়ু এবং বায়ুমন্ডলের বিভিন্ন উপাদান গুলোর পরিবর্তনের ফলে ঘটে থাকে। জাতিসংঘের জলবায়ু পরিবর্তন সম্পর্কিত কনভেনশন ফ্রেমওয়ার্ক (UNFCCC) অনুযায়ী বলা যায় মানুষের সৃষ্ট কারণে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে যে পরিবর্তন সাধিত হয় এবং যে কারণ গুলি পৃথিবীর বায়ুমন্ডলের উপাদানগুলোর ভৌত পরিবর্তন সাধন করে তাকে জলবায়ু পরিবর্তন বলে।

জলবায়ু পরিবর্তনকে প্রধানত: দুইভাগে ভাগ করা যায়-
১। প্রাকৃতিক কারণ ২। মানুষের দ্বারা সৃষ্ট কারণ।

### জলবায়ু পরিবর্তনের প্রাকৃতিক কারণ

জলবায়ু পরিবর্তনের প্রাকৃতিক কারণগুলো অন্যতম হলো:

- সূর্য ও পৃথিবীর মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কের পরিবর্তন
- পৃথিবীর অক্ষকোণের পরিবর্তন (Change of earth axial tilt)
- পৃথিবীর কক্ষপথের পরিবর্তন (Change of earth orbit)
- সূর্যের অনুসুর অবস্থানের অয়নচলন (Procession of the perihelion)
- সূর্যের শক্তি উৎপাদনের হ্রাস বৃদ্ধি (Variation in solar output)
- মহাদেশসমূহের স্থান পরিবর্তন (Continental drift)
- সমুদ্র স্রোত ও মহাসাগরসমূহের সঞ্চিত উত্তাপ শক্তির পরিবর্তন (Change in heat stored in ocean)
- আগ্নেয়গিরির দূষণ (Volcanic pollution)
- এল নিনো (El Nino) এবং লা নিনা (La Nina)-এর প্রভাব।

## জলবায়ু পরিবর্তনে মানুষের সৃষ্ট কারণ

জলবায়ু পরিবর্তনে মানুষের সৃষ্ট উল্লেখযোগ্য কারণগুলো হলো:

- ১৯ শতকের সূচনালগ্ন এবং শিল্প বিপ্লবের পর থেকে, বিদ্যুৎ উৎপাদন, কল-কারখানা, যানবাহন, দৈনন্দিন কাজে ব্যাপকহারে জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার বেড়ে যাওয়ায় বায়ুমন্ডলে গ্রীন হাউস গ্যাস নির্গমনের হার বেড়ে গিয়ে এর ঘনত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে পৃথিবী ক্রমাগত উষ্ণতর হচ্ছে।
- নির্বিচারে বন উজাড় করা, ভূমি ও জলাভূমি পরিবর্তন এবং কৃষি কাজে অনিয়ন্ত্রিত সার ব্যবহার, জৈবিক পচনের ফলে মিথেনের নির্গমন, শহরাঞ্চলে বর্জ্য এবং আবর্জনা থেকে নির্গত অনিয়ন্ত্রিত মিথেন গ্যাস, কৃষি কাজের ফলে উৎপন্ন নাইট্রাস অক্সাইড ইত্যাদি।
- রেফ্রিজারেটর, ডিপফ্রিজ, ফ্রিজ, বিভিন্ন ধরনের শিল্প-কারখানায় ব্যবহৃত সিএফসি, হ্যালোন, ফ্রেয়ন ইত্যাদি গ্যাসের ব্যবহার।
- এ ছাড়া বায়ু দুষণজনিত কারণে মিথেন, জলীয়বাষ্প এবং ওজোন প্রভৃতি গ্যাসের ঘনত্ব বায়ুমন্ডলে বৃদ্ধির ফলে জলবায়ু পরিবর্তনকে ত্বরান্বিত করছে ফলশ্রুতিতে পৃথিবী ক্রমাগত উষ্ণতর হচ্ছে।
- বিভিন্ন খনিতে বিশেষ করে কয়লা খনি থেকে উৎপন্ন কার্বন-ডাইঅক্সাইড গ্যাস, প্রাকৃতিক গ্যাস খনি থেকে নির্গত (Gas flaring and leakage) মিথেন গ্যাস বায়ুমন্ডলে ছড়িয়ে পড়ে।

## বাংলাদেশে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব

জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচীর এক তথ্যে জানা যায় বিগত ৩৮ বছরে ২০০৭ সালে উত্তর বঙ্গের ৩টি জেলায় প্রায় ৫° সে. তাপমাত্রা বেড়ে যাওয়ার ফলে এক লক্ষ লোক এতে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে এবং ১৩০ জন মৃত্যুবরণ করেছে। গত ১৪ বছরে, ২৭শে এপ্রিল ২০০৯ তারিখে যশোরে ৪২° সে. তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে। ১৯৮৯ সালে বগুড়ায় সর্বোচ্চ ৪৪° সে. তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে। বিগত ৪৫ বছরে ঢাকার ডায়রিয়া হাসপাতাল আইসিডিডিআরবি-তে এই হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার পর থেকে সর্বোচ্চ সংখ্যক রোগী ভর্তি করা হয়েছে। দেশ বিগত ২০০২, ২০০৩, ২০০৪ ও ২০০৭ সালে বন্যায় আক্রান্ত হয়েছে। ২০০৭ সালে একই বছরে জুলাই-আগষ্ট এবং সেপ্টেম্বর মাসে বন্যায় আক্রান্ত হয়ে ৩২০০০ বর্গ কিলোমিটার এলাকার ১ কোটি ৬০ লক্ষ মানুষ ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে।

জলবায়ু পরিবর্তনে বাংলাদেশ মারাত্মক ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে এবং কমবেশি বিভিন্ন সেক্টরে এর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাব বিরাজমান। যে সেক্টরগুলি জলবায়ু পরিবর্তনে মারাত্মক ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে, তার মধ্যে বাংলাদেশের জন্য নিম্নোক্ত সেক্টরগুলো প্রধান:

১) কৃষিসম্পদ
২) পানিসম্পদ
৩) জনস্বাস্থ্য
৪) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা
৫) নগর ও অভিবাসন
৬) বন ও জীববৈচিত্র
৭) মৎস্য ও সমুদ্র সম্পদ
৮) অবকাঠামো ও বসতিস্থাপনা
৯) মানুষের জীবিকায়ন।

## বাংলাদেশে কৃষি সম্পদের সম্ভাব্য ঝুঁকি সমূহ

### কৃষি সম্পদ

বিভিন্ন সূত্রে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে দেখা যায় তাপমাত্রা বৃদ্ধি এবং মৌসুমী বৃষ্টিপাতের তারতম্য বাংলাদেশে জলবায়ু নির্ভর কৃষি সেক্টরকে মারাত্মকভাবে প্রভাবিত করছে এবং ভবিষ্যতেও করবে। আইপিসিসির ৩য় প্রতিবেদনের মতে, ২০৫০ সালের মধ্যে বাংলাদেশের তাপমাত্রা বৃদ্ধি এবং বায়ুমন্ডলে কার্বণডাই অক্সাইড এর ঘনত্ব বৃদ্ধির ফলে ধানের উৎপাদন ৮% এবং গমের উৎপাদন ৩২% হ্রাস পেতে পারে। আরেকটি প্রতিবেদনে বলা হয় যে, সমুদ্রের উচ্চতা বৃদ্ধির ফলে উপকূলীয় এলাকায় সমুদ্রের লবণাক্ততা অনুপ্রবেশের ফলে গমের উৎপাদন ব্যাপক কমে যাবে যার ফলে আমাদের ৫৮৬.৭৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ক্ষতি হতে পারে। বন্যা, খরা, উপকূলীয় এলাকায় লবণাক্ততার সম্প্রসারনসহ, ঘুর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের ফলে কৃষি সম্পদ মারাত্মক হুমকির মুখে পড়বে ফলে এদেশের খাদ্য নিরাপত্তা মারাত্মকভাবে বিঘ্নিত হবে। শুধু সমুদ্রের উচ্চতা বাড়ার ফলে ২০৩০ সালের মধ্যে বাংলাদেশ ১৪০০০ টন খাদ্যশস্য উৎপাদন থেকে বঞ্চিত হবে। সাম্প্রতিক প্রকাশিত এক প্রতিবেদন থেকে দেখা যায় যে, সমুদ্রের উচ্চতা বেড়ে যাওয়ার ফলে আমন ধানের উৎপাদন ব্যাহত হবে। জলবায়ু

পরিবর্তনের ফলে আমন, বোরো, উচ্চফলনশীল ধান, গম ইত্যাদি অর্থনৈতিকভাবে লাভজনক হবে না। আবার কোনো কোনো গবেষনায় দেখা যায় যে, মৌসুমে বায়ুমন্ডলে কার্বনডাই অক্সাইড এর ঘনত্ব বেড়ে যাওয়ার ফলে শস্য উৎপাদন বেড়ে যেতে পারে। যার ফলে বাংলাদেশে ধানের উৎপাদন ২০% বেড়ে যেতে পারে। অন্যদিকে গমের উৎপাদন ৩১% কমে যেতে পারে। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে কৃষকদের সার্বিক উৎপাদন খরচ (যেমন: সেচ, সার, কীটনাশক ইত্যাদি) বেড়ে যাবে এবং সামগ্রিকভাবে কৃষি উৎপাদন ব্যাহত হওয়ার ফলে খাদ্য নিরাপত্তা হুমকির মুখে পড়বে।

**বাংলাদেশের উপকূলীয় এলাকায় জলবায়ু পরিবর্তন ও প্রভাব**

বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চল বা জোন অত্যন্ত ঘনবসতিপূর্ণ এবং সম্পদশালী এলাকা। এদেশটি বঙ্গোপসাগরের অববাহিকার মধ্যে অবস্থিত এবং প্রায় ৭২০ কি.মি. এলাকা জুড়ে এর অবস্থান। এই উপকূলীয় অঞ্চলটি বহুমূখী ঝুঁকিপূর্ণ ও প্রাকৃতিক দুর্যোগপূর্ণ যথা ঘুর্ণিঝড়, জলোচ্ছাস, বন্যা ও নদীভাঙ্গন প্রবণ এলাকা হিসেবে চিহ্নিত। উপরন্ত সাম্প্রতিক কালে এর সাথে যুক্ত হয়েছে ভূমিকম্প, সুনামী এবং জলবায়ু পরিবর্তনের মত দুর্য়োগ। বাংলাদেশ সরকার এই উপকূলীয় এলাকা সমূহকে কৃষি বাস্তুসংস্থান (Ecological) সুবিধাবঞ্চিত ও অনুন্নত এলাকা হিসাবে চিহ্নিত করেছে।

উপকূলীয় এলাকার সাধারন তথ্য নিম্নে দেয়া হলো (২০০৭ সাল):

| বিভাগ | জেলা | আয়তন (০০) | জনসংখ্যা | উপজেলা |
|---|---|---|---|---|
| ১. বরিশাল | ১. বরিশাল | ২৭৮৫ | ২৩৮৪৪৪০ | ১০ |
| | ২. বরগুনা | ১৮৩১ | ৮৪৫০৬০ | ০৫ |
| | ৩. ভোলা | ৩৪০৩ | ১৭০৩২০০ | ০৭ |
| | ৪. ঝিনাইদহ | ৭৪৯ | ৬৯২৬৮০ | ০৪ |
| | ৫. পটুয়াখালী | ৩২২১ | ১৪৬৪৮০০ | ০৭ |
| | ৬. পিরোজপুর | ১৩০৮ | ১০৯৯৭৮০ | ০৬ |
| ২. চট্টগ্রাম | ৭. চাঁদপুর | ১৭০৪ | ২২৪১০২০ | ০৮ |
| | ৮. চট্টগ্রাম | ৫২৮৩ | ৬৫৪৩৮৬০ | ২৬ |
| | ৯. কক্সবাজার | ২৪৯২ | ১৭৫৯৫৬০ | ০৭ |
| | ১০. ফেনী | ৯২৮ | ১২০৫৯৮০ | ০৫ |
| | ১১. নোয়াখালী | ৩৬০১ | ২৫৭০৬৪০ | ০৬ |
| | ১২. লক্ষীপুর | ১৪৫৬ | ১৪৮৬৫৪০ | ০৪ |
| ৩. ঢাকা | ১৩. গোপালগঞ্জ | ১৪৯০ | ১১৫১৮০০ | ০৫ |
| | ১৪. শরিয়তপুর | ১১৮২ | ১০৮০৬৮০ | ০৬ |
| ৪. খুলনা | ১৫. বাগেরহাট | ৩৪৫৯ | ১৫১৬৮২০ | ০৯ |
| | ১৬. যশোর | ২৫৫৭ | ২৪৬৯৬৮০ | ০৮ |
| | ১৭. খুলনা | ৪৩৯৪ | ২৩৫৭৯৪০ | ১৪ |
| | ১৮. নড়াইল | ৯৯০ | ৬৯৪৯০০ | ০৩ |
| | ১৯. সাতক্ষিরা | ৩৮৫৮ | ১৮৪৫১২০ | ০৭ |
| মোট = ০৪ | ১৯ | ৪৬৬৯১ | ৩৫১১৪৫০০ | ১৪৭ |

প্রাপ্ত তথ্যে দেখা যায় বাংলাদেশের মোট এলাকার ৩২% এবং মোট জনসংখ্যার প্রায় ২৫% অর্থাৎ ৩.৫১ কোটি লোক বসবাস করে। উপকূলীয় এলাকাকে সাধারনত: দু'ভাগে ভাগ করা যায়। সামুদ্রিক সন্নিকটবর্তী এলাকা এবং তৎসংলগ্ন দূরবর্তী এলাকা। মোট ১৯টি জেলার (১৪৭টি উপজেলার) মধ্যে ১২টি জেলার ৪৮টি উপজেলাই হলো সামুদ্রিক তীরবর্তী অথবা সন্নিকটবর্তী এবং অবশিষ্ট ৯৯ টি উপজেলা ইন্টেরিয়র কোস্ট হিসেবে বিবেচিত।

এই বিস্তির্ণ উপকূলীয় এলাকা সমূহ বিভিন্ন ভাবে নিম্নলিখিত কারণ সমূহের জন্য ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে:

**প্রথমত:** আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে আমাদের উপকূলীয় এলাকা সমূহ বর্ধিত জনসংখ্যা, সীমিত সম্পদের ব্যবহারে প্রতিযোগীতা, প্রাকৃতিক এবং মনুষ্য সৃষ্ট দুর্যোগ, পর্যাপ্ত অর্থনৈতিক সুবিধার অভাব এসমস্ত বহুবিধ কারণে উপকূলীয় এলাকার জনগনের জীবন জীবিকা বিভিন্ন ভাবে ক্ষতিগ্রস্থ।

**দ্বিতীয়ত:** শুকনো মৌসুমে প্রায় ১০০ কি.মি. জুড়ে নদী ও খাল দিয়ে মূল ভূখন্ডে লবণাক্ত পানি প্রবেশ করে। ফলে নিরাপদ পানির অভাবে প্রায় ১০ লক্ষ ৭ হাজার হেক্টর কৃষি জমি লবণাক্ত পানি দ্বারা আক্রান্ত হয়।

**তৃতীয়ত:** বনজসম্পদ নিধন, পানিবাহিত রোগ, বন্য প্রাণীর নিরাপদ আশ্রয় স্থল ধবংস করা, লবণ সঞ্চিত হওয়া, পানি ও বায়ু দূষন, ইত্যাদি জলবায়ু পরিবর্তনের উপর বিভিন্ন ভাবে প্রভাব ফেলে, ফলে স্বাভাবিকভাবে খাদ্য উৎপাদনে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়।

**চতুর্থত:** বিভিন্ন অনুসন্ধানী জরিপে দেখা যায় দেশের অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় চরাঞ্চলের জীবনমান, জনপ্রতি বা পরিবার পিছু জমির প্রাপ্যতা, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও অন্যান্য মৌলিক সেবা, সামাজিক নিরাপত্তা ইত্যাদি অত্যন্ত অপ্রতুল।

**পঞ্চমত:** সমুদ্রের উচ্চতা বৃদ্ধি, তাপমাত্রা বৃদ্ধি, বাষ্পভবন বৃদ্ধি, বৃষ্টিপাতের তারতম্য সহ নদীর গতি প্রকৃতি এই উপকূলীয় এলাকাকে আরো অধিক অনিরাপদ করতে সাহায্য করেছে। ফলে জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকিপূর্ণ ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ সমূহ উপকূলীয় জনগনের জীবন ধারণ আরো বিপদাপন্ন করে তুলেছে।

## জলবায়ু পরিবর্তনে অভিযোজন কৌশল

অভিযোজন বলতে জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে সৃষ্ট প্রতিকূল অবস্থায় এলাকার মানুষের পরিবর্তিত পরিস্থিতির সাথে খাপ খাওয়ানোর সক্ষমতা বৃদ্ধি করা বুঝায়। যেমন: উপকূলীয় জনগন তাদের ঘরবাড়ী ঘুর্ণিঝড় ও জলোচ্ছাস থেকে নিরাপদে রাখার জন্য ঘরের খুটি, চালা মজবুত করে তৈরী করা এবং বাড়ীর চারপাশে গাছের সবুজ বেষ্টনী দিয়ে প্রবল বাতাসকে প্রতিহত করা ও এক ধরনের অভিযোজন।

**অভিযোজন কৌশল সমূহ:**

- ক্ষয়ক্ষতি থেকে সাধ্যমতো নিজেদের রক্ষা করা
- ক্ষয়ক্ষতি কমানো বা ঝুঁকি কমানোর প্রচেষ্টা নেয়া
- পূর্ব প্রস্তুতি গ্রহন করা
- ক্ষয়ক্ষতির ব্যাপারে অন্যদের সাথে আলোচনা করা
- ক্ষয়ক্ষতির হাত থেকে সম্পদ পূনরুদ্ধার করা, ইত্যাদি।

**কৃষিক্ষেত্রে অভিযোজনের উদাহরন:**

- জলবায়ু সহনশীল ফসল উদ্ভাবন ও চাষাবাদ করা, যেমন- খরা, বন্যা, লবণাক্ততা ইত্যাদির উদ্ভাবিত সহনশীল জাতের ফসল চাষ করা
- কম সময়ের ফসল বা জাত চাষ করা
- বন্যা প্রবন এলাকায় ভাসমান পদ্ধতিতে যেমন: বায়রায় চাষাবাদ করা
- শস্য বীমা করে রাখা
- উন্নত ও সমন্বিত পানি ব্যবস্থাপনা
- কম পরিমান পানি লাগে এমন ফসল উৎপাদন করা
- প্রয়োজনবোধে চাষের সময় পরিবর্তন করা
- গাছের গোড়ায় খড়, কচুরিপানা ইত্যাদি দিয়ে মালচিং করা
- সম্পুরক সেচের ব্যবস্থা রাখা
- প্রযোজ্য ক্ষেত্রে জমির আইল উঁচু করে পানি সংরক্ষন করা

**জলবায়ু পরিবর্তনজনিত প্রধান প্রধান দুর্যোগ**

১) ঘুর্ণিঝড়
২) খরা
৩) বন্যা
৪) নদী ও কূল ভাঙ্গন
৫) জলোচ্ছ্বাস।

## বাংলাদেশে বিগত ৫০ বছরের প্রাকৃতিক দুর্যোগ

বাংলাদেশে সাধারণত: মধ্য মার্চ-মে থেকে সেপ্টেম্বর-ডিসেম্বর এর মধ্যে বিশেষ করে ঘুর্ণিঝড় আঘাত হানার সম্ভাবনা বেশী থাকে। বিগত ৫০ বছর অর্থাৎ ১৯৬০-২০০৯ পর্যন্ত ১৯টি বড় ধরনের দুর্যোগ/ঘুর্ণিঝড় বাংলাদেশে আঘাত হেনেছে। প্রায় সকল দুর্যোগ ও ঘূর্ণিঝড়ে উপকূলবর্তী এলাকা সমূহ সবচেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে এবং প্রাণহানীর সংখ্যা ছিল সর্বাধিক। সাম্প্রতিক কালে ঘুর্নিঝড়ের আগাম সংকেত প্রচারে বিভিন্ন গনমাধ্যম বিশেষ ভূমিকা পালন করে আসছে। যা নিম্নে উল্লেখ করা হলোঃ

## বাংলাদেশে ঘুর্ণিঝড়ের সংকেত ব্যবস্থা

| সামুদ্রিক বন্দরের জন্য সংকেত | |
|---|---|
| সংকেত | সংকেত-এর অর্থ |
| ১ নং দূরবর্তী সতর্ক সংকেত | সমুদ্রের কোন একটা অঞ্চলে ঝড়ো হাওয়া বইছে এবং সেখানে ঝড় সৃষ্টি হতে পারে। |
| ২ নং দুরবর্তী হুঁশিয়ারি সংকেত | একটি ঘুর্ণিঝড় সৃষ্টি হয়েছে। |
| ৩ নং স্থানীয় সতর্ক সংকেত | বন্দর দমকা হাওয়ার সম্মুখীন হচ্ছে। |
| ৪ নং স্থানীয় হুঁশিয়ারি সংকেত | বন্দর ঝড় এর সম্মুখীন হচ্ছে, তবে বিপদের আশঙ্কা এমন নয় যে চরম নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহন করতে হবে। |
| ৫ নং বিপদ সংকেত | অল্প বা মাঝারি ধরনের ঘুর্ণিঝড়ের প্রভাবে বন্দরের আবহাওয়া দুর্যোগপূর্ণ থাকবে এবং ঝড়টি বন্দরের দক্ষিণ দিক দিয়ে উপকূল অতিক্রম করার আশঙ্কা রয়েছে। মংলা বন্দরের বেলায় পূর্বদিকে অতিক্রম করতে পারে। |
| ৬ নং বিপদ সংকেত | অল্প বা মাঝারি ধরনের ঘুর্ণিঝড়ের প্রভাবে বন্দরের আবহাওয়া দুর্যোগপূর্ণ থাকবে এবং ঝড়টি বন্দরের উত্তর দিক দিয়ে উপকূল অতিক্রম করার আশঙ্কা রয়েছে। মংলা বন্দরের বেলায় পশ্চিম দিক দিয়ে অতিক্রম করতে পারে। |
| ৭ নং বিপদ সংকেত | অল্প বা মাঝারি ধরনের ঘুর্ণিঝড়ের প্রভাবে বন্দরের আবহাওয়া দুর্যোগপূর্ণ থাকবে এবং ঘুর্ণিঝড়টি বন্দরের নিকট অথবা উপর দিয়ে উপকূল অতিক্রম করার আশঙ্কা রয়েছে। |
| ৮ নং বিপদ সংকেত | অল্প বা মাঝারি ধরনের ঘুর্ণিঝড়ের প্রভাবে বন্দরের আবহাওয়া দুর্যোগপূর্ণ থাকবে এবং ঘুর্ণিঝড়টি বন্দরের দক্ষিণ দিক দিয়ে উপকূল অতিক্রম করার আশঙ্কা রয়েছে। মংলা বন্দরের বেলায় পূর্বদিকে অতিক্রম করতে পারে। |
| ৯ নং মহাবিপদ সংকেত | প্রচন্ড ঘুর্ণিঝড়ের প্রভাবে বন্দরের আবহাওয়া দুর্যোগপূর্ণ থাকবে এবং ঘুর্ণিঝড়টি উত্তর দিক দিয়ে উপকূল অতিক্রম করার আশঙ্কা রয়েছে। মংলা বন্দরের বেলায় পশ্চিম দিক দিয়ে অতিক্রম করতে পারে। |
| ১০ নং মহাবিপদ সংকেত | প্রচন্ড ঘুর্ণিঝড়ের প্রভাবে বন্দরের আবহাওয়া দুর্যোগপূর্ণ থাকবে এবং ঘুর্ণিঝড়টি নিকট অথবা উপর দিয়ে উপকূল অতিক্রম করার আশঙ্কা রয়েছে। |
| ১১ ত্রুটিপূর্ণ এবং সম্পূর্ণ যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন | প্রলয়ংকরী ঘুর্ণিঝড়ের প্রভাবে আবহাওয়া অধিদপ্তরের সাথে সকল যোগাযোগ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন। |

## জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ে আন্তর্জাতিক উদ্দোগ

১৯৭৯ সালের ১২-১৩ ফেব্রুয়ারী প্রথম বিশ্ব জলবায়ু সম্মেলন বিশ্ব আবহাওয়া সংস্থার উদ্দোগে সুইজারল্যান্ডের জেনেভা শহরে অনুষ্ঠিত হয়। এটি বিশ্ব জলবায়ু পরিবর্তন সম্পর্কিত প্রথম আন্তর্জাতিক সম্মেলন। পরবর্তিতে জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ে স্বাধীন বৈজ্ঞানিক মতামত, গবেষনা ও তথ্য সরবরাহ এবং নীতি নির্ধারনী পর্যায়ে সুপারিশ মালা পেশ করার তাগিদে বিশ্ব আবহাওয়া সংস্থা এবং জাতিসংঘ জলবায়ু কমিটির যৌথ উদ্দোগে ১৯৮৮ সালে সুইজারল্যান্ডের জেনেভায় প্রতিষ্ঠিত হয় জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক আন্তঃসরকার প্যানেল বা Inter-governmental Panel on Climate Change বা IPCC। জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক জাতিসংঘ ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশন United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) হলো স্বাধীন রাষ্ট্রগুলির জন্য গ্রীন হাউস গ্যাস সীমিত রাখার ব্যাপারে জাতিসংঘ কর্তৃক ধরিত্রী সম্মেলনে গঠিত একটি আন্তর্জাতিক চুক্তি। এই চুক্তিটি ১৯৯২ সালের মে মাসে স্বাক্ষরের জন্য উম্মুক্ত করা হয়। এই কনভেনশনটি কার্যকর হয় ১৯৯৪ সালের মার্চ মাসে। এই কনভেনশনে স্বাক্ষরকারী রাষ্ট্রগুলোকে তিনভাগে ভাগ করা যায় যথা:-

১) এনেক্স-১ রাষ্ট্র সমূহ (মূলত: শিল্পোন্নত রাষ্ট্র সমূহ) - ৪০টি দেশ।
২) এনেক্স-২ রাষ্ট্র সমূহ (উন্নত দেশ যারা স্বল্পোন্নত দেশকে সহযোগিতা দেয়) - ২৩টি দেশ।
৩) উন্নয়নশীল দেশ সমূহ (যারা উন্নত দেশ থেকে সাহায্য সহযোগীতা পায়)।

**কিয়োটো চুক্তি (Kyoto Protocol):** এটি UNFCCC এর সাথে সম্পর্কিত গ্রীন হাউস গ্যাস নির্গমন কমানো বিষয়ক একটি আইনগত চুক্তিনামা।

**কনফারেন্স অব পার্টিস (Conference of Parties) CoP:** এটি হলো UNFCCC স্বাক্ষরকারী রাষ্ট্রগুলো গ্রীন হাউস নিঃসরন কমানোর ব্যাপারে এবং এ বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহনের তাগিদে প্রতিবছর একটি সম্মেলনে মিলিত হয়। জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় গৃহীত বিভিন্ন আন্তর্জাতিক উদ্দোগ, ইস্যু এবং সিদ্ধান্ত এই সম্মেলনে গ্রহন করা হয়। বিভিন্ন দেশে ২০১৩ সাল পর্যন্ত মোট ১৮টি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং জলবায়ু পরিবর্তনে আন্তর্জাতিকভাবে মোকাবিলা করার জন্য বিভিন্ন কৌশল ও উদ্দোগ গ্রহন অব্যাহত আছে।

## জলবায়ুর পরিবর্তন প্রশমনে বনায়ন

জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য দায়ী গ্রীন হাউজ গ্যাস নির্গমন কমানোর প্রযুক্তিগত বা নীতিগত কৌশল হলো প্রশমন (Mitigation)। প্রশমনের মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য দায়ী প্রক্রিয়াগুলোকে বিভিন্ন প্রযুক্তিগত বা নীতিগত প্রক্রিয়ার মাধ্যমে কমানো যায়। প্রশমনের এই প্রযুক্তিগত বা নীতিগত প্রক্রিয়াগুলো হলো নিম্নরূপঃ

**জ্বালানি সরবরাহে:** জ্বালানি সরবরাহ ও বিতরণ ব্যবস্থার কার্যক্ষমতা ও দক্ষতা বাড়ানো; জীবাশ্ম জ্বালানির পরিবর্তন (যেমন; কয়লা থেকে গ্যাস জ্বালানিতে রূপান্তর, কয়লার ব্যবহার কমিয়ে গ্যাস ব্যবহার বৃদ্ধি, ইত্যাদি), শক্তির সংরক্ষণ ও কার্যক্ষমতা বাড়ানো; নিউক্লিয়ার শক্তির ব্যবহার; বিভিন্ন প্রকার নবায়নযোগ্য শক্তির ব্যবহার (যেমন: সৌরশক্তি, পানি বিদ্যুৎ বায়ু শক্তি, জৈব জ্বালানি, ভূ-তাপ শক্তি ইত্যাদি।

**যানবাহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থায়:** জ্বালানি সাশ্রয়ী যানবাহনের ব্যবহার বৃদ্ধি করা; হাইব্রিড যানবাহন; রূপান্তরিত যানবাহন ব্যবহার করা। সড়ক পথে ভ্রমণ কমিয়ে রেলপথ ও অন্যান্য গণপরিবহন ব্যবস্থায় ভ্রমণ এবং সুবিধা বাড়ানো; জনগণের জন্য অধিক হারে সিএনজি-চালিত বাস সার্ভিস চালু করা; অযান্ত্রিক যানবাহন যেমন: সাইকেল চালানোকে উৎসাহিত করা এবং পদব্রজে ভ্রমণ বৃদ্ধি করা। ব্যাটারি চালিত বা বৈদ্যুতিক যানবাহন বাড়ানো; নৌপথে ভ্রমণ বাড়ানো এবং যোগাযোগ ব্যবস্থার পরিকল্পনা ও উন্নয়ন।

**ঘরবাড়িতে:** বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী বাড়ির ব্যবহার বৃদ্ধি করা। যেমন: বিদ্যুৎ ও জ্বালানি সাশ্রয়ী এবং কার্যকরী গৃহস্থালি যন্ত্রপাতি (যেমন: উন্নত চুলা, বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম ইত্যাদি) এর ব্যবহার করা; ঘরের জানালা বড় রাখা এবং পর্যাপ্ত আলো-বাতাস প্রবেশের ব্যবস্থা করা; সম্ভব হলে দিনের বেলায় ঘর আলো করে রাখার জন্য সুর্যের আলোর ব্যবহার করা; বড় বড় ফ্ল্যাটে ও বহুতল ভবনে সৌরবিদ্যুৎ ব্যবহার বাধ্যতামূলক করা; স্বয়ংক্রিয়ভাবে নিয়ন্ত্রিত হয় এমন ধরনের প্রযুক্তির ব্যবহার; উন্নত তাপীয় এবং শীতলীকরণ যন্ত্রের ব্যবহার; শীতকালে সৌরশক্তি ব্যবহার করে পানি গরম রাখা।

**কলকারখানায়:** বিভিন্ন ধরনের জ্বালানি এবং বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী যন্ত্রপাতি ও উপকরণের বৃদ্ধি করা; তাপ ও শক্তির পুনরুদ্ধার এবং পুনরায় ব্যবহার; বিভিন্ন প্রকার স্বয়ংক্রিয়: মোটর, বয়লার ও অন্যান্য যন্ত্রপাতির ব্যবহার বৃদ্ধি করা যা বিদ্যুৎ ও জ্বালানি সাশ্রয়ী; অধিক মাত্রার প্রক্রিয়াজাতকরণ প্রযুক্তির ব্যবহার।

**কৃষিকাজে:** উন্নত ভূমি ব্যবস্থাপনা ও চাষাবাদ পদ্ধতির প্রবর্তন করা যার মাধ্যমে পানি ও ডিজেলের ব্যবহার কম হয়; পশুপালন ও সার ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন যাতে মিথেন গ্যাসের নির্গমন কম হয়; নাইট্রোজেন সারের পরিমিত ব্যবহার; ভূমি ব্যবস্থাপনায় উন্নয়ন; জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার কমিয়ে বিশেষ ধরনের জ্বালানি ফসলের (Energy crop) চাষ করা; জ্বালানির দক্ষতা বাড়ানো।

**বর্জ্য ব্যবস্থাপনায়:** বর্জ্য ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে আবর্জনার ভাগাড় থেকে মিথেন গ্যাস অবমুক্ত করার মাধ্যমে পুনরুদ্ধার করা; জৈব আবর্জনা ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে কম্পোষ্ট সারে রূপান্তরিত করা। বর্জ্য পানি নিয়মিত শোধনের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণে রাখা। Recycling বা পুনঃব্যবহার করে বর্জ্য কমানো; অক্সিজেনেশনের জন্য জৈব আবরণ ও জৈব ছাকুনি ব্যবহার করা।

**বনায়ন ও বন ব্যবস্থাপনাঃ** বনায়ন করা; পুনঃবনায়ন করা; কৃষিবনায়ন, বনায়ন ব্যবস্থাপনা উন্নততর করা, উপকূলীয় বনায়ন ও সামাজিক বনায়ন করা; জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার কমিয়ে উন্নত প্রযুক্তিতে জ্বালানি কাঠ ব্যবহার করা; বন উজাড় বন্ধ করা; নগর বনায়ন করা; শহর এলাকায় সবুজের সমারোহ বাড়ানো।

প্রশমনের প্রযুক্তিগত বা নীতিগত প্রক্রিয়ার একটি অংশ হিসেবে বনায়ন ও বন ব্যবস্থাপনার আওতায় চর এলাকায় সামাজিক বনায়ন কর্মসূচির মাধ্যমে যে সমস্ত বনায়ন কার্যক্রম করা সম্ভব তার সংক্ষিপ্ত বর্ননা নিম্নে দেয়া হলো;

## সড়ক বনায়ন

**সড়ক বাগান সৃজনের নক্সা / পরিকল্পনাঃ** পরিকল্পিতভাবে সড়ক বনায়নের নক্সা তৈরী করে বাগান সৃজন করা উচিত। রাস্তার ঢালের প্রশস্ততার উপর নির্ভর করে নক্সা নির্বাচন করতে হবে। সাধারনভাবে সড়ক বনায়নে রাস্তার উভয় পাশে একসারি করে চারা রোপণ করা উচিত। তবে রাস্তার ঢালের প্রশস্ততা যদি ১.৫ মিটারের বেশী হয় তবে রাস্তার প্রতি পার্শ্বে ২ সারি বা তারও বেশী সারিতে চারা রোপণ করা সম্ভব। দুই সারি বাগান সৃজনের সময় অবশ্যই জলমগ্নতার স্তর, পাশাপাশি কৃষি জমির অবস্থা (কোনভাবেই বড় ক্রাইনযুক্ত গাছ যা ভবিষ্যতে কৃষি জমির উর্বরতার ক্ষতি করতে পারে, তা না লাগানো ভাল) এবং সে অনুযায়ী বৃক্ষের প্রজাতি নির্বাচন করতে হবে। মাঝে মাঝে জলমগ্নতার সম্ভাবনা থাকলে নিচের সারিতে যে সকল গাছ জলমগ্নতা সহ্য করতে পারে, সে সকল গাছ রোপণ করতে হবে।

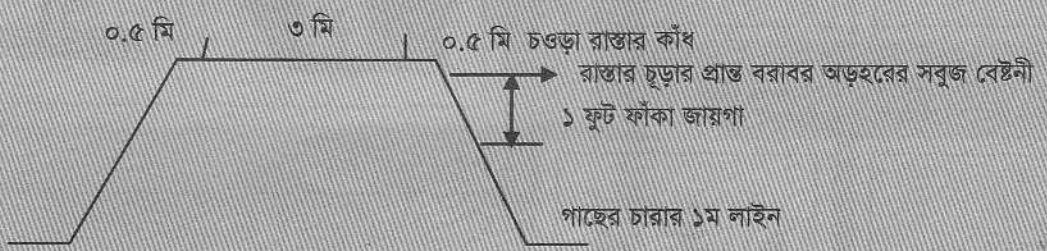


**চিত্র: রাস্তার পার্শ্বে এক সারি চারা রোপণের আদর্শ নক্সা/পরিকল্পনা (Layout Plan)**

**বাগান সৃজনের নক্সা/পরিকল্পনা প্রনয়ণে করণীয় কাজসমূহ :**

অ. সড়ক বা রাস্তার প্রান্ত রেখা (কিনারা) থেকে ১০-১২ ইঞ্চি নীচে অড়হরের সারি নিরবচ্ছিন্ন ভাবে লাইন পদ্ধতিতে বপন করতে হবে।

আ. অড়হরের (সবুজ বেষ্টনীর) সারির ১ফুট নীচে রাস্তার ঢালে গাছের প্রথম সারি লাইন পদ্ধতিতে রোপণ করা হবে। সারিতে ৬ ফুট অন্তর অন্তর স্বল্প, মধ্যম ও দীর্ঘ আবর্তের নুতন চারা গাছ লাগানো হবে।

ই. সড়ক বা রাস্তার একেবারে নিচের প্রান্তে (ঢালের নীচের দিকে জমি থেকে ১ফুট উপরে) ধইঞ্চার সারি লাগানো যেতে পারে।

ঈ. রাস্তার ঢালের প্রশস্ততা বেশী হলে প্রতি পার্শ্বে একাধিক সারিতে চারা রোপণ করা যায়। প্রথম সারি হতে ৫-৭ ফুট দূরে গাছের ২য় সারি লাগানো যেতে পারে । সেক্ষেত্রে ৬ ফুট ব্যবধানে ত্রিভুজাকৃতির সজ্জা পরিকল্পনায় গাছের চারা একটার পর একটা লাগাতে হবে যাতে গাছের বৃদ্ধি ভাল হয়।

উ. দ্বিতীয় সারিতে যে সকল চারা রোপণ করা হবে সেসকল গাছের সাময়িক জলাবদ্ধতা সহ্য করার ক্ষমতা থাকতে হবে। চরাঞ্চলে মাঝে মাঝে জোয়ার বা অতিবৃষ্টিতে সাময়িক জলাবদ্ধতা সৃষ্টি হয়ে থাকে। যে সকল গাছ সাময়িক বন্যা পরিস্থিতি সহ্য করতে পারে যেমন জারুল, অর্জুন, বাবলা, পিটালী, নোনা ঝাউ, করমচা, মান্দার, হিজল ইত্যাদি লাগাতে হবে।

ঊ. রাস্তা বা বাধেঁ গাছ লাগানোর ক্ষেত্রে একই প্রজাতির চারা একটার পর একটা দীর্ঘস্থান জুড়ে লাগানো উচিত নয়। তাহলে রোগ বালাই ও গাছের বৃদ্ধি ব্যাহত হতে পারে। স্বল্প, মধ্যম ও দীর্ঘ আবর্তের মিশ্র প্রজাতির বাগান প্রতিষ্ঠা করাই সর্বোত্তম পন্থা।

রাস্তার ঢালে গর্ত খোঁড়ার ব্যাপারে সর্বদা সতর্ক থাকতে হবে। চারা রোপণ ও কৃষি ফসল উৎপাদনের জন্য পরিমিত গর্ত খোঁড়ার স্থান ছাড়া রাস্তার ঢালে ঘাসের ছাপড়া কোনভাবেই বিনষ্ট করা যাবে না। ঢালের মাটি আলগা হলে সামান্য বৃষ্টির ফলেই পানি গড়িয়ে রাস্তার ঢালের ক্ষতি হবে এবং রাস্তা ধ্বসে পড়তে পারে। এ সকল ব্যাপারে উপকারভোগী ও বনবিভাগের কর্মকর্তাগনের সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে।

চিত্র: চারা রোপনের সময় অনুসরনীয়পদ্ধতি সমূহ

## বাঁধ বনায়ন

বাঁধ বনায়ন সাধারণত: সড়ক ও রেললাইন বনায়নের ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত পদ্ধতি অনুসরন করে করা হয়। বাঁধের এলাকা থেকে বনায়নের জন্য বনায়ন পূর্ব ম্যাপ তৈরী করা হয়। বনায়নের কয়েক মাস আগেই কাজটি সম্পাদন করতে হবে। পরবর্তীতে বনায়ন শেষেও একটি ম্যাপ তৈরী করা উচিত। এছাড়া বনায়ন পূর্ব ম্যাপে কি কি প্রজাতির গাছ রোপণ করা হবে তার বিবরণ লিপিবদ্ধ করতে হবে। সড়ক বনায়নের মত করে এক্ষেত্রে ও জরীপ কাজ করতে হবে।

**বাঁধ বনায়নের মডেল ও পরিকল্পনা:** বাঁধ বনায়নের ক্ষেত্রে দুই ধরনের মডেল বা নক্সা অনুসরন করা হয়। বলাই বাহুল্য যে তা সড়ক বনায়নের মডেল সদৃশ। বাঁধ বনায়নের জন্য দুই সারিতে বৃক্ষ রোপণের নক্সা / মডেল ও কোন কোন ক্ষেত্রে তিন বা ততোধিক সারিতে বৃক্ষ রোপণ করা যায়। তবে বাঁধের কিনারায় নীচের দিকে ধইঞ্চার সারি লাগানো উচিত। তেমনি উপরের অংশের প্রান্তসীমায় অড়হরের সারি লাগাতে হবে। অন্যদিকে এর মাঝ খানে দুই সারি বা তিন সারিতে বৃক্ষ রোপণ করতে হবে। বাঁধের ঢালের উপর ভিত্তি করে তিন বা ততোধিক সারিতে চারা গাছ লাগানো যায়। এক্ষেত্রে বাঁধের ঢালের উচ্চতার উপর ভিত্তি করে বাঁধের ভিতরের দিকের খাঁড়া অংশে ২ থেকে ৩ সারি এবং বাইরের (সমুদ্রের) দিকের ঢালে ৪ থেকে ৬ সারি গাছ লাগানো যায়। নীচে চিত্রের মাধ্যমে বাঁধ বনায়নের একটি মডেল দেখানো হলো।

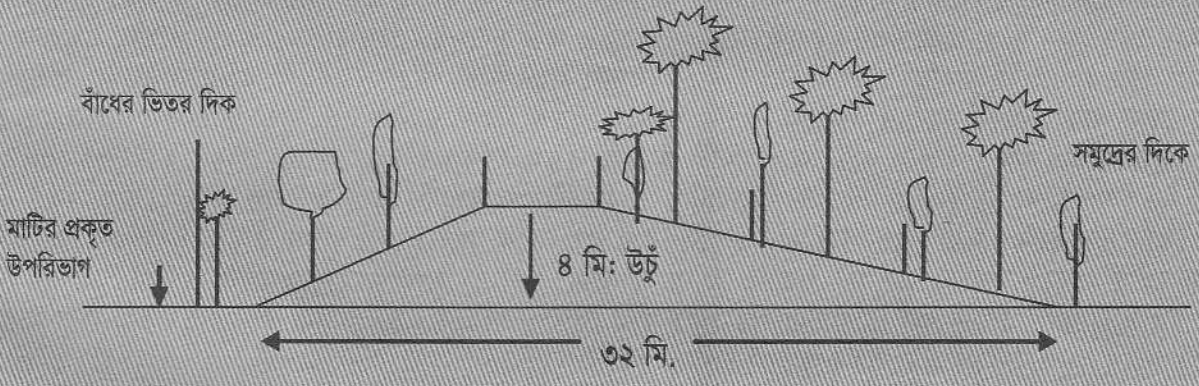


**চিত্র: বাঁধ বনায়নের একটি মডেল দেখানো হলো।**

**বাঁধ বনায়নের পূর্বে করনীয়:** উপরোক্ত মডেল থেকে স্পষ্টতই দৃশ্যমান যে, বাঁধের চুড়ায় বা ঢালের উপরে বৃক্ষ/ চারা রোপণ করতে হবে। ঢালের নীচের অংশে প্রধানতঃ বৃক্ষ মডেল অনুযায়ী গাছ রোপণ করতে হবে। ঢালের মাঝের অংশে নির্বাচিত গুল্ম জাতীয় গাছ রোপণ করা উচিত। বাঁধের বাইরের দিকে বনায়নের জন্য ঢালের নীচের এক তৃতীয়াংশে সাধারনত: গভীর শিকড়যুক্ত গাছ যেমন- নারিকেল, সুপারী, খেঁজুর, তাল, শিশু, কদম, নিম, শিলকরই, কুল, তেতুল লাগানো উচিত। ঢালের মাঝের এক তৃতীয়াংশে অগভীর শিকড়যুক্ত ছোট ও মাঝারী ধরনের গাছ যেমন-কুল, পেয়ারা, করমচা, শরিফা, ইপিল ইপিল, বাবলা, নাটাই, ঝাউ, আকাশমনি লাগানো যায়। ঢালের উপরের এক তৃতীয়াংশে খুব ছোট শিকড়যুক্ত গাছ যেমন-অড়হর, ইপিল ইপিল, ঘাস লাগানো যেতে পারে। বাঁধের ভিতরের দিকে বনায়নের জন্য নারিকেল, সুপারী, পেয়ারা, করমচা, শরিফা, ইপিল ইপিল, ঝাউ ও অন্যান্য ফলজ গাছ লাগানো যেতে পারে।

## সমুদ্র সম্মুখে বনায়ন (ফোরসোর বনায়ন)

**বাগান সৃজনের জন্য প্রাথমিক জরিপ:** বর্ষা মৌসুম শুরুর পূর্বেই জরিপ কাজ সম্পাদন করতে হবে। সরেজমিনে ফোরসোর এলাকায় স্থানীয় উপকারভোগীদের (সামাজিক বনায়ন দল ও পানি ব্যবস্থাপনা দলের সদস্য) সঙ্গে নিয়ে জরিপ কাজ করা উচিত। যাতে বনায়ন উপযোগী ভূমি ও অন্যান্য কাজের পরিকল্পনা করা যায়। এ জরিপের উপর নির্ভর করে সম্ভাব্য বনায়ন উপযোগী ভূমির পরিমাণ, প্রজাতি নির্বাচন ও মাটি কাটাসহ সকল কাজের হিসাব করা যাবে।

**ফোরসোর বাগান প্রতিষ্ঠার জন্য আলাপ আলোচনা ও মটিভেশন প্রদান:** প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থা হিসেবে বনবিভাগ স্থানীয় জনসাধারণের সাথে প্রকল্পের সকল বিষয় যেমন-পরিবেশগত, অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিভিন্ন দিক নিয়ে আলাপ আলোচনা করবেন। এ ক্ষেত্রে স্থানীয়ভাবে কর্মরত এনজিও ও ইউনিয়ন পরিষদ, পানি ব্যবস্থাপনা দল ও সমাজের প্রতিনিধিরা বিশেষ অবদান রাখতে পারে। ফোরসোর এলাকায় ও বাঁধের পাশে বসবাসরত পরিবার/সমাজের প্রতিনিধি/পানি ব্যবস্থাপনাদলের সদস্যদের নিয়ে মতবিনিময় কর্মশালার আয়োজন করা যেতে পারে। যেখানে প্রকল্পের সকল দিক নিয়ে খোলামেলা আলাপ আলোচনা করে জনগনকে সম্পৃক্ত করে ফোরসোর বনায়ন বাস্তবায়নের পরিকল্পনা করতে হবে। বনবিভাগের মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাগন এক্ষেত্রে ব্যক্তিগত যোগাযোগ ও সভার মাধ্যমে উদ্বুদ্ধকরণ প্রদান করতে পারেন। এ ক্ষেত্রে সমন্বিত কৃষি বনায়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ যেমন কৃষি, বনায়ন ও মৎস্য চাষ সম্পর্কিত দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদান করা উচিত। উপরন্তু বাঁধের বাইরে বসবাসকারী স্থানীয় জনগোষ্ঠীকে একদিনের অংশগ্রহনমূলক কর্মশালার মাধ্যমে প্রাকৃতিক ঝড়, জলোচ্ছাস, অন্যান্য দূর্যোগ সম্পর্কিত সর্তকীকরণ ও বনায়নের মাধ্যমে তাদের জীবন ও জানমালের নিরাপত্তা বিষয়ে অবহিত করার উপর গুরুত্ব আরোপ করার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। এ সকল কাজে প্রয়োজন আস্থার সম্পর্ক সৃষ্টি করা ও স্থানীয় দরিদ্র জনগনের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ এবং সামাজিক বনায়নের পরিবেশগত ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের বিভিন্ন দিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে উদ্বুদ্ধকরণ।

**ফোরসোর বাগানে গাছের প্রজাতি নির্বাচন:** সামাজিক বনায়ন পরিকল্পনায় স্থানীয় জনগনের সক্রিয় অংশগ্রহন, তাদের আশা আকাঙ্খার প্রতিফলন থাকা অত্যাবশ্যাক। জনগনকে সুসংগঠিত করে তাদের চাহিদার ভিত্তিতে ফোরসোর এলাকায় রোপণ উপযোগী গাছের প্রজাতি নির্বাচন করতে হবে। দ্রুতবর্ধনশীল লবনাক্ততা ও পানি সহিষ্ণু প্রজাতি নির্বাচন করতে হবে। যেহেতু ফোরসোর এলাকা সমুদ্রের জোয়ার ভাটার পানিতে মাঝে মাঝে প্লাবিত হয়, সুতরাং ফোরসোর ডাইক বনায়ন মডেল অনুসরন করা হবে। এখানে ঝাউ, আকাশমনি, জারুল, কদম, ইপিল-ইপিল, কেওড়া (সমুদ্রের দিকের শেষ অংশে), বাবলা, ইউক্যালিপটাস, অর্জুন, নোনাঝাউ, কাঠবাদাম ও মিনজিয়াম ইত্যাদি প্রজাতি রোপণ করা যেতে পারে। ডাইক ছাড়াও ফোরসোর বনায়ন করা সম্ভব কিন্তু তার স্থায়ীত্ব নিয়ে প্রশ্ন থেকে যাবে। তবে বাঁধের বাইরে লবনাক্ততা ও কিছু সময় পানিতে বেঁচে থাকতে পারে, এসকল প্রজাতি যেমন গেওয়া, বাবলা, জারুল, নোনা ঝাউ, নাটাই, মান্দার ইত্যাদি চারা/কাটিং দ্বারা অপেক্ষাকৃত ঘন (১ মিটার পর পর) করে রোপণ করে ২০-৪০ মিটার গ্রীনবেল্ট তৈরী করা যায়। উক্ত বৃক্ষাদী শেল্টার বেল্ট হিসাবে ও কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারবে।

**ফোরসোর বনায়নের মডেল বা নক্সা নির্বাচন:** বাঁধের বাইরে যে ফোরসোর এলাকা অবস্থিত তাতে পরিকল্পিতভাবে স্থানীয় জনসাধারনকে সম্পৃক্ত করে এ বনায়ন বাস্তবায়ন করতে হবে। নিম্নের চিত্র অনুযায়ী ফোরসোর লার্জ মাউন্ট উইথ ডাইক বনায়ন মডেল অনুসরণ করে এ বনায়নে চারা গাছ রোপণ করা যায়। এখানে প্রতি হেক্টরে ১০মি: ঢ ২.২৫ মি: ঢ ০.৯মি: আকারের প্রায় ১০৪টি বেড বা মাউন্ট করা যাবে, যার প্রতিটিতে ১৪টি করে বিভিন্ন প্রজাতির চারা রোপণ করা যাবে। গাছ থেকে গাছের দূরত্ব হবে ৪.৫ ফুট এবং সারি থেকে সারির দূরত্ব হবে ৫ ফুট। পাশাপাশি দুটি মাউন্ট বা বেডের মাঝে ১-২.৫ মি: প্রশস্ত নালা বা খাঁদ থাকবে। এ নালা বা খাদে পরিকল্পিতভাবে মৎস্য চাষ করা যাবে, যাতে উপকারভোগীগন বাড়তি আয়ের সংস্থান করতে পারে।

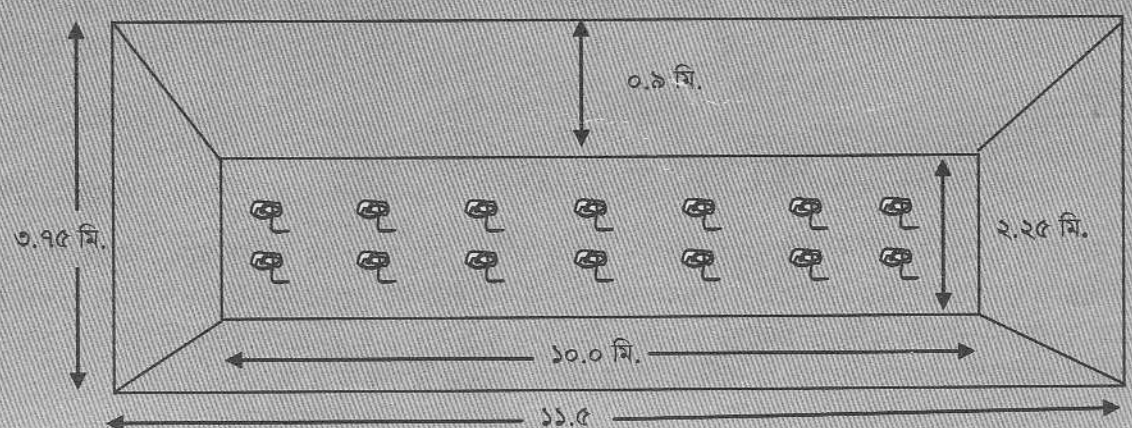

**ফোরসোর বনায়নে নদী বা সদুদ্রের পাশে ৩বা ৪ স্তর বিশিষ্ট সবুজ বেষ্টনী প্রতিষ্ঠা:** বেড়ী বাঁধের বাইরে অবস্থিত ফোরসোর বনায়নে বড় মাউন্ট এবং সাথে ডাইক পদ্ধতিতে বনায়ন, কৃষিফসল (শাকসবজি) এবং মৎস্য চাষের ব্যবস্থা করতে হবে। এই উঁচু বেডের বাইরের দিকে (সমুদ্রের পাশে) ৩ বা ৪ স্তর বিশিষ্ট ঘন গ্রীন বেল্ট তৈরী করা যাবে যাতে সহজে এ বনায়ন জোয়ার বা অন্য প্রাকৃতিক দূর্যোগ থেকে এ বনায়ন সর্বোপরি জনগন এবং তাদের জানমাল প্রাকৃতিক ক্ষয়ক্ষতি থেকে রক্ষা পায়।

## ম্যানগ্রোভ বনায়ান

উপকূলীয় অঞ্চলের সাগর, নদী বা খালের পাড়ে নতুন সৃষ্ট চর এলাকা জোয়ারের পানিতে প্লাবিত হয়। মাটি কর্দমাক্ত বা উড়ি ঘাসে ঢাকা এমন ভূমিতে ম্যানগ্রোভ গাছের বাগান সৃষ্টি করা যায়। ম্যানগ্রোভ বলতে যে সব গাছের শ্বাসমূল আছে, লবণাক্ত পানিতে প্লাবিত অবস্থায় জন্মায় ও বেঁচে থাকতে পারে এবং ফলের ভিতরেই সাধারনতঃ বীজের অংকুরোদ্গম হয় সে সব প্রজাতির গাছকে বুঝায়। দেশের উপকূলে জেগে উঠা চর ভূমিতে ম্যানগ্রোভ বন সৃষ্টি করে চরভূমির স্থায়ীত্ব প্রদানের মাধ্যমে যেমন দেশের আয়তন বাড়ানো যায় তেমনি বিশাল সম্পদ ও সবুজ-বেষ্টনী তৈরী করে উপকূলীয় অঞ্চলকে ঘূর্ণিঝড় জলোচ্ছাসের ব্যাপকতা থেকে রক্ষা করা যায়। সরকারী ও বেসরকারী পর্যায়ে উপকূলীয় চরভূমি অন্য কাজে ব্যবহার না করে ম্যানগ্রোভ বাগান করলে জলবায়ু পরিবর্তন জনিত ক্ষতি মোকাবেলা করা সম্ভব হবে। নিম্নে কতিপয় ম্যানগ্রোভ প্রজাতির গাছের চারা উত্তোলন ও বাগান সৃজন পদ্ধতি দেয়া হলোঃ

### ১. কেওড়া

**বীজ সংগ্রহ:** আগষ্ট হতে সেপ্টেম্বরের শেষের দিকে কেওড়া ফল পাকে। এ ফল গাছ থেকে সংগ্রহ করতে হয়। শুধুমাত্র সোজা, মসৃণ লম্বা কান্ড ও রোগ ব্যাধিহীন মাঝারী বয়সের গাছ থেকে ফল সংগ্রহ করতে হয়। গড়ে ৭০-৯০ টি ফলে এক কেজি এবং প্রতিটি ফলে প্রায় ৪০-৫০টি বীজ থাকে। ৩০-৪০ কেজি ফল থেকে ৭-৮ কেজি পরিষ্কার বীজ পাওয়া যায়।

**বীজ প্রক্রিয়াজাতকরণ:** সংগৃহীত বীজ ৭ থেকে ১০ দিন পর্যন্ত হিপ বা চটের বস্তায় ভিজিয়ে রাখতে হবে যাতে বীজের উপরের শাসযুক্ত গর্ভপত্রটি পঁচে যায়। এরপর বীজগুলি পানিপূর্ণ বেসিনে নিয়ে ফলের শাঁস থেকে বীজ আলাদা করতে হয়। কেওড়া বীজ হালকা এবং পানিতে ভাসে। ভাসমান বীজ গুলি সংগ্রহ করতে হয়। বীজ সংগ্রহ করার পর পরই তা প্রস্তুতকৃত নার্সারী বেডে বপন করতে হয় কেননা বীজ সংগ্রহের দু দিনের মধ্যেই বীজের অংকুরোদ্গম শুরু হয়।

**নার্সারীর জায়গা প্রস্তুতকরণ:** নার্সারীর জায়গাটি প্রতি জোয়ারের সময় অবশ্যই প্রস্তাবিত হতে হবে। এমনকি শুষ্ক মৌসুমেও, বিশেষ করে ফেব্রুয়ারী, মার্চ ও এপ্রিল মাসে। ঢেউয়ের সরাসরি আঘাত থেকে বীজ/চারাসমূহকে রক্ষার জন্য এবং পানির প্রবাহকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য নার্সারী এলাকার চারিদিকে বাঁধ তৈরী করতে হয়। নার্সারীতে পানির প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ করার জন্য এই পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়।

**বীজ বপন:** পঞ্চমী, ষষ্ঠী অথবা সপ্তমী তিথিতে অর্থাৎ ৫, ৬ অথবা ৭ সেপ্টেম্বরে ভাটার সময় পরিষ্কার বীজ বেডে ছিটিয়ে দিতে হয়। ৬-৭ কেজি বীজ নার্সারী বেডের উপর সমানভাবে ছিটিয়ে দিতে হয়। মৃত্যুর হার এবং ঘনত্বের কারণে সৃষ্ট বিকৃত চারার সংখ্যা কমানোর জন্য বীজের পরিমান ৪-৫ কেজিতে কমিয়ে আনা যেতে পারে। বীজ বপনের পর, কমপক্ষে ৩-৪ দিন কোন জোয়ারের পানি নার্সারীতে ঢোকানো যাবেনা অথবা নবজাত চারার শিকড় গভীরে না যাওয়া পর্যন্ত জোয়ারের পানি যাতে চারা নষ্ট করতে না পারে সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে। এক হেক্টর বাগান উত্তোলনের জন্য ৫ বেডে চারা উত্তোলনের প্রয়োজন। প্রথমে প্রতিটি বেড যাতে এক চিলতে ডুবতে পারে এমন পরিমাণ পানি ঢোকাতে হবে। চারার দুটি পাতা জন্মানোর পর জোয়ারের পানি প্রাকৃতিকভাবে ঢোকানোর ব্যবস্থা রাখতে হবে।

**নার্সারীর যত্ন ও রক্ষণাবেক্ষণ:** যদি অত্যধিক খরার কারণে দীর্ঘদিন নার্সারীতে জোয়ারের পানি ঢুকতে না পারে তবে সেচের সাহায্যে পানি সরবরাহের ব্যবস্থা করতে হবে।

**বাগান উত্তোলন ও রক্ষণাবেক্ষণ:** নার্সারীতে বীজ বপনের ৯ থেকে ১০ মাসের মধ্যে চারা ০.৪৫ মিঃ - ০.৬১ মিঃ উচ্চতা অর্জন করে এবং রোপণযোগ্য হয়। নগ্ন চারা উঠিয়ে বাগানে রোপণ করা হয়। নতুন পলিমাটি দ্বারা সৃষ্ট চর কেওড়া বাগান উত্তোলনের জন্য আদর্শ স্থান। দ্বীপের ভিতরে প্রবাহিত ছোট নদী নালার ধার এবং পলি মাটিতে কেওড়া ভাল জন্মে। ১.৫ মিটার X ১.৫ মিটার দূরত্বে কেওড়ার চারা লাগাতে হয়। কেওড়ার চারা লাগানোর উপযুক্ত সময় হচ্ছে, মধ্য জুলাই থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। কীট পতঙ্গের আক্রমণ রোধের জন্য কেওড়ার সাথে অন্যান্য ম্যানগ্রোভ প্রজাতি যেমন-বাইন, গেওয়া, কাকঁড়া লাগানো শ্রেয়ঃ।

## ২. বাইন

**বীজ সংগ্রহ:** আগষ্ট-সেপ্টেম্বর বাইন গাছের পাকা ফল সংগ্রহ করতে হয়। ফল গাছ থেকে অথবা গাছের নীচ থেকে সংগ্রহ করতে হয়। শুধুমাত্র সোজা, মসৃণ লম্বা কান্ড বিশিষ্ট ও রোগ ব্যাধিহীন মাঝারি বয়সের গাছ থেকে বীজ সংগ্রহ করতে হয়। গড়ে ১০০-৩০০ টি বীজের ওজন এক কেজি হয়।

**বীজ প্রক্রিয়াজাতকরণ:** ফল গাছে পাকার সাথে সাথে অঙ্কুরোদগম হয় এবং কোন প্রক্রিয়াকরণের প্রয়োজন হয় না। বীজ সংগ্রহের পরপরই অথবা সংগ্রহের ২৪ ঘন্টার মধ্যে নার্সারীতে অথবা সরাসরি বাগানে বপন করা উচিত।

**নার্সারী উত্তোলন:** জোয়ার ভাটার পানি আসে ও নেমে যায় এমন জায়গায় ২৫ সেঃমিঃ X ১৫ সেঃমিঃ পলি ব্যাগে সরাসরি অংকুরিত বীজ বপন করা হয়। পরবর্তী বৎসর মে-জুন মাসে পলিব্যাগে উত্তোলিত চারা রোপণ করা হয়। নার্সারীতে শামুক ও পাঙগাশ মাছের আক্রমণ বেশ লক্ষ্য করা যায়।

**বাগান উত্তোলন:** উচ্চ লবণাক্ততাযুক্ত নীচু চরভূমি, খাঁড়ি এবং উপকূলীয় জলাভূমি বাইন বাগান উত্তোলনের উপযুক্ত। তেমন স্থান যা সারা বছর নিয়মিতভাবে প্লাবিত হয়। বাইনের চারা ১.৫ মিঃ X ১.৫ মিঃ দূরত্বে লাগানো হয়। মরা কাটালের সময় চারা লাগানো হয়। মধ্য আগষ্ট হতে অক্টোবর মাসে চারা লাগালে জীবিতের হার বাড়ে এবং চারার বৃদ্ধি ভাল হয়। শুষ্ক মৌসুমে যে সব এলাকা শুকনা থাকে সে সব এলাকা বাইন বাগানের অনুপোযোগী। কেওড়া বাগানের মত বাইন বাগান সংরক্ষণ করতে হয়।

## ৩. গেওয়া

উপকূল অঞ্চলে গেওয়া বিশেষতঃ সুন্দরবনের অন্যতম প্রধান প্রজাতি। যে সমস্ত উপকূল এলাকার প্রস্তাবিত ভূমি শক্ত সে সমস্ত ভূমি গেওয়া বাগানের জন্য উপযুক্ত। গেওয়া গাছের ফল আগষ্ট-সেপ্টেম্বর মাসে সংগ্রহ করা উচিত। ভাল কান্ডবিশিষ্ট স্বাস্থ্যবান গাছ থেকে ফল সংগ্রহ করা উচিত। প্রাকৃতিক অবস্থায় বীজ মাটিতে পড়ার সাথে সাথেই অঙ্কুরোদগম হয়। তাই পরিপক্ক ফল গাছ থেকে সংগ্রহ করা উচিত। বীজ সংগ্রহ করার পরপরই তা নার্সারীতে লাগানো উচিত। নদীর ধার যেখানে নিয়মিত পলিমাটি জমে সেখানে গেওয়া ভাল জন্মে। বর্ষাকালে জুন-আগষ্ট মাসে গেওয়া লাগানো হয়। দুই বছরের চারা বাগানে লাগানো উত্তম। চারা থেকে চারার দূরত্ব ১.৫ মিঃ X ১.৫ মিঃ হলে ভালো হয়। স্থানভেদে কম বেশী করা যেতে পারে। কেওড়া, বাইন ও গেওয়া গাছের বাগানে জুলাই-আগষ্ট মাসে প্রাকৃতিক ভাবে সৃষ্ট চারা (১'-৬" থেকে ২'-৬" উচ্চতার) তুলে লাগানো যেতে পারে। এছাড়া উপরোক্ত ৩ (তিন) প্রজাতির গাছের বীজ সরাসরি বাগানে ছিটিয়ে বপন করা যায়।

সারণী-১ বাংলাদেশের কাঠ জাতীয় প্রজাতির গাছের বীজ আহরণকাল, বৃক্ষ প্রতি বীজ উৎপাদন, কেজি প্রতি বীজের সংখ্যা, অংকুরোদগম হার, বীজ শোধন ও গুদামজাত করার মেয়াদ নিম্নে দেয়া হলো:

| স্থানীয় নাম ও গাছের ধরন | বীজের সংগ্রহের সময় | বীজ উৎপাদন/ প্রতি বৃক্ষ (কেজি) | বীজের সংখ্যা/ প্রতি কেজি | অংকুরোদগম হার (শতকরা) | অংকুরোদগ-মের সময় (দিন) | বীজ শোধন | সাধারণ রুম তাপমাত্রায় কতদিন গুদামজাত করা যায় |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| আকাশমণি | জানু-মার্চ | ৪-৫ | ৩৮,০০০-৪০,০০০ | ৭০-৮০ | ৫-৭ | ৩০ সে: গরম পানিতে ভিজানো | ১ বছর |
| ম্যান জিয়াম | মার্চ-এপ্রিল | ৩-৪ | ১,০০,০০০-১,২০,০০ | ৬৫-৭৫ | ৬-৭ | ঐ | ১ বছর |
| বাবলা | এপ্রিল-মে | ৩-৪ | ৪,৫০০-৫,০০০ | ৬০-৭০ | ৭-১০ | গরুর গোবরের মধ্যে ২৪ ঘ: । ৪৮ ঘ: পানিতে ভিজানো | ৩-৪ মাস |
| করই | ফেব্রু-মার্চ | ৫-৭ | ৩৫,০০০-৪০,০০০ | ৬০-৭০ | ৫-৭ | ঐ | ১ বছর |
| রাজ করই | ফেব্রু-মার্চ | ৪-৫ | ১০,০০০-১২,০০০ | ৪৫-৫০ | ৭-১০ | ঐ | ১-২ বছর |
| কাজু বাদাম | ডিসে-জানু | ৩-৪ | ১,২০০-১,৩০০ | ৫০-৭০ | ১০-১৫ | - | ১৫-২০ দিন |
| কদম | আগস্ট-সেপ্টে | ১-২ | ১-১.২ মিলিয়ন | ৪০-৬০ | ২০-২৫ | - | ১ বছর |
| ইউক্যালিপটাস | জানু-ফেব্রু | ০.৫ | ০.৮-১.০ মিলিয়ন | ৬০-৭০ | ৫-৭ | - | ১ বছর |
| গামার | মে-জুন | ৫-৭ | ১,৩০০-১,৫০০ | ৭০-৮০ | ৭-১০ | - | ১ বছর |
| জারুল | ডিসে-জানু | ৪-৫ | ০.১০-০.১৫ মিলিয়ন | ৪৫-৬০ | ৭-১০ | - | ৩-৪ মাস |
| ইপিল ইপিল | নভে-ফেব্রু | ২-৩ | ৬০,০০০-৭০,০০০ | ৭০-৮০ | ৫-৭ | ৩০ সে: গরম পানিতে ভিজানো | ১ বছর |
| মূলিবাঁশ | এপিল-জুলাই | ৩-১০ | ১০-১২ | ৭০-৮০ | ৭-১০ | - | ১০-১৫ দিন |
| রেইনট্রি | মার্চ-এপ্রিল | ৫-৭ | ৬,০০০-৬,৫০০ | ৬০-৭০ | ৭-১০ | ৩০ সে: গরম পানিতে ভিজানো | ১ বছর |
| মেহগণি | ডিসে-ফেব্রু | ৩-৫ | ২,৮০০-৩,০০০ | ৬০-৭০ | ৭-১০ | - | ২-৩ মাস |
| নিম | জুন-জুলাই | ৩-৬ | ১৩,০০০-১৪,০০০ | ৭০-৮০ | ৭-১০ | - | ৭-১০ দিন |
| মিনজিরি | ফেব্রু-মার্চ | ৪-৬ | ৪২,০০০-৪৫,০০০ | ৬০-৭০ | ৭-১০ | - | ১ বছর |
| ঝাউ | এপ্রিল-মে | ২-৩ | ০.৬-০.৭ মিলিয়ন | ৪০-৫০ | ৭-১০ | - | ১ বছর |
| শিশু | ডিসে-ফেব্রু | ২-৩ | ৯,০০০-১০,০০০ | ৬০-৭০ | ৭-১০ | - | ১-২ মাস |
| কৃষ্ণচুড়া | মে-জুন | ৩-৫ | ১,৭০০-১,৮০০ | ৬০-৭০ | ৭-১০ | ৪৮ ঘ: ঠান্ডা পানিতে ভিজানো | ১ বছর |

# অধ্যায়-৫
# চর অঞ্চলের সরেজমিনে মাঠ ফসল চাষ প্রযুক্তি

**উফশী জাতের ধান চাষ**

উপযুক্ত চাষাবাদ পদ্ধতি সঠিকভাবে অনুসরণ করলে উফশী ধানের ফলন বেড়ে যায়। নিচে ধান চাষের উন্নত পদ্ধতিসমূহ আলোচনা করা হলো।

**বীজ বাছাই**

বপনের জন্য পুষ্ট ও সুস্থ বীজ নিশ্চিত করতে হবে। কারণ ভাল বীজ মানে সবল চারা। তাই বীজ বাছাইয়ের জন্য দশ লিটার পরিষ্কার পানিতে ৩৭৫ গ্রাম ইউরিয়া সার মিশিয়ে দিন। এবার ১০ কেজি বীজ ছেড়ে হাত দিয়ে নেড়ে চেড়ে দিন। পুষ্ট বীজ ডুবে নীচে জমা হবে এবং অপুষ্ট, হালকা বীজ ভেসে উঠবে। ভারী বীজ নীচ থেকে তুলে নিয়ে পরিষ্কার পানিতে ৩-৪ বার ভাল করে ধুয়ে নিতে হবে। ইউরিয়া মিশানো পানি সার হিসেবে বীজতলায় ব্যবহার করা যায়।

**বীজ শোধন ও জাগ দেয়া**

বাছাইকৃত বীজ কাপড় বা চটের ব্যাগে ভরে ঢিলা করে বেঁধে নিন। এবার প্রতি কেজি বীজের জন্য এক লিটার পানি এবং তিন গ্রাম হারে ব্যাভিস্টিন/নোইন/ইভাজিম/গিলজিম/হেডাজিম/সানফানেট এগুলোর যে কোনটি একটি পাত্রে মিশিয়ে নিন। এরপর বীজের পোটলাটি ২৪ ঘন্টা পানিতে ডুবিয়ে রাখুন। এভাবে বীজ শোধনও হলো এবং সঠিকভাবে ভিজেও গেল। এরপর বীজের পোটলা পানি থেকে তুলে ইট বা কাঠের উপর ঘন্টাখানেক রেখে দিন পানি ঝরানোর জন্য এবার বাশেঁর টুকরি বা ড্রামে ২/৩ পরত শুকনা খড় বিছিয়ে তার উপর বীজের পোটলা রাখুন এবং আবারও ২/৩ পরত শুকনা খড় দিয়ে ভালভাবে চেপে তার উপর ইট বা কাঠ অথবা কোন ভারী জিনিস দিয়ে চাপা দিন। এভাবে জাগ দিলে আউশ এবং আমন মৌসূমের জন্য ৪৮ ঘন্টা বা দুই দিনে, বোরো মৌসূমে ৭২ ঘন্টা বা তিন দিনে ভাল বীজের অংকুর বের হবে এবং বীজতলায় বপনের উপযুক্ত হবে। বীজ শোধন করলে ফসলে বীজ বাহিত ছত্রাক রোগ, যেমন বাকানি, লিফস্কল্ড, সিথরট, ব্লাস্ট, ব্রাউন স্পট, ফলসস্মাট ইত্যাদি থেকে রক্ষা পাওয়া যায়।

**সারণী ৩। রোপা আমনের জাতগুলোর আলোক-সংবেদনশীলতা ও জাত নির্বাচন কৌশল।**

| জাত | বিশেষ গুণ | সুপারিশ |
|---|---|---|
| বিআর ১০<br>বিআর ১১ | অধিক ফলনশীল মাঝারি মোটা থেকে মোটা চাল। এদের জীবনকাল ১৪০-১৫০দিন এবং গড় উচ্চতা ১১৫-১২০ সে.মি.। | এ জাতগুলো স্বল্প আলোক-সংবেদনশীল এবং উচ্চ ফলনশীল। এ জাতগুলো আষাঢ় মাসের ১৫-২০ তারিখে বীজ বপন করে ২৫-৩০ দিনের চারা স্বাভাবিক জমিতে রোপন করলে হেক্টরপ্রতি ফলন দেয় ৫.০-৬.০ টন। এ ধান পাকে অগ্রহায়নের ২য় সপ্তাহের পর। ফলে ডাল, তেল ও গম ফসলের আবাদ ব্যাহত হয়। যেহেতু এ জাতগুলো স্বল্প আলোক-সংবেদনশীল, তাই এগুলোর বীজ বপন যদি ১৫-২০ জ্যৈষ্ঠ পর্যন্ত এগিয়ে এনে ২৫-৩০ দিনের চারা রোপণ করা যায় তাহলে ফসল পাকবে ১০-১৫ কার্তিকের মধ্যে। |

| জাত | বিশেষ গুণ | সুপারিশ |
|---|---|---|
| | | এভাবে আগে বীজ বপন করলে রোপণের সময় খরা কবলিত হলে চারার বয়স স্বাভাবিকের চেয়ে ১৫-২০ দিন পর্যন্ত বাড়ানো যায়, অর্থাৎ ৪০-৪৫ দিনের চারা রোপন করা যায়। আবার কার্তিকের প্রথম থেকে খরা হলে আগাম বপনের জন্য ফলনের উপর তেমন প্রভাব পড়ে না, কারণ তখন ধান শক্ত জমাট পর্যায়ে চলে যায়। অপরদিকে স্থানীয় শাইল ধানে তখন থোড় আরম্ভ হয় এবং খরা কবলিত হয়ে যায়। স্বল্প আলোক-সংবেদনশীলতা থাকার কারণে জাতগুলোর ফসল আগে পাকে এবং ফলনও স্থানীয় জাতের চেয়ে অনেক বেশি হয়। তাই রোপা আমনের জমি থেকে স্থানীয় জাতের রাজাশাইল ও কাজলশাইল ধানের জায়গা দখল করেছে এ সব উফশী ধান। |
| বিআর ২২<br>বিআর ২৩ | মাঝারি মোটা থেকে লম্বা মোটা চাল এবং নাবি জাত | এ জাতগুলো আলোক-সংবেদনশীল। নাবি গুণ থাকার জন্য এ ধানগুলো ২০-৩০ শ্রাবণে বীজ বপন করে ৩০-৪০ দিনের চারা সর্বশেষ ৩১ ভাদ্র পর্যন্ত রোপণ করা যাবে। অর্থাৎ আউশ ও পাট কাটা জমি অথবা বন্যা-প্রবণ এলাকা যেখানে ১৫ ভাদ্রের পর রোপণের উপযোগী সেখানেই এ জাতগুলো আবাদ করা যাবে। মনে রাখতে হবে, রোপা আমন মৌসুমে ভাদ্র মাসের পর কোন ধান রোপণ করা যাবে না। বিআর ২৩ কিছুটা লবণ সহনশীল। এজন্য এ জাতটিও উপরের বর্ণনা অনুযায়ী উপকূলীয় অঞ্চলে আবাদ করা হচ্ছে এবং জনপ্রিয়তা পেয়েছে। |
| ব্রি ধান ৩৪<br>ব্রি ধান ৩৭<br>ব্রি ধান ৩৮<br>বিআর ৫ | সুগন্ধি পোলাও/ বিরিয়ানির চাল। এদের জীবনকাল ১৩৫-১৫০দিন এবং গড় উচ্চতা ১১৭-১২৫ সে:মি:। | এ জাতগুলো আলোক-সংবেদনশীল এবং এর কান্ড উফশী ধানের মতো পুরোপুরি মজবুত নয়। কান্ডে মজবুতি বাড়ানোর জন্য জীবনকাল সংক্ষিপ্ত করে গাছের উচ্চতা কমাতে হবে। এ জন্য এ জাতগুলোর বীজ বপন করতে হবে ৫-১০ শ্রাবণ। এরপর ২৫-৩০ দিনের চারা অপেক্ষাকৃত উঁচু জমিতে রোপন করতে হবে। ফলে ফসলের জীবনকাল কমার সাথে সাথে গাছের উচ্চতাও কম হবে, যার প্রভাবে কান্ডের মজবুতি বাড়বে এবং ঢলে পড়া প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে। ফসল খরায় না পড়ার জন্য সম্পুরক সেচ নিশ্চিত করলে হেক্টর প্রতি ৪.০-৪.৫ টন পর্যন্ত ফলন পাওয়া যেতে পারে। চরাঞ্চলে স্থানীয় কালিজিরা ও অন্যান্য চিকন ধানের স্থলে এসব ধান চাষ করা যায়। |
| **ব্রি ধান ৪০**<br>**ব্রি ধান ৪১**<br><br><br>**ব্রি ধান ৫৩**<br>**ব্রি ধান ৫৪** | লবণাক্ততা সহনশীল (৮-১০ ডিএস/মিটার) চারা অবস্থায়। এদের জীবনকাল ১৪৫-১৫০ দিন এবং গড় উচ্চতা ১১০-১১৫ সে:মি:।<br>জীবনকাল-১২৫<br>জীবনকাল-১৩৫<br>দুইটি জাতই ৮-১০ ডিএস/মি লবণাক্ততা সহনশীল। | এ জাতগুলোতেও আলোক-সংবেদনশীলতা আছে। সমুদ্র উপকুলীয় লবণাক্ত পরিবেশের জন্য এ জাতগুলো সুপারিশ করা হয়েছে। এ অঞ্চলে রোপণের জন্য কিছুটা লম্বা চারা দরকার। এ জন্য বীজ বপন করতে হবে আষাঢ়ের শুরুতে। তাহলে ৪০-৫০ দিনের চারা বেশ লম্বা হয় এবং এক হাঁটু পরিমাণ পানি থাকা জমিতে সহজেই রোপণ করা যায়। তবে ব্রিধান ৫৩ আলোক সংবেদনশীল নয় বলে আষাঢ়ের দ্বিতীয় সপ্তাহে বীজ বপন করতে হবে। সেক্ষেত্রে চারার বয়স হবে ৩০-৩৫ দিন। |

| জাত | বিশেষ গুণ | সুপারিশ |
|---|---|---|
| ব্রি ধান ৫১<br>ব্রি ধান ৫২ | এদের জীবনকাল ১৩৫ -১৫০ দিন এবং গড় উচ্চতা ১১৭-১২৫ সে.মি.। | ব্রিধান ৫১ ও ব্রিধান ৫২ স্বল্প আলোক-সংবেদনশীল এবং ১০ থেকে ১৫ দিন আকস্মিক জলমগ্ন থাকার পরও প্রচলিত স্বর্ণা এবং বিআর১১ ধানের চেয়ে ফলন বেশী দেয়। এজন্য বাংলাদেশের যে সমস্ত এলাকায় আকস্মিক বন্যার আশংকা থাকে সেখানে প্রত্যাশিত ফলন পেতে এই জাতগুলো নির্বাচন করতে হবে। জাতগুলো ১৫-২০ আষাঢ়ে বীজ বপন করে ২৫-৩০ দিনের চারা রোপণ করতে হবে এবং এদের চাষাবাদ বিআর১১ এর অনুরূপ। ইতিমধ্যে চরাঞ্চলে ব্রিধান ৫২ স্থানীয় জাতগুলোর তুলনায় ২/৩গুণ ফলন বেশী হওয়ায় কৃষকদের মধ্যে ব্যাপক সাড়া পেয়েছে। জলমগ্নতা প্রতিরোধেও জনপ্রিয়তা পেয়েছে। |
| ব্রি ধান ৫৬<br>ব্রি ধান ৫৭ | জীবনকাল-১১০<br>জীবনকাল-১০৫ | চাল লম্বা ও সাদা।<br>চালের আকার জিরাশাইল ও মিনিকেটের মত।<br>**এদুটি জাতের জীবন কাল কম হওয়ায় চর অঞ্চলে আবাদ কালের শেষের দিকের খরার প্রভাব এড়ানো যায়।** |

**সারণী ৪। বোরো ধানের বৈশিষ্ট্য ও জাত নির্বাচন কৌশল।**

| জাতের নাম | বিশেষ গুণ | সুপারিশ |
|---|---|---|
| বিআর ১৪ | জীবনকাল ১৬০-১৭০ দিন | সেচের পানি ঘাটতি এলাকার জন্য আগাম জাত হিসেবে এ জাত নির্বাচন করা যেতে পারে। |
| ব্রি ধান ৪৭ | লবণ সহিষ্ণু জাত। চারা অবস্থায় ১২-১৪ ডিএস/মিটার এবং সারা জীবনকাল ধরে ৬ ডিএস/মিটার লবণ সহনশীল। জীবনকাল ১৫২ দিন এবং গড় উচ্চতা ১০৫ সে:মি:। | এ ধান পাকার সাথে সাথে কাটতে এবং সতর্কতার সাথে বহন করতে হবে। অধিক পরিপক্ক হলে শিষ থেকে ধান ঝরে যেতে পারে। |
| ব্রি ধান ৫৫ | এ জাতের চাল চিকন ও লম্বা এবং ৮-১০ ডিএস/মিটার পর্যন্ত লবণ সহনশীল। জীবনকাল ১৪৫ দিন। | জাতটি বেশ কয়েক দিন সেচহীন অবস্থায় ১৫-১৮ ডিগ্রী সে: তাপমাত্রায় টিকে থাকতে পারে এবং ১৪৫ দিনের মধ্যে ফসল কাটার উপযোগী হবে। প্রায় একই বৈশিষ্টপূর্ন ব্রিধান ২৮ জাতের সংগে এর পার্থক্য হচ্ছে এটি ব্রিধান ২৮ এর চেয়ে প্রতি হেক্টরে ১ টন বেশী ফলন দেয়। |
| বিনাধান ৮ ও বিনাধান ১০ | লবণাক্ততা সহনশীল। | |

**সারণী ৫। আউশ ধানের বৈশিষ্ট্য ও জাত নির্বাচন কৌশল।**

| জাতের নাম | বিশেষ গুণ | সুপারিশ |
|---|---|---|
| বোনা আউশ-বিআর ২১, ও ব্রি ধান২৭ | জীবনকাল ১০০-১১০ দিন। ব্রিধান ২৭ ইতিমধ্যে চরাঞ্চলে লবণাক্ততা সহনশীল জাত হিসাবে জনপ্রিয়তা পেয়েছে। | বৃষ্টি বহুল এলাকার উপযোগী। |

| জাতের নাম | বিশেষ গুণ | সুপারিশ |
|---|---|---|
| বোনা আউশ ব্রিধান ৪২ এবং ব্রিধান ৪৩ | জীবনকাল ১০০দিন এবং গড় উচ্চতা ১০০ সে.মি.। এ দুটি জাত চরাঞ্চলে অধিক ফলনশীল এবং কিছুটা লবণাক্ততা সহনশীল হিসাবে জনপ্রিয়তা পেয়েছে। | খরা প্রবণ এবং বৃষ্টি বহুল উভয় এলাকার উপযোগী। |
| রোপা আউশ-বিআর ২৬, ব্রিধান ২৭ ও ব্রিধান ৪৮ | জীবনকাল ১১০-১১৫ দিন | সাধারণত রোপা আউশ এলাকা অপেক্ষাকৃত নিচু জমিতে চাষের যোগ্য। |

**বীজতলা তৈরি**

দোঁআশ ও এঁটেল মাটি বীজতলার জন্য ভাল। বীজতলার জমি উর্বর হওয়া প্রয়োজন। যদি জমি অনুর্বর হয় তাহলে প্রতি বর্গমিটার জমিতে দুই কেজি হারে পচা গোবর বা আবর্জনা সার সুন্দরভাবে ছড়িয়ে দিতে হবে। এরপর জমিতে ৫-৬ সে.মি. পানি দিয়ে দু-তিনটি চাষ ও মই দিয়ে ৭-১০ দিন রেখে দিতে হবে এবং পানি ভালভাবে আটকিয়ে রাখতে হবে। আগাছা, খড় ইত্যাদি পচে গেলে আবার চাষ ও মই দিয়ে কাদা করে জমি তৈরি করতে হবে। এবার জমির দৈর্ঘ্য বরাবর ১ মিটার চওড়া বেড তৈরি করতে হবে। দু'বেডের মাঝে ২৫-৩০ সে.মি. জায়গা ফাঁকা রাখতে হবে। নির্ধারিত জমির দু'পাশে মাটি দিয়ে বেড তৈরি করা যায়। এরপর বেডের উপরের মাটি বাঁশ বা কাঠের চ্যাপ্টা লাঠি দিয়ে সমান করতে হবে। বেড তৈরির ৩/৪ ঘন্টা পর বীজ বোনা উচিত। বীজতলা তৈরির জন্য দুই বেডের মাঝে যে নালা তৈরি হয় তা খুবই প্রয়োজন। এ নালা যেমন সেচের কাজে লাগে তেমনি পানি নিষ্কাশন বা প্রয়োজনীয় সার ও ঔষধ ইত্যাদি প্রয়োগ করা সহজ হয়।

**বীজতলায় বপন**

সতেজ ও সবল চারা রোপন করতে হবে। তাই বীজ বাছাইকরণের আগেই বীজ ওজন করে নিতে হবে। প্রতি শতাংশ বেডে ২.৫-৩.০ কেজি বীজ বোনা দরকার। সে অনুযায়ী অঙ্কুরিত বীজ বেডের উপর সমানভাবে বুনে দিতে হবে। বীজ বেডের উপর থাকে বলে পাখিদের নজরে পড়ে। তাই বপনের সময় থেকে ৪/৫ দিন পর্যন্ত পাহারা দিয়ে রাখা দরকার এবং নালা ভর্তি করে পানি রাখা চারার জন্য জরুরী।

**বীজতলার পরিচর্যা**

বীজতলায় সব সময় নালা ভর্তি পানি রাখা উচিত। বীজ গজানোর ৪-৫ দিন পর বেডের উপর ২-৩ সে.মি. পানি রাখলে আগাছা ও পাখির আক্রমন নিয়ন্ত্রণ করা যায়। বোরো মৌসুমে শীতের জন্য চারার বাড়-বাড়তি ব্যাহত হয়। এ কারণে রাতে বীজতলা পলিথিন দিয়ে ঢেকে রাখলে ঠান্ডাজনিত ক্ষতি থেকে চারা রক্ষা পায় এবং চারার বাড়-বাড়তি ভাল হয়। চারাগাছ হলদে হয়ে গেলে প্রতি শতাংশে ২৮০ গ্রাম করে ইউরিয়া সার উপরি প্রয়োগ করলেই চলে। ইউরিয়া প্রয়োগের পর চারা সবুজ না হলে গন্ধকের অভাব হয়েছে বলে ধরে নেওয়া যায়। তখন প্রতি শতাংশে ৪০০ গ্রাম করে জিপসাম সার উপরি প্রয়োগ করতে হবে। ইউরিয়া সারের উপরি-প্রয়োগের পর বীজতলার পানি ধরে রাখা উচিত।

**চারা উঠানো**

বীজতলায় বেশি করে পানি দিয়ে বেডের মাটি নরম করে নিতে হবে। চারা উঠাতে হবে এমনভাবে যেন চারার কান্ড মুচড়ে বা ভেঙ্গে না যায়। উঠানো চারার মাটি কাঠ বা হাতে আছাড় দিতে সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে। গবেষণায় দেখা গেছে, শিকড় ছিঁড়ে গেলে চারা কষ্ট সামলে ওঠে, কিন্তু কান্ড ভেঙ্গে বা মুচড়ে গেলে অপূরণীয় ক্ষতি হয়। সেজন্য চারা উঠানোর পর ওই চারার পাতা দিয়ে বান্ডিল বাঁধাও উচিত নয়। শুকনো খড় ভিজিয়ে নিয়ে বান্ডিল বাঁধতে হবে।

### চারা বহন

বীজতলা থেকে রোপণের জন্য চারা বহন করার সময় পাতা ও কান্ড পরিহার করতে হবে। এ জন্য ঝুড়ি বা টুকরিতে সারি করে সাজিয়ে পরিবহণ করা উচিত। বস্তাবন্দী করে ধানের চারা কোনক্রমেই বহন করা উচিত নয়।

### রোপনের জন্য জমি তৈরী

ধান আবাদের জন্য যদি ক্ষেতে পানি না থাকে তাহলে সেচ দেয়ার পর দুটি আড়াআড়ি চাষ দিয়ে ৭-৮ দিন অপেক্ষা করুন। এবার ১০-১৫ সে.মি. (৪-৬ ইঞ্চি) গভীর করে আড়াআড়ি দু'টি চাষ ও দুটি মই দিয়ে ৩-৪ দিন অপেক্ষা করতে হবে। এরপর দিতে হবে শেষ চাষ। হেক্টরপ্রতি ৭৫-৮০ কেজি টিএসপি, ১০০-১২০ কেজি এম ও পি এবং ১০০ কেজি জিপসাম সার ছিটিয়ে শেষ চাষ শুরু করতে হবে। মাটির প্রকার ভেদে শেষ চাষ এক বা দু'বার হতে পারে। হালকা বুনট মাটিতে পটাশ সার দু'কিস্তিতে প্রয়োগ করতে হবে। তিন ভাগের দু'ভাগ জমি তৈরির শেষ সময় এবং এক-তৃতীয়াংশ কাইচথোড় আসার ৫-৭ দিন আগে প্রয়োগ করতে হবে। মই দিতে হবে ২-৩ বার যেন জমি সমান হয় এবং সমস্ত জমিতে সমান্তরালভাবে পানি থাকে। উত্তমরূপে কাদা করে তৈরি জমিতে পানির অপচয় কম হয়, নাইট্রোজেন সারের কার্যকারিতা বাড়ে, অনেক আগাছা দমন হয় এবং সহজে চারা রোপণ করা যায়। পরে এ জমিতে রোপা আমন বা রোপা আউশ ধান আবাদ করলে উল্লেখিত সারগুলো (ইউরিয়া ছাড়া) অর্ধেক মাত্রায় প্রয়োগ করতে হবে।

### চারা রোপণ

সাধারণভাবে আউশে ২৫-৩০ দিনের, রোপা আমনে ২৫-৩৫ দিনের (ব্রিধান৪০ ও ব্রিধান৪১-এর বেলায় ৪০ দিন পর্যন্ত) এবং বোরোতে ৩৫-৪৫ দিনের চারা রোপণ করা উচিত। রোপণের সময় জমিতে ছিপছিপে পানি থাকলেই চলে। প্রতি গুছিতে একটি করে সতেজ চারা রোপণ করাই যথেষ্ট। এ হারে রোপণ করলে এক হেক্টর জমিতে ৮-১০ কেজি বীজের চারা লাগে। প্রয়োজনে ২-৩টি পর্যন্ত চারা এক গুছিতে রোপণ করা যেতে পারে। তখন দ্বিগুন হারে বীজের প্রয়োজন হবে। মাটির ২-৩ সে.মি. গভীরতায় চারা রোপণ করা উত্তম। সঠিক গভীরতায় চারা রোপণ করলে চারার বাড়-বাড়তি দ্রুত শুরু হয় এবং কুশির সংখ্যা বেড়ে যায়।

সারিতে চারা রোপণ করতে হবে। সারি থেকে সারির দুরত্ব হবে ২০-২৫ সে.মি. (৮-১০ ইঞ্চি) এবং সারিতে চারা থেকে চারার দুরত্ব বজায় রাখতে হবে ১৫ সে.মি. (৬ ইঞ্চি)। এ বিষয়টি অতীব গুরুত্বপূর্ণ, কারণ নির্দিষ্ট পরিমাণ জমিতে নির্দিষ্ট সংখ্যক গুছি থাকলে নির্দিষ্ট ফলন হবে। চারা রোপণের ৭-১০ দিনের মধ্যে কোন চারা মারা গেলে সেখানে নতুন চারা রোপণ করতে হবে। সারিবদ্ধভাবে চারা রোপণ করলে নিড়ানি যন্ত্র ব্যবহার করা সহজ হয় এবং তাতে খরচ কমে। গুটি ইউরিয়া ব্যবহার করলে ইউরিয়া সারের খরচ কমে এবং প্রত্যাশিত ফলন পাওয়া যায়। উপরন্তু সঠিক দূরত্বে চারা রোপণ হলে প্রত্যেক গাছ সমান আলো, বাতাস ও সার গ্রহণের সুবিধা পাবে। আর তা ভাল ফলনে সহায়ক হবে।

### সার ব্যবস্থাপনা

**ইউরিয়া উপরি-প্রয়োগ:** ইউরিয়া সারের কার্যকারিতা জমিতে কম সময় থাকে, তাই এ সার তিন কিস্তিতি প্রয়োগ করতে হবে। প্রথম কিস্তি চারা রোপণের ৭-১০ দিন পর, দ্বিতীয় কিস্তি গোছায় ৪-৫টি কুশি দেখা দিলে ও তৃতীয় কিস্তি কাইচথোড় আসার ৫-৭ দিন আগে দিতে হবে। বোরো মৌসুমে যে সব জাতের জীবনকাল ১৫০ দিন বা তার কম ওই সকল জাতের জন্য ২২০ কেজি এবং ১৫০ দিনের বেশি জীবনকালের জাতের জন্য ২৬৪ কেজি ইউরিয়া সার তিনভাগে ভাগ করে উপরে বর্ণিত তিন কিস্তিতে উপরি-প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে। একই নিয়মে আউশ এবং আমন মৌসুমে ১৭৫ কেজি ইউরিয়া প্রয়োগ করতে হবে। ইউরিয়া উপরি-প্রয়োগের সময় মাটিতে অবশ্যই প্রচুর রস থাকতে হবে। সবচাইতে ভাল হয়, যদি ক্ষেতে ২-৩ সে.মি. পানি থাকে। ইউরিয়া প্রয়োগের সাথে সাথে হাত বা উইডার দিয়ে আগাছা দমনের ব্যবস্থা নিলে সার যেমন মাটিতে মিশে যায়, তেমনি আগাছা না থাকায় ধান গাছ সার বেশি পায়।

**জিপসাম এবং দস্তা সার প্রয়োগ:** ইউরিয়া সার প্রয়োগ করার পরও ধান গাছ যদি হলদে থাকে এবং বাড়-বাড়তি কম হয় তাহলে গন্ধকের অভাব হয়েছে বলে ধরে নেয়া যায়। সেক্ষেত্রে তাৎক্ষনিকভাবে জমির পানি সরিয়ে দিতে হবে। এরপর হেক্টর প্রতি ৬০ কেজি জিপসাম উপরি-প্রয়োগ করতে হবে। জমির আয়তন কম হলে অল্প জিপসাম ছিটানোর অসুবিধা

এড়ানোর জন্য মাটি কিংবা ছাই অথবা ইউরিয়া সার (উপরি-প্রয়োগের সময়) এর সাথে মিশিয়ে প্রয়োগ করা যেতে পারে। যদি ধানগাছ মাঝেমধ্যে খাটো হয় বা বসে যায় এবং পুরাতন পাতা মরচে পড়া বাদামি থেকে কমলা রঙ ধারণ করে এবং ধানের কুশি কম হয় তখন ধরে নিতে হবে দস্তার অভাব ঘটেছে। এ ক্ষেত্রেও জমি থেকে পানি সরিয়ে দিয়ে হেক্টরপ্রতি ১০ কেজি দস্তাসার উপরি-প্রয়োগ করতে হবে।

**জৈব সার প্রয়োগ:** মাটির উর্বরতা শক্তির চালক হিসেবে গণ্য হয় জৈব সার। তাই জৈব বা সবুজ সার (পচা গোবর, আবর্জনা, কম্পোষ্ট, ধৈঞ্চা, মূরগীর বিষ্টা ইত্যাদি) জমিতে বছরে একবার হলেও হেক্টরপ্রতি ৩ টন (শুকনো) অথবা ৫ টন (ভিজা) হারে প্রয়োগ করা একান্ত প্রয়োজন। ফসল চক্রের প্রথম (খরিফ মৌসুমে) যে জমিতে জৈব সার ব্যবহার করা হবে সে জমিতে পরবর্তী ধান ফসলে টিএসপি এবং এমওপি সার অর্ধেক মাত্রায় ব্যবহার করতে হবে। এছাড়া ধান কাটার সময় গাছের গোড়া থেকে ২৫-৩০ সে.মি. উপরে কেটে তা মাটিতে মিশিয়ে দিলে পটাশ সারের প্রয়োগ মাত্রা এক-তৃতীয়াংশে নামিয়ে আনা যায়।

**আগাছা দমন**

আগাছা ধানগাছের সাথে আলো, পানি ও খাদ্যে সংগ্রহের প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়। তাছাড়া ধানগাছের চেয়ে আগাছা অধিক হারে বাড়তে পারে। এ জন্য ধানের ক্ষেতে আগাছা থাকলে ধানগাছের বাড়-বাড়তি ব্যাহত হয় এবং ফলন কমে যায়। তাই চারা রোপণের পর ৪০ দিন পর্যন্ত জমি আগাছা মুক্ত রাখতে হবে। রোপা ধানে হাত দিয়ে কমপক্ষে দু'বার আগাছা পরিষ্কার করতে হবে। প্রথমবার এটি করতে হবে ধান রোপণের ১৫ দিন পর এবং পরের বার ৩০-৩৫ দিন পর। উঠানো আগাছা মাটির নিচে পুঁতে দিলে তা পচে গিয়ে জৈব সারের কাজ করে।

ব্রি-উইডার দিয়ে ঘন্টায় ১০ শতাংশ জমির আগাছা দমন করা যায়। এটি ব্যবহার করা সহজ ও ওজনে হালকা। ফলে মহিলা শ্রমিকরাও সহজেই এটি ব্যবহার করতে পারে। এ পদ্ধতি হাত দিয়ে নিড়ানির চেয়ে অনেক সাশ্রয়ী।

তরল, দানাদার ও পাউডার এই তিন ধরনের আগাছানাশক পাওয়া যায়। তরল ও পাউডার জাতীয় আগাছানাশক পানিতে মিশিয়ে জমিতে স্প্রে করতে হয় এবং দানাদার আগাছানাশক ইউরিয়া সারের মতো ছিটিয়ে ব্যবহার করা যায়। বাজারে পাওয়া যায় এমন কিছু অনুমোদিত আগাছানাশক যেমন-২-৪ডি, অ্যামাইন, বাইবুটা ৫জি, ম্যাচিটি ৫জি, এমসিপিএ ৫০ইসি, ৬০ইসি, সাথী ১০ ডব্লিওপি, স্পিরিট ১০ ডব্লিওপি ইত্যাদি। আগাছানাশক প্রয়োগকৃত জমিতে ৩০ দিন পর আর একবার হালকা হাত নিড়ানির প্রয়োজন হতে পারে। আগাছা নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য আগাছার বীজ মুক্ত ধান বীজ ব্যবহার, আগাছা ভালভাবে পচিয়ে জমি প্রস্তুত করা এবং ধান বপন বা রোপনের পর জমিতে পর্যাপ্ত পরিমাণে পানি ধরে রাখতে হবে।

**সেচ ব্যবস্থাপনা**

চারা রোপণের পর জমিতে ১০-১৫ দিন পর্যন্ত প্রয়োজনীয় পরিমাণ পানি রাখতে হবে। এরপর কম পানি রাখতে হবে। ধানের জমিতে সব সময় দাঁড়ানো পানি রাখার প্রয়োজন নেই। তবে লক্ষ্য রাখতে হবে, ধানগাছ যেন খরা কবলিত না হয়। ইউরিয়া উপরি-প্রয়োগ, গুটি ইউরিয়া ব্যবহার এবং আগাছা নিয়ন্ত্রণের জন্য জমিতে কিছু না কিছু পানি থাকতে হবে। বৃষ্টি-নির্ভর রোপা আমন এলাকায় জমির আইল ১৫-২০ সে.মি. উঁচু হলে অনেক বৃষ্টির পানি ধরে রাখা যায় যা খরা থেকে ফসলকে কিছুটা হলেও রৰা করে। এরপরও যদি ফসল খরা কবলিত হয় তাহলে সম্পূরক সেচ দিতে হবে। গবেষণায় দেখা গেছে, খরা কবলিত ধানের চেয়ে সম্পূরক সেচযুক্ত ধানের ফলন হেক্টরে প্রায় ১ টন বেশি হয়।

**পালাক্রমে ভিজা ও শুকানো (এডব্লিউডি) পদ্ধতি**

বোরো মৌসুমে ধান আবাদে পানি সাশ্রয়ী আর একটি পদ্ধতির নাম অলটারনেট ওয়েটিং এন্ড ড্রাইং বা এ.ডব্লিউ.ডি। এ পদ্ধতির জন্য প্রয়োজন হয় একটি ১০ সে.মি. ব্যাস ও ৩০ সে.মি. লম্বা ছিদ্রযুক্ত প্লাস্টিক পাইপ বা চোঙ্গ। এটি চারা রোপণের ১০-১৫ দিনের মধ্যে জমিতে এমনভাবে স্থাপন করতে হবে যেন এর ছিদ্রবিহীন ১০ সে.মি. মাটির উপরে এবং ছিদ্রযুক্ত ২০ সে.মি. মাটির নিচে থাকে। এবার চোঙ্গের নিচ পর্যন্ত ভিতর থেকে মাটি উঠিয়ে নিতে হবে। মাটি শক্ত হলে গর্ত করে মাটিতে বসানো যেতে পারে। পাইপ বসানোর সময় জমিতে ৫ সে.মি. পানি আছে কিনা তা পর্যবেক্ষণ করতে

হবে। যখন পানির স্তর ১৫ সে.মি. নিচে নেমে যাবে তখন সেচ দিতে হবে যেন বেতে ৫ সে.মি. পরিমাণ পানি থাকে। আবার ক্ষেতের দাঁড়ানো পানি শুকিয়ে পাইপের ভিতর ১৫ সে.মি. নিচে নেমে গেলে সেচ দিতে হবে। এভাবে পর্যায়ক্রমে ভিজানো ও শুকানো সেচ চলবে ৪০-৪৫ দিন। যখনই গাছে থোড় দেখা দেবে তখন ক্ষেতে স্বাভাবিক ২/৩ সে.মি. পানি রাখতে হবে। দেখা গেছে, এডব্লিউডি পদ্ধতিতে বোরো ধানে সেচ দিলে ৪-৫ টি সেচ বাঁচানো যায় এবং ফলনও কমে না। এভাবে এ প্রযুক্তি পানি, জ্বালানি, টাকা ও সময় সাশ্রয় করে।

**ধানে অতিরিক্ত চিটা হওয়ার কারণ ও প্রতিকার**

স্বাভাবিকভাবে ধানে শতকরা ১৫-২০ ভাগ চিটা হয়। চিটার পরিমাণ এর চেয়ে বেশি হলে ধরে নিতে হবে থোড় থেকে ফুল ফোটা এবং ধান পাকার আগ পর্যন্ত ফসল কোনো না কোনো প্রতিকূলতার শিকার হয়েছে, যেমন অসহনীয় ঠান্ডা বা গরম, খরা বা অতিবৃষ্টি, ঝড়, পোকা ও রোগবালাই।

**ঠান্ডা:** বাতাসের তাপমাত্রা ১৮° সেন্টিগ্রেডের নিচে নেমে গেলে ফুলের পুংকেশর বিকাশ বিঘ্নিত হয়। তাই গর্ভধারণ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হতে না পেরে চিটা হয়ে যায়। কোন কোন সময় ডিগপাতার খোল থেকে শিষ সম্পূর্ণ বেরও হতে পারে না। এভাবে বহু ধান অঙ্কুরেই নষ্ট হয়ে যায়।

**গরম:** ধানের জন্য অসহ্য গরম তাপতাত্রা হলো ৩৫° সেন্টিগ্রেড। ফুল ফোটার সময় ১-২ ঘন্টা উক্ত তাপমাত্রা বিরাজ করলে মাত্রাতিরিক্ত চিটা হয়ে যায়।

**ঝড়ো বাতাস:** প্রচন্ড ঝড়ো বাতাসের কারণে গাছ থেকে পানি প্রচ্ছেদন প্রক্রিয়ায় বেরিয়ে যায়। এতে ফুলের অঙ্গসমূহ গঠন বাধাগ্রস্ত হয়। আবার ঝড়ো বাতাস পরাগায়ণ, গর্ভধারণ ও ধানের মধ্যে চালের বৃদ্ধি ব্যাহত হয়। এতে ধানের সবুজ খোসা খয়েরি বা কালো রঙ ধারণ করে। ফলে ধান চিটা হয়ে যেতে পারে।

**খরা:** খরার কারণে শিষের শাখা বৃদ্ধি ব্যাহত হয় এবং বিকৃত ও বন্ধ্যা (স্টেরাইল) ধানের জন্ম দেয়ায় চিটা হয়ে যায়।

**প্রতিকারের উপায়:** ফসল চক্রে নেমে আসা প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রতিহত করা কঠিন। কিন্তু বোরো ধান অগ্রহায়ণের শুরুতে এবং রোপা আমন ধান শ্রাবণের শুরুতে বীজ বপন করলে ধানের থোড় এবং ফুল ফোঁটা অসহনীয় নিম্ন বা উচ্চ তাপমাত্রায় পড়ে না, ফলে ঠান্ডা ও গরম এমনকি ঝড়ো বাতাসজনিত ক্ষতি থেকেও রেহাই পাওয়া সম্ভব।

**ধান কাটা ও মাড়াই**

শিষে ধান পেকে গেলেই (৮০ ভাগ) ফসল কাটতে হবে। অধিক পাকা অবস্থায় ফসল কাটলে অনেক ধান ঝরে পড়ে, শিষ ভেঙ্গে যায়, শিষকাটা লেদাপোকা এবং পাখির আক্রমন হতে পারে। তাই মাঠে গিয়ে ধান পেকেছে কিনা তা দেখতে হবে। শিষের শতকরা ৮০ ভাগ ধানের চাল শক্ত ও স্বচ্ছ হলে ধান ঠিকমতো পেকেছে বলে বিবেচিত হবে। কাটার পর ধান মাঠে ফেলে না রেখে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব মাড়াই করা উচিত। কাঁচা খলার উপর ধান মাড়াই করার সময় চাটাই, চট বা পলিথিন বিছিয়ে দিন। এভাবে ধান মাড়াই করলে ধানের রঙ উজ্জ্বল ও পরিষ্কার থাকে। মাড়াই করার পর ধান অন্তত ৪-৫ দিন রোদে ভালভাবে শুকানোর পর ঝেড়ে গোলাজাত করুন।

**এই বইতে আধুনিক পদ্ধতির পরিমাপ ও আয়তন ইত্যাদি দেয়া হয়েছে। কৃষকভাইদের সুবিধার্থে শেষ পৃষ্ঠায় বিভিন্ন এককের বিস্তারীত উল্লেখ করা হলো। যেমন চরাঞ্চলে মন, ফুট, শতাংশ বা গন্ডা বা কানি প্রচলন আছে। অধিক ব্যবহৃত ঃ**

**১ হেক্টর = ২.৪৭ একর =২৪৭ শতাংশ।**
**১ফুট = ৩০.৪৮ সেমিঃ এবং ১ইঞ্চি = ২.৫৪সেমিঃ।**
**১টন = ১০০০কেজি = ২৬ মন ৩১ সের ১ ছটাক।**
**১মিটার = ১০০ সেমিঃ = ১.০৯গজ = ৩.২৮১ফুট = ৩৯.৩৭ইঞ্চি।**

## স্থানীয় আমন ধান রাজাশাইল, কাজলশাইল, বেতিচিকন ও গিগজ এর উৎপাদন কৌশল

**জাতের বৈশিষ্ট্য**

| | |
|---|---|
| ১। গাছের উচ্চতা | ১২০-১২৫ সে.মি. |
| ২। জীবন কাল | ১৩০-১৫০ দিন |
| ৩। কুশি উৎপাদন | মধ্যম |
| ৪। দানার আকার ও আকৃতি | মোটা, সাদা |
| ৫। লবণ সহিষ্ণুতা | কিছুটা লবণ সহিষ্ণু জাত |
| ৬। আলোক সংবেদনশীলতা | অধিক |
| ৭। ফলন | চর এলাকার গড় ৬-৮ কেজি/শতাংশ |

**উৎপাদন প্রযুক্তি**

| | |
|---|---|
| ১। রোপন পদ্ধতি | চারা রোপন |
| ২। বীজ বোনার সময় | মধ্য আষাঢ়-মধ্য শ্রাবণ (জুলাই) |
| ৩। বীজের হার | ১৬০ গ্রাম প্রতি শতাংশ জমির জন্য |
| ৪। বীজ তলায় বীজ বপনের হার | ৮০ গ্রাম/ বর্গ মিটার বীজ তলায় |
| ৫। চারা রোপনের সময় | উত্তম সময় মধ্য শ্রাবণ থেকে ভাদ্র (মধ্য জুলাই থেকে মধ্য আগষ্ট)। নাবীতে বপনের শেষ সময় মধ্য ভাদ্র (৩০ শে আগষ্ট) |
| ৬। চারার বয়স | ৩০-৩৫ দিন, নাবীতে রোপনের জন্য ৪৫-৬০ দিন |
| ৭। রোপনের দূরত্ব ও চারার সংখ্যা | সারি থেকে সারি ২৫ সে.মি. এবং সারিতে ২০ সে.মি. পর পর গর্তে ২-৩ টি চারা রোপন করতে হবে। নাবীতে রোপনের ৰেত্রে সারির মধ্যে ১০-১৫ সে.মি. পর পর গর্তে ৫-৬ টি চারা রোপন করতে হবে। |
| ৮। সার প্রয়োগ | রোপনের সময় প্রতি শতাংশে টিএসপি ২০৫ গ্রাম ও এমপি ৩২০ গ্রাম। ইউরিয়া উপরি প্রয়োগ: প্রতি শতাংশে ২২০ গ্রাম করে চারা রোপনের ২০ ও ৫৫-৬০ দিনের মধ্যে। |
| ৯। আগাছা ও রোগ-পোকা দমন | |
| ক) আগাছা | চারা রোপনের পর ৪০ দিন পর্যন্ত ক্ষেত আগাছা মুক্ত রাখতে হবে। |
| খ) রোগ ও পোকা দমন | সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা গ্রহন, প্রয়োজনে বালাইনাশক ব্যবহার করতে হবে। |

# অধ্যায়-৬
# সবজি ফসলের আবাদ

## টমেটো

বাংলাদেশে এটি পুষ্টিকর ও সুস্বাদু বলে এই সবজির জনপ্রিয়তা খুব বেশী। টমেটো ভিটামিন-সমৃদ্ধ সবজি।

### টমেটোর জাত

শীতকালীন জাত: রুমা ভিএফ, বারি টমেটো-১, ২, ৩, ৮, ৯, ১৫, বিনা টমেটো-৪,৫,৬ ও ৭।
গ্রীষ্মকালীন জাত: বারি হাইব্রিড টমেটো-৩ ও ৪, বিনা টমেটো-২ ও ৩। এছাড়া হাইব্রিড টমেটোর বিভিন্ন জাত চাষী পর্যায়ে চাষাবাদ করা হচ্ছে। তবে চরাঞ্চলের জন্যে উপযোগী জাত সমূহ চিহ্নিত করে চাষাবাদ করতে হবে। রুমা ডিএফ ও কিছু হাই ব্রিড জাত ইতিমধ্যে এই এলাকায় উপযোগী বলে ইতিমধ্যে প্রমানিত হয়েছে।

### মাটি ও জলবায়ু

প্রায় সব রকম মাটিতে টমেটোর চাষ করা যায়। তবে দোআঁশ ও বেলে-দোআঁশ মাটি বেশী উপযোগী। ফলনের উপর তাপমাত্রার প্রভাব আছে। সাধারণত: ২০-২৫° সে: তাপমাত্রায় গাছে টমেটো ধরে সবচেয়ে বেশী। তাই বাংলাদেশে শীতকালীন আবহাওয়াই টমেটো চাষের জন্য সর্বাধিক উপযোগী কিন্তু চরাঞ্চলে এ সময়ে লবণাক্ততা বেশী থাকে বলে নিদিষ্ট জাত চাষ করতে হবে।

### বীজ বপন ও চারা উৎপাদন

টমেটো চাষের জন্য চারা উৎপাদন একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। আমাদের দেশের চাষী ভাইয়েরা সাধারণত: সরাসরি বীজতলায় বীজ বপন করে, দ্বিতীয় বীজতলায় স্থানান্তর করে না। যার দরুন বীজের পরিমাণ বেশী লাগে এবং চারার স্বাস্থ্যও ভাল হয় না। প্রথমে ঘন করে বীজ ফেলতে হয়। বীজ গজানোর ৮-১০ দিন পর, গজানো চারা দ্বিতীয় বীজতলায় স্থানান্তর করতে হয়। এতে চারা সুস্থ সবল হয় এবং ফলন ভাল দেয়। আগাম চাষের মধ্যে আগষ্ট মাসেই বীজ বপন করতে হবে। নাবী ফসলের জন্য অগ্রহায়ণের শেষ পর্যন্ত বীজ বপন করা যায়। মানিক ও রতন জাতের বীজ আশ্বিন-কার্তিক মাস পর্যন্ত বীজতলায় বপন করা যায়। এছাড়া গ্রীষ্ম কালীন চাষে বৈশাখ মাসে বীজ বপন করতে হয়। বীজতলায় সমপরিমাণ বালি ও মাটি মিশিয়ে মিশ্রণটিকে ঝুরঝুরে করে তৈরী করতে হয়। প্রতি বীজতলায় (৩ মিটার x ১ মিটার) ১০ গ্রাম বীজ দরকার। মাঠে প্রতি হেক্টরের জন্য ১৫০ থেকে ১৫৫ গ্রাম বীজ লাগে।

### জমি তৈরী ও চারা রোপণ

৪-৫ বার চাষ-মই দিয়ে মাটি ঝুরঝুরে করে নিতে হয়। টমেটোর ভাল ফলন অনেকাংশে জমি তৈরীর উপর নির্ভর করে। বীজ বপনের ৩০-৪০ দিন পর চারা রোপনের উপযোগী হয়। এই সময় প্রতিটি চারায় ৫/৬ টি পাতা থাকে। তবে বিশেষ পরিস্থিতিতে টমেটোর চারা ৬০ দিন বয়স পর্যন্ত রোপণ করা চলে। তাতে ফলনের তেমন তারতম্য হয় না। চারাগুলো ১ মিটার প্রস্থ ও ৩০ সে.মি. উঁচু ভেলিতে দুই সারি করে লাগাতে হবে। প্রতি ভেলির দৈর্ঘ্য জমির আকারের উপর নির্ভর করে। এক্ষেত্রে সারি থেকে সারির দূরত্ব ৬০ সে:মি: এবং গাছ থেকে গাছের দূরত্ব ৪০ সে.মি. রাখতে হবে। পানি সেচ, নিষ্কাশন ও অন্তবর্তীকালীন পরিচর্যার সুবিধার্থে প্রতি দুটি ভেলির মাঝখানে ৫০ সে.মি. প্রশস্ত নালা রাখতে হবে।

প্রতি হেক্টর জমিতে নীচের সারণীতে বর্ণিত পরিমাণ ও নিয়মানুসারে সার প্রয়োগ করতে হবে। অনুর্বর জমিতে এবং উচ্চ ফলন পেতে এরূপ উচ্চ হার উপযোগী।

সারণী: বিভিন্ন সারের পরিমাণ ও প্রয়োগ পদ্ধতি (হেক্টর প্রতি)

| সার | মোট পরিমাণ | শেষ চাষের সময় দেয় গর্তে | পরবর্তী পরিচর্যা হিসাবে দেয় | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | চারা লাগানোর দিন | প্রথম কিস্তি(সারিতে) চারা লাগানোর পাঁচ সপ্তাহ পর | দ্বিতীয় কিস্তি (সারিতে) চারা লাগানোর আট সপ্তাহ পর |
| গোবর বা কম্পোষ্ট | ১০ টন | অর্ধেক | অর্ধেক | - | - |
| ইউরিয়া | ৫০০ কেজি | - | ২০০ কেজি | ১৭৫ কেজি | ১৭৫ কেজি |
| টিএসপি | ৪৫৫ কেজি | - | সব | - | - |
| এমপি | ২৫০ কেজি | - | সব | - | - |

**গোবর/কম্পোষ্ট সারের পরিমাণ জমির উর্বরতার উপর নির্ভর করে কম বেশী হবে।**

**অর্ন্তবর্তী পরিচর্যা**

টমেটোর ভাল ফলনের জন্য গাছে ঠেক্না দেয়া প্রয়োজন। টমেটোর গাছ যাতে অত্যধিক ঝোপালো না হয়, সেই জন্য অংগ ছাটাই করা প্রয়োজন। প্রথম কিস্তি সার প্রয়োগের আগে পার্শ্বকুশি ছাটাই করে দিতে হবে। এতে কীট-পতংগ ও রোগের প্রাদুর্ভাব কম হবে, পরবর্তীতে ফলের আকার ও ওজন বৃদ্ধি পাবে। গাছের স্বাভাবিক বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনমত নিড়ানী দিয়ে আগাছা পরিষ্কার ও মাটির উপরিভাগ আলগা করে দিতে হবে। এর ফলে জমিতে মাটির রস বেশী দিন ধরে রাখার ও মাটির ভিতর আলো-বাতাস প্রবেশের সুবিধা হবে।

টমেটো চাষের জন্য ৪/৫ বার সেচের প্রয়োজন। চারা লাগানোর ১০ থেকে ১৫ দিন পর হালকা সেচ এবং পরবর্তীতে প্রতি কিস্তি সার প্রয়োগের পর জমিতে সেচ দিতে হবে। তবে মাটির প্রকার ভেদে ১৫/২০ দিন অন্তর সেচ দেওয়া দরকার।

চারা অবস্থায় ব্যাকটেরিয়াল উইল্ট দেখা দিতে পারে। রোগ একবার হলে গাছ বাঁচে না। তাই আক্রান্ত গাছকে তুলে নষ্ট করে ফেলতে হয় এবং গাছের স্থানটি ফরমালিন দিয়ে শোধন করে সেখানে নতুন চারা লাগাতে হয়। এছাড়া ভাইরাস রোগে আক্রান্ত গাছকে তুলে ফেলে দিতে হবে। এখানে উল্লেখ্য, মানিক ও রতন জাতের টমেটো এইসব পোকামাকড় ও রোগ বালাইয়ের দ্বারা আক্রান্ত হয় না বললেই চলে।

**টমেটো চাষে ড্রিপ পদ্ধতিতে সার মিশ্রিত সেচ**

আমাদের দেশে শস্য উৎপাদনে সার এবং পানি আলাদা আলাদাভাবে জমিতে প্রয়োগ করা হয়। বেশীরভাগ ক্ষেত্রে পা দিয়ে সেচের মাধ্যমে প্রয়োগ করা হয় বলে চোয়াঁনো পানির সঙ্গে জমি থেকে সারও বের হয়ে যায়। ফলে সার ও পানি উভয়েরই অপচয় হয়। সার মিশ্রিত সেচের পানি ড্রিপ সেচের (অধ্যায়-৩) মাধ্যমে প্রয়োগ করে এই অপচয় কমানো যায়।

**ফসল সংগ্রহ ও ফলন**

চারা লাগানেরা ৭৫-৮০ দিনের মধ্যে টমেটো সংগ্রহ শুরম্ন হয়। প্রতি গাছ থেকে ৭-৮ বার ফল সংগ্রহ করা যায়। ফলের নীচের দিকে একটু লালচে ভাব দেখা দিলে ফল তোলার উপযোগী হয়। সাধারণত: টমেটোর ফলন হেক্টরপ্রতি ৩০-৩৫ টন পাওয়া যায়।

## বেগুন

বেগুন এমন একটি সবজি, যা সারা বছর পাওয়া যায় এবং সকল স্তরের মানুষের কাছে প্রিয়। বেগুনের প্রচলিত কয়েকটি স্থানীয়জাত এখানে উল্লেখ্য, যেমন- ইসলামপুরী, শিংনাথ, নয়নকাজল, মুক্তকেশরী, খটখটিয়া ইত্যাদি। বহুদিন যাবত এই জাতগুলোর চাষাবাদ হয়ে আসছে।

উচ্চ ফলনশীল বেগুনের জাত: শীতকালীন জাত: বারি বেগুন-৬, বারি বেগুন-৭, বারি বেগুন-৯, গ্রীষ্মকালীনজাত: বারি বেগুন-৮, শীত ও গ্রীষ্মকালীন জাত: বারি বেগুন-১০

### মাটি ও জলবায়ু

দোআঁশ ও বেলে-দোআঁশ মাটি বেগুনের জন্য সবচেয়ে ভাল। তবে পানি নিষ্কাশনের সুব্যবস্থা থাকলে, এঁটেল দোআঁশ মাটিতেও এর চাষাবাদ করা যায়।

### বীজ বপন ও চারা উৎপাদন

শীতকালীন বেগুন চাষের জন্য শ্রাবণের মাঝামাঝি থেকে আশ্বিন মাস এবং বর্ষাকালীন বেগুনের জন্য পৌষের মাঝামাঝি থেকে চৈত্র পর্যন্ত চারা উৎপাদনের জন্য বীজতলায় বীজ বপন করা যায়। প্রথমে বীজতলায় ঘন করে বীজ ফেলতে হয়। বীজ গজানোর ৮-১০ দিন পর, চারা দ্বিতীয় বীজতলায় স্থানান্তর করতে হয়। এতে চারা সুস্থ ও সবল হয় এবং ফলন ভাল দেয়। বীজতলা সমপরিমাণ বালি, কম্পোষ্ট ও মাটি মিশিয়ে ঝুরঝুর করে তৈরী করতে হয়। প্রতি বীজতলায় (৩ মিটার x ১ মিটার) প্রায় ৮ গ্রাম বীজ লাগে। মাঠের প্রতি শতাংশ জমির জন্য ০.৫ গ্রাম বীজ লাগে।

### জমি তৈরী ও চারা রোপণ

মাঠের জমি তৈরীর জন্য ৪-৫ বার চাষ ও মই দিয়ে মাটি ঝুরঝুরে করে নিতে হবে। বেগুনের ভাল ফলন পেতে হলে জমি গভীর করে চাষ দিয়ে তৈরী করা উচিত।

### সারের পরিমাণ ও প্রয়োগ পদ্ধতি

বেগুন চাষের জন্য হেক্টরপ্রতি নিম্নোক্ত পরিমাণে সার ব্যবহার করা হয়।

**সারণী: বেগুন চাষের জন্য বিভিন্ন সারের পরিমাণ ও প্রয়োগ ব্যবস্থা (হেক্টর প্রতি)**

| সার | মোট দেয় | শেষ চাষের সময় দেয় | সারের পরিমাণ | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | প্রথম কিস্তি | দ্বিতীয় কিস্তি | তৃতীয় কিস্তি |
| গোবর বা কম্পোষ্ট | ৫-১০ টন | সব | - | - | - |
| ইউরিয়া | ৩০০ কেজি | - | ১০০ জেজি | ১০০ জেজি | ১০০ জেজি |
| টিএসপি | ২২০ কেজি | সব | - | - | - |
| এমপি | ২৬০ কেজি | সব | - | - | - |

প্রথম কিস্তি চারা লাগানোর ১০-১৫ দিন পর, ২য় কিস্তি ফল ধরা আরম্ভ হলে, এবং ৩য় কিস্তি ফল আহরণের মাঝামাঝি সময়ে দিতে হবে।

বীজ বুনার ৩৫-৪০ দিন পর চারা রোপণের উপযোগী হয়। তখন প্রতিটি চারায় ৫-৬ টি পাতা হয়। বৃহৎ আকারের জাতের বেলায় ১ মিটার দূরে সারি করে সারিতে ৬০ সে.মি. ব্যবধানে চারা লাগানো যেতে পারে। ক্ষুদ্রাকার জাতে সারির মধ্যে ৭৫ সে.মি. এবং চারার মধ্যে ৫০ সে.মি. দূরত্ব রাখতে হবে। আগাম চাষের জন্য ১.২ মিটার উঁচু ভেলি করে, ভেলিতে দুই সারিতে চারা লাগাতে হয়। এক্ষেত্রে দুই ভেলির মাঝে ৩০ সে.মি. নালা থাকতে হবে; এতে সেচপ্রয়োগ ও পানি-নিষ্কাশনের সুবিধা হয়।

### অন্তর্বর্তীকালীন পরিচর্যা

গাছের বৃদ্ধির জন্য রবি মৌসুমে সেচ প্রয়োগ অত্যন্ত জরুরী। বেলে মাটির বেলায় এবং রবি মৌসুমে যখন আবহাওয়া খুব শুষ্ক থাকে, তখন ১০ দিন অন্তর অন্তর সেচ দেওয়া প্রয়োজন। এছাড়াও প্রতি কিস্তি সার প্রয়োগের পর পরই সেচ দিতে হয়। মাটির উপরের ভাগ মাঝে মাঝে (বিশেষ করে সেচ প্রয়োগের পর) আলগা করে দিতে হবে।

### ফসল সংগ্রহ ও ফলন

বীজ বুনার পর থেকে জাত-বিশেষে ফুল আসতে ৬০-৯০ দিন এবং ফুল ফোটার পর থেকে ফসল সংগ্রহ শুরু করতে গড়-পড়তা আরো এক মাস সময় লাগে। সাধারণত: প্রতি হেক্টরে ৪০-৫০ টন বেগুন উৎপাদন হয়।

## ঢেঁড়শ

চর অঞ্চলের ঢেঁড়শ একটি অন্যতম প্রধান সবজি। আমাদের এ অঞ্চলের আবহাওয়ায় কয়েকটি জাত উৎকৃষ্ট বলে প্রমাণিত হয়েছে, যেমন-পুশা সাওয়ানী, পেন্টাগ্রীন, গোল্ড কোস্ট, ডোয়ার্ফ গ্রীণ ও কাবুলী ডোয়াফ, স্থানীয় উন্নত চিটাগাং ও বারি ঢেড়শ-১ ও ২। এছাড়া হাইব্রিড জাতও উৎপাদিত হয়। চরাঞ্চলের উৎপাদিত ঢেঁড়শ ঢাকা ও চট্টগ্রামের বিভিন্ন এলাকায় বাজারজাত করা হয়। বিশেষ করে ঢাকার কারওয়ান বাজারের ও যাত্রাবাড়ী বাজারের পাইকারীদের সাথে দাদন ব্যবসার মাধ্যমে ব্যাপকভাবে ঢেঁড়শ বাজারজাত করার ব্যবস্থা বিদ্যমান।

### চাষাবাদ পদ্ধতি

মাটি ও জলবায়ু: দোআঁশ ও বেলে দোআঁশ মাটি ঢেঁড়শ চাষের জন্য সর্বোৎকৃষ্ট। পানি নিষ্কাশনের সুব্যবস্থা থাকলে এঁটেল মাটিতেও এর চাষাবাদ করা যায়। ঢেঁড়শের জন্য উষ্ণ জলবায়ু প্রয়োজন। অবশ্য শুষ্ক ও আর্দ্র আবহাওয়ায়ও ভাল জন্মায়। তবে অধিক বৃষ্টিপাত এবং আর্দ্র পরিবেশে গাছ বিভিন্ন রোগ ও পোকা দ্বারা আক্রান্ত হয়।

### উৎপাদন মৌসুম

বৎসরের যে কোন সময়ে ঢেঁড়শের চাষাবাদ করা যায়। তবে সাধারণত: খরিফ মৌসুমে চাষ হয়। ফেব্রুয়ারী থেকে মে মাস পর্যন্ত ঢেঁড়শ লাগানোর উপযুক্ত সময়। চর অঞ্চলে শীতকালীন ঢেঁড়শ চাষ অত্যন্ত জনপ্রিয়।

### জমি তৈরী

চার-পাঁচ বার চাষ ও মই দিয়ে মাটি ঝুরঝুরে করে নিতে হবে। ভাল ফলন পেতে হলে জমি গভীরভাবে চাষ দিয়ে তৈরী করতে হবে।

### সারের পরিমাণ ও প্রয়োগ পদ্ধতি

ঢেঁড়শের উচ্চ ফলন পেতে হলে প্রচুর পরিমাণে সার প্রয়োগ করতে হবে। ঢেঁড়শ চাষের জন্য হেক্টরপ্রতি নিম্নোক্ত পরিমাণ সার ব্যবহার করা যেতে পারে।

**সারণী: ঢেঁড়শ চাষের জন্য সারের পরিমান (হেক্টর প্রতি)**

| সার | মোট দেয় | শেষ চাষের সময় দেয় | প্রথম কিস্তি | দ্বিতীয় কিস্তি |
|---|---|---|---|---|
| গোবর | ৪-৫ টন | সব | - | - |
| ইউরিয়া | ১৫০ কেজি | - | ৭৫ কেজি | ৭৫ কেজি |
| টিএসপি | ১২০ কেজি | সব | - | - |
| এমপি | ১১০ কেজি | সব | - | - |

### রোপণ পদ্ধতি

ঢেঁড়শ বীজ সরাসরি বোনা হয়। বীজ বপনের পূর্বে ২৪ ঘন্টা ভিজিয়ে রাখতে হয়। তবে বীজের শক্ত খোসা নরম হয় এবং চারা তাড়াতাড়ি গজায়। জাত অনুযায়ী বুনার সময় প্রতি গর্তে দুটি বীজ দিতে হবে। চারা গজানোর পর প্রতি গর্তে একটি করে চারা রাখতে হবে। প্রতি শতাংশে ২০ গ্রাম বীজ লাগে।

### অন্তর্বর্তীকালীন পরিচর্যা

গাছের স্বাভাবিক বৃদ্ধির জন্য সময়মত নিড়ানী দিয়ে আগাছা পরিষ্কার ও মাটির উপরিভাগ আলগা করে দিতে হবে। আগাম মৌসুমে ঢেঁড়শ চাষ করলে পানি সেচ দেয়া বিশেষ প্রয়োজন। বর্ষাকালে গাছের বৃদ্ধি ও পানি নিষ্কাশনের সুবিধার জন্য সারি বরাবর অনুচ্চ ভেলি করে দিলে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়। প্রতি কিস্তি সার প্রয়োগের পর জমিতে সেচ দিতে হবে। তবে মাটির প্রকারভেদে ১০/১২ দিন অন্তর অন্তর সেচ দেওয়া প্রয়োজন হতে পারে।

**ফল সংগ্রহ ও ফলন**

বীজ বোনার ৬-৮ সাপ্তাহের মধ্যে ঢেঁড়শের ফল আসা শুরু হয় এবং গাছ কোনরূপ রোগাক্রান্ত না হলে তা ৩-৪ মাস পর্যন্ত ফলন দেয়। খাওয়ার উপযোগী হওয়া মাত্রই ফল সংগ্রহ করতে হয় এবং যত বেশীবার ফসল সংগ্রহ করা যায় ফলনও তত বেশী হয়। সাধারণত: হেক্টরপ্রতি ৭-৮ টন ফসল হয়।

**বীজ উৎপাদন**

ঢেঁড়শের ভাইরাস রোগ বীজ দ্বারা সংক্রামিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকায় বীজ উৎপাদনে বিশেষ সতর্কতা প্রয়োজন। তবে রবি মৌসুমে এ রোগের প্রর্দুভাব কম থাকে। তাই ঐ সময় বীজ উৎপাদন করা ভাল। ঢেঁড়শে পরপরাগায়নের মাত্রা খুব বেশী। বীজ উৎপাদনে জাতের বিশুদ্ধতা রক্ষার জন্য এক জাত হতে অন্য জাত কমপক্ষে ২০০ মিটার দূরত্বে লাগাতে হয়। জমিতে রোগাক্রান্ত গাছ দেখা মাত্রই তুলে ফেলতে হবে। এক সপ্তাহ শুকিয়ে তারপর বীজ সংগ্রহ করতে হবে।

## শসা

চর অঞ্চলে শসা একটি প্রধান অর্থকরী ফসল হিসেবে বিবেচিত। এলাকার শসা দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বাজারজাত হচ্ছে। চর এলাকায় পুকুরপাড়ে, বাড়ীর উঁচু জায়গায় সর্জান পদ্ধতিতে খরিফ মৌসুমে বিশেষভাবে প্রস্তুতকৃত নেটের মাচায় প্রচুর পরিমানে শসার চাষাবাদ হচ্ছে।

**শসার জাত**

দেশী উন্নত, হাইব্রিড শসার মধ্যে আলাভী, এলিন, গ্রীন লাইন ইত্যাদি ইদানিং অত্যন্ত জনপ্রিয়তা পেয়েছে।

**চাষের নিয়ম**

শসা, পালা-শসা ও ভুঁয়ে শসা এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। পালা-শসা সচরাচর মার্চ থেকে জুন মাস পর্যন্ত বপন করা হয়। হেক্টরপ্রতি ৫০০-৮০০ গ্রাম বীজ লাগে। সাধারণত: ২-২৫ মিটার দূরত্বে মাদা তৈরী করা হয়। মাদার আকার দৈর্ঘ্যে, প্রস্থে ও গভীরতায় ৫০-৮০ সে.মি. হয়ে থাকে। এক একটি মাদায় প্রথমে ৬/৭টি বীজ পুঁতে, পরে চারা অবস্থায় দুটি করে চারা রাখলেই চলে। পালা-শসায় অবশ্যই মাচা কিংবা বাউনী বা জাফরি দিতে হয়। এক মিটার দূরত্বে সারি করেও শসা বোনা যায়।

শসার জন্য মাঝারি উর্বরতা বিশিষ্ট মাটির ক্ষেত্রে হেক্টরপ্রতি ৫০০০ কেজি গোবর সার, ২৮০ কেজি খৈল, ১০০ কেজি ইউরিয়া, ১৫০ কেজি টিএসপি ও ১০০ কেজি এমপি সার ব্যবহার করা যেতে পারে। ইউরিয়া ছাড়া অন্যান্য সার বীজ বপনের ৮/১০ দিন আগে গর্তের মাটির সাথে মিশাতে হয়। ইউরিয়া সার দুইবারে তথা বীজ বপনের ২০ ও ৪০ দিন পরে মাদার উপরের দিকের মাটিতে প্রয়োগ করতে হবে। শসার জন্য পানি নিষ্কাশনের সুব্যবস্থা থাকা অবশ্য প্রয়োজনীয়। প্রয়োজনমত পরিমিত পানি-সেচও লাগতে পারে।

**ফল সংগ্রহ**

শসা সংগ্রহ করা হয় ধাপে ধাপে। সালাদের জন্য কচি, রান্নার জন্য মাঝারী এবং পায়েশের জন্য পাকা অবস্থার শসা তোলা হয়। হেক্টরপ্রতি ১০-২০ টন শসা সংগ্রহ করা যেতে পারে।

## মিষ্টিকুমড়া

মিষ্টিকুমড়া প্রধানত: ব্যবহার করা হয়পাকা অবস্থায় এবং অনেকের কাছে এই কুমড়া একটি অতি প্রিয় তরকারী। কুমড়া সচরাচর বৈশাখী, শারদীয়া ও মাঘী এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত। চর এলাকায় সাধারণত স্থানীয় উন্নত জাত ব্যবহার করা হয়।

**জাত:** হাইব্রিড সুইটি, বারমাসী ইত্যাদি।

**চাষের নিয়ম**

বৈশাখী কুমড়ার বীজ পৌষ ও মাঘ মাসে, বর্ষাতি কুমড়ার বীজ চৈত্র-বৈশাখ মাসে এবং মাঘী কুমড়ার বীজ আষাঢ়-শ্রাবণ মাসে বোনা হয়। তবে সর্বাধিক প্রচলিত বর্ষাতি কুমড়া যা প্রধানত: খরিফ মৌসুমে জন্মানো হয়। মাদার জন্য সচরাচর ৩-৩.৫ মিটার দূরত্বে ৮০-১০০ সে.মি. ঘন আকারের গর্ত তৈরী করা হয়। প্রতি মাদায় ৬/৭টি বীজ পুঁতে, পরে চারা অবস্থায় দুটি করে চারা রাখলেই চলে। প্রতি শতাংশে ২৫ গ্রাম বীজ লাগে। বৈশাখী-কুমড়া জমিতে হতে পারে। অন্যান্য মৌসুমের কুমড়ার জন্য মাচার দরকার।

মিষ্টি কুমড়ার জন্য গড়পড়তা জমিতে হেক্টরপ্রতি ৫ টন গোবর সার, ৪০০ কেজি খৈল, ১১০ কেজি ইউরিয়া, ১৭৫ কেজি টিএসপি, ১৩০ কেজি এমপি, ৮০ কেজি জিপসাম ও ৪ কেজি জিংক অক্সাইড প্রয়োগ করা যেতে পারে। ইউরিয়া ছাড়া অন্যান্য সার বীজ বোনার ৮/১০ দিন আগে গর্তের মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হয়। ইউরিয়া সার দুভাগে বীজ বোনার ২০ ও ৩৫ দিন পরে মাদায় পার্শ্ব প্রয়োগ করতে হয়। এই কাজের জন্য মাদার চারদিকে একটি অগভীর নালা কেটে নালার মাটির সাথে সার মিশিয়ে সেই মাটি দিয়ে নালা ভর্তি করে দেয়া যেতে পারে। গাছের লতাপাতার অতিরিক্ত বৃদ্ধি হলে কিছু লতা ও পাতা ছেটে দেয়া যায়। কুমড়া জাতীয় সবজির ফলন বৃদ্ধির জন্য কৃত্রিম পরাগায়ন একটি আবশ্যকীয় প্রযুক্তি। ফুল হতে ফল ঠিকমতো ধরার জন্য সকাল বেলায় হাত দিয়ে ফুলের পরাগায়ন করিয়ে দেওয়া হয়। এই কাজের জন্য ফুল ফুটার পর পর পুরুষ জাতীয় ফুল নিয়ে স্ত্রী-ফল-প্রদানকারী পুষ্পের গর্ভকেশরের গায়ে হালকাভাবে বুলিয়ে দেয়া হয়। মিষ্টিকুমড়ার পোকামাকড় ও রোগবালাই অনেকটা চালকুমড়ার মতোই।

**ফল সংগ্রহ**

**মিষ্টি কুমড়ার বৈশাখী জাতি যা প্রধানত:** ভুঁই কুমড়া রূপে পরিচিত, তা চৈত্র-বৈশাখ মাসে, বর্ষাতি জাতি আষাঢ়-শ্রাবণ মাসে ও মাঘী জাতি অগ্রহায়ণ-পৌষ মাসে সংগ্রহ করা হয়। মিষ্টি কুমড়া বেশ পাকিয়ে সংগ্রহ করলে বহুদিন ঘরে রাখা যায় এবং অসময়ে তরকারীরূপে ব্যবহার করা যায়। এজন্য প্রায় সারা বছরই বাজারে মিষ্টি কুমড়া পাওয়া যায়। চর এলাকায় গড় ফলন প্রতি শতাংশে ৭০-৮০ কেজি।

## আলু

আলু সাধারণত: গোল-আলু নামেও পরিচিত। উৎপাদনের পরিমাণের দিক থেকে আলু বাংলাদেশের সর্বপ্রধান সবজি ফসল। বছরে প্রায় ২.৪৫ লক্ষ হেক্টর জমিতে চাষ করে প্রায় ৬০ লক্ষ টন আলু উৎপন্ন হয়। এটি সারা বছর ধরে বাজারে পাওয়া যায়। একমাত্র আলু সংরক্ষণের জন্যই এদেশে প্রায় ১৬৭টি হিমাগার রয়েছে, যেখানে একবারে প্রায় পৌনে চার লক্ষ টন আলু রাখা সম্ভব। পৃথিবীর বহুদেশে আলু চাউল ও গমের মত প্রধান খাদ্যরূপে খাওয়া হয়। আলুর হেক্টরপ্রতি ফলন চাউল, গম ও ভূট্টা অপেক্ষা অনেক বেশী। আলু পুষ্টিমানেও বেশ সমৃদ্ধ। সিদ্ধ আলু প্রায় ভাতের মতই পুষ্টিকর। বরং আলুতে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন সি থাকে, যা ভাতে একবারেই থাকে না। আলু খুবই লাভজনক ফসল। আলু চাষে হেক্টরপ্রতি মুনাফা বহু শস্যের চেয়ে বেশী। এছাড়া ইদানিং আলু বিদেশে রপ্তানী করে প্রচুর বৈদেশিক মূদ্রা আয় হচ্ছে।

**আলুর জাত**

আলুর উচ্চ ফলনশীল বিদেশী জাতগুলোর মধ্যে কার্ডিনাল, ডায়ামন্ট, কুফরি সিন্দুরী, মুল্টা, মেরিনো, ওরিগো ও হীরা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। প্রথম ও তৃতীয় জাতটি লালচে ত্বক বিশিষ্ট এবং অন্যান্য গুলোর ত্বক সাদা বর্ণের। এই জাতগুলো সচরাচর ৯০-১০০ দিনের মধ্যে পরিপক্কতা লাভ করে। শেষোক্ত জাতের আলু রোপণের ৭০-৮০ দিনের মধ্যেই সংগ্রহের উপযোগী হয়। তাছাড়া দেশী জাতের অপেক্ষাকৃত কম ফলনশীল আলুর চাষও প্রচলিত আছে। এসব জাতের মধ্যে লাল পাকরী, চল্লিশা, ললিতা, শীলবিলাতি, দোহাজারী, দেশী সাদা, লাল মাড্ডা ও ঝাউ বিলাতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এছাড়া উফশী জাত হিসেবে বারি আলু-২১, ২৭ ও ২৯ কিছুটা লবণাক্ততা সহ্য করতে পারে। সুতরাং চরাঞ্চলে এই জাত গুলি আবাদের সম্ভাবনা রয়েছে।

**বীজ বপন**

নভেম্বরের শুরু থেকে ডিসেম্বরের প্রথমভাগ পর্যন্ত (মধ্য কার্তিক থেকে মধ্য পৌষ পর্যন্ত) বীজ বুনা হয়। এরপর বীজ বুনতে যত দেরী হবে ফলনও হবে তত কম। এজন্য জমিতে জো আসামাত্র মাটি গভীরভাবে কর্ষণ করে বা কুপিয়ে ঝুরঝুর করে নিতে হবে।

অধিকাংশ মাঝারি-উর্বর মাটির জন্য হেক্টরপ্রতি ৪ টন গোবর সার, ১৫০ কেজি ইউরিয়া, ১৬০ কেজি টিএসপি, ২৬০ কেজি এমপি, ৮০কেজি জিপসাম সার ও ৪ কেজি জিংক অক্সাইড প্রয়োগ করা যেতে পারে। ইউরিয়া সারের অর্ধেকাংশ ও অন্যান্য সারের সবটা জমি তৈরীর শেষ পর্যায়ে মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হবে। দেশী জাতের বেলায় কিছুটা কম সারেও চলে। প্রতি শতাংশে ৮ কেজি বীজ-আলু লাগে। ছোট আকারের বীজ আলু (২৮-৩৫ মি: মি:) আস্ত এবং বড় আকারের

বীজ আলু (৩৫-৫৫ মি: মি:) লম্বালম্বি ভাবে দুই-তিন ভাগে কেটে লাগানো যাবে। লক্ষ্য রাখতে হবে প্রতি বীজখন্ডে যেন কমপক্ষে দুটো চোখ থাকে। বীজ আলু ৬০ সে: মি: (দুই ফুট) দূরত্বের সারিতে প্রায় ৩০ সে: মি: (এক ফুট) অন্তর অন্তর ৬-৭ সে: মি: গভীর করে বপন করতে হবে। বীজ বা বীজখন্ড ছোট হলে এর চেয়ে কম দূরত্বেও তা রোপণ করা যায়। হিমাগারে সংরক্ষিত বীজ-আলু বপনের আগে অংকুরিত করে নেওয়া উত্তম।

**পরিচর্যা**

ইউরিয়া সারের বাকী অংশ বীজ-বপনের ২৫-৩০ দিন পর গাছের গোড়ায় প্রথম দফা মাটি দেয়ার আগে উপরিপ্রয়োগ করে নিতে হবে। সচরাচর সারের উপরি-প্রয়োগের পরপরই সারিতে মাটি তুলে ভেলি বেঁধে দেয়া হয়। আর এর পরই জমিতে সেচ দেয়ার দরকার হয়। সেচের সময় নালাতে কেবল দুই-তৃতীয়াংশ পরিমাণ পানি দিয়ে ভর্তি করতে হবে। তাতেই ভেলির উপরিভাগ শোষিত পানি দিয়ে ভিজে যাবে। মাটিতে পর্যাপ্ত জলীয় রস রাখার প্রয়োজনে মাটির অবস্থাভেদে আলুর জন্য ২-৫টি সেচ লাগতে পারে। তবে মাটি যেন সবসময় স্যাঁতসেঁতে না থাকে। সেচ বা বৃষ্টির বাড়তি পানি জমি থেকে নিষ্কাশন করতে হবে। সাধারণত: গাছের উচ্চতা ৩০-৪০ সে: মি: (১২-১৬ ইঞ্চি) হলে গাছের গোড়ায় দ্বিতীয় দফায় মাটি তোলার কাজ করতে হয়।

আলুর সবচেয়ে মারাত্মক রোগ আলী ব্লাইট বা নাবীধ্বসা। একে আলুর মড়কও বলে। সাধারণত: ঠান্ডা, মেঘলা, আর্দ্র ও কুয়াশাচ্ছন্ন আবহাওয়াতে এই রোগ দেখা দেয় এবং আকস্মিকভাবে ছড়িয়ে পড়ে সম্পূর্ণ ক্ষেত ধ্বংশ করে। এজন্য এরূপ আবহাওয়া দেখা দেয়া মাত্র রোগ-প্রতিরোধক ঔষধ ডাইথেন এম-৪৫ কিংবা রিডোমিল ছিটিয়ে দিতে হবে। আলুর কাটুই পোকা গাছের কান্ড বা গোড়া কেটে দিয়ে বিশেষ ক্ষতি সাধন করতে পারে। বাগানে প্রতিদিন ভোরবেলা খুঁজে খুঁজে কর্তিত কান্ডের গোড়ার মাটি খুঁড়ে পোকা ধরে মেরে ফেললে ঔষধের প্রয়োজন নাও হতে পারে।

**সংগ্রহ ও সংরক্ষণ**

প্রতি শতাংশে ৮০-১২০ কেজি বা তারও বেশী আলু উৎপন্ন হয়। তবে চর এলাকার গড় ফলন প্রতি শতাংশে ৬০-৭০ কেজি। সাধারণত: প্রায় তিন মাস বয়স হলে গাছের পাতা মরতে শুরু করে। তখন আলু তুলতে হয়। আলু তোলার পর খোলা স্থানে বিছিয়ে শুকিয়ে নেয়া উচিত। যথা সম্ভব ঠান্ডা পরিবেশে ও বায়ু চলাচল যুক্ত স্থানে আলু রাখা দরকার। এভাবে ঘরে ৩/৪ মাস আলু রাখা যায়। আলু সংরক্ষণের সবচেয়ে উৎকৃষ্ট স্থান হিমাগার। বীজ-আলু হিমাগারে অবশ্যই রাখতে হবে। সেখানে সহজেই ৯-১০ মাস পর্যন্ত আলু সংরক্ষণ করা যায়। খাওয়ার আলুর জন্যও হিমাগারে সংরক্ষণ উত্তম ব্যবস্থা।

## মিষ্টি আলু

মিষ্টি আলু একাধারে প্রধান খাদ্য ও সবজি। আফ্রিকার কয়েকটি দেশে ও পাপুয়া নিউগিনিতে মিষ্টি আলু চাল বা গমের পরিবর্তে প্রধান খাদ্যশস্যরূপে ব্যবহৃত হয়। বাংলাদেশেও অনেকের কাছে এটি প্রধান খাদ্যের মত। মিষ্টি আলু সিদ্ধ করে কিংবা পুড়িয়ে খাওয়া যায়। নিরামিষ রান্নায়ও মিষ্টি আলুর ব্যবহার উল্লেখযোগ্য। কোন কোন খাদ্য-উপাদানের দিক থেকে মিষ্টি আলু আলুর চেয়ে উৎকৃষ্টতর, আবার এর উৎপাদন-ব্যয় অনেক কম। মিষ্টি আলুর পাতা শাকরূপে ব্যবহার করা হয় যা উচ্চ পুষ্টিমান সম্পন্ন।

**মিষ্টি আলুর জাত**

স্থানীয় ও উফশী জাত উভয়ই বিভিন্ন চরাঞ্চলে চাষাবাদ হয়। উফশী জাতের মধ্যে তৃপ্তি, কমলা সুন্দরী, বারি মিষ্টি আলু-৪, বারি মিষ্টি আলু-৫, বারি মিষ্টি আলু-৬, বারি মিষ্টি আলু-৭, বারি মিষ্টি আলু-৮, বারি মিষ্টি আলু-৯ ইত্যাদি। এ জাত গুলি প্রায় ৪০-৫০ টন পর্যন্ত ফলন পাওয়া যায়।

**বীজ বপন**

নভেম্বর মাস (মধ্য কার্তিক-মধ্য অগ্রহায়ন) মিষ্টি আলুর লতা লাগানোর উত্তম সময়। এর পর রোপণে যত দেরী হবে ফলন তত কম হবে। শীত আসার আগেই গাছের বেশ কিছুটা বৃদ্ধি হলে, শীতের পরে গাছ দ্রুত বিস্তৃত হয়ে অধিক ফলন দিতে সাহায্য করে।

জমি গভীরভাবে চাষ করে মাটি ঝুরঝুরে করে নিয়ে ৫০ সে.মি. দুরত্বের সারিতে ৩০ সে.মি. অন্তর অন্তর প্রায় ২০ সে: মি: দীর্ঘ লতাখন্ড রোপণ করতে হবে। লতা মাটিতে অনেকটা শুইয়ে তেরচা করে রোপন করতে হবে, যাতে তার গোড়ার দুইতিনটি পর্ব বা আইক মাটির নীচে থাকে। রোপণ কালে মাটিতে জো থাকা আবশ্যক। অন্যথায় রোপনের পরে হালকা সেচ দেয়া যেতে পারে।

সার প্রয়োগ দ্বারা মিষ্টিআলুর ফলন বৃদ্ধি করা যায়। হেক্টরপ্রতি প্রায় পাঁচ টন গোবর সার, ১২৫ কেজি ইউরিয়া, ১০০ কেজি টিএসপি ও ১৫০ কেজি এমপি সার প্রয়োগ করা যেতে পারে। গোবর ও টিএসপি জমি তৈরীর শেষ পর্যায়ে এবং ইউরিয়া ও এমপি দুই ভাগ করে রোপণের ২৫ ও ৩০ দিন পর প্রয়োগ করা যাবে। সেচ দেয়ার সুবিধা না থাকলে সব সার শুরুতেই একবারে প্রয়োগ করা সংগত।

**পরিচর্যা**

মিষ্টি আলু তুলনামূলক ভাবে কম যত্নেও জন্মে। তবে সেচ ও অন্যান্য পরিচর্যার সাহায্যে ফলন বৃদ্ধি করা যায়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে দুইটি সেচেই চলে। সেচের পর জো আসামাত্র কুপিয়ে ঝুরঝুরে করে দিতে হয়। লতা যেন বাতাসে বা অন্যভাবে নড়ে না যায় সেদিকে দৃষ্টি রাখতে হয়। প্রয়োজনবোধে মালচ্ বা খড়-কুটা ইত্যাদি দিয়ে আস্তরণ দেয়া যেতে পারে।

**সংগ্রহ ও সংরক্ষণ**

সাধারণত: এপ্রিল মাসের দিকে (মধ্য চৈত্র-মধ্য বৈশাখ) ক্ষেত থেকে আলু সংগ্রহ করা হয়। সংগ্রহের সময় এসে গেলেও অনেক সময়ে গাছ দেখে তা বুঝা যায় না। কারণ, গাছ গোল আলুর মত শুকিয়ে যায় না। যদি কন্দ কাটলে ঘন রস বের হয় এবং তা দ্রুত শুকিয়ে যায়, তাহলে আলু বাত্তি বা পরিপক্ক হয়েছে বলে মনে করা যাবে। সার প্রয়োগ ও পরিচর্যার সাহায্যে উচ্চফলনশীল জাত থেকে হেক্টরপ্রতি ৪০-৫০ টন মিষ্টি আলু পাওয়া যায়। অপরপক্ষে, দেশী জাত থেকে ২৫-৩০ টনের অধিক ফলন পাওয়া কঠিন হয়। সংরক্ষণের সুবিধার জন্য আলু বোঁটাসহ তোলা উচিত।

মিষ্টি আলু বেশী দিন সংরক্ষণ করা যায় না। আলু ঘরের সবচেয়ে ঠান্ডা স্থানে, অন্ধকারে মেঝেতে ছড়িয়ে রাখতে হয়। উইভিল-পোকা দ্বারা আক্রান্ত আলুগুলো বেছে নিয়ে আগেই ব্যবহার করতে হবে; রেখে দেয়া ঠিক হবে না। যত্ন সহকারে রাখলে মিষ্টি আলু প্রায় তিন মাস পর্যন্ত সংরক্ষণ করা সম্ভব।

**মিষ্টি আলুর বীজ লতা উৎপাদন**

**বীজ লতা উৎপাদন:** ভাল ফলন পেতে হলে উন্নতমানের বীজ লতা ব্যবহার করা প্রয়োজন। ভাল গুনাগুন সম্পন্ন গাছ এবং ফলন দেখে বীজের লতা নির্বাচন করতে হবে।

**উৎপাদন সময়:** মধ্য ফাল্গুন থেকে বৈশাখ মাসের মাঝামাঝি (মার্চ-এপ্রিল) নির্বাচিত গাছের লতা বীজ তলায় রোপন করতে হবে। বীজতলার জন্য উচু, পানি দাড়ায় না ও রোদ পড়ে এমন জায়গা ৬০ X ৩০ সে:মি: দূরত্বে ২৫-৩০ সে:মি: লম্বা লতার খন্ড লাগাতে হবে। যতদূর সম্ভব আগার খন্ড রোপন করাই ভাল।

**রোপন পদ্ধতি:** খেয়াল রাখতে হবে যাতে লতার প্রায় $^{২}/_{৩}$ অংশ মাটির নীচে পড়ে। লতার নীচের অংশ মাটির $^{৩}/_{৪}$ সে.মি. গভীরে সমান্তরাল ভাবে শুইয়ে দিয়ে উপরের অংশ বাঁকিয়ে বসাতে হবে। জমি শুকনো থাকলে লতার গোড়ায় পানি দিতে হবে। লতা কিছু বড় হলে মাথা কেটে দিতে হবে তাতে নূতন শাখা কুশি গজাবে এবং লতার সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে। পরবর্তী মৌসুমে উৎপাদিত লতার সাহায্যে ৭-৮ গুন পরিমান জমিতে মিষ্টি আলুর আবাদ করা যাবে।

**বীজ লতা উৎপাদনে কন্দের ব্যবহার:** বীজ লতা উৎপাদনের জন্য লতার বদলে মিষ্টি আলুর কন্দ ব্যবহার করা যায়। সেজন্য বাছাইকৃত মিষ্টি আলুর গোটা কন্দ কিংবা কন্দের টুকরা রোপন করতে হবে। ৬০ X ২০ সে:মি: দূরত্বে কন্দ রোপন করতে হয়। বীজ তলায় আলুর কন্দ লাগানোর ৩/৪ মাসের মধ্যে লতা ভরে উঠবে এবং লতার ডগা ব্যবহার করা যাবে।

## বাঁধাকপি ও ফুলকপি

**জাত ও জাতের বৈশিষ্ট্য:**

| | |
|---|---|
| ১। জাত | বাঁধাকপি: বারি বাঁধাকপি-১ ও ২, কে-কে ক্রস, কে-ওয়াই ক্রস, এটলাস-৭০। ফুলকপি: আর্লি স্নোবল, গ্রীন সুপ্রিম, সুপ্রিম কুইন ইত্যাদি। |
| ২। গাছের | উচ্চতা ৩০-৫০ সে.মি. |
| ৩। জীবনকাল | ৮০-১২০ দিন |
| ৪। ফলন | বাঁধাকপি: ৩০০-৪০০ কেজি/শতাংশ<br>ফুলকপি: ৮০-১০০ কেজি/শতাংশ |

**উৎপাদন প্রযুক্তি:**

| | |
|---|---|
| ১। রোপন পদ্ধতি | চারা রোপন |
| ২। বীজতলায় বীজ বপনের সময় | আশ্বিণ-কার্তিক (সেপ্টেম্বর-অক্টোবর) |
| ৩। বীজের হার | ২ গ্রাম প্রতি শতাংশ জমির জন্য |
| ৪। চারার বয়স | ৩০-৩৫ দিন বা ৪-৫ পাতা বিশিষ্ট |
| ৫। রোপনের দূরত্ব | সারি থেকে সারি ৬০ সে.মি., চারা থেকে চারা ৪৫ সে.মি. |

৬। সার প্রয়োগ

ক) শেষ চাষের সময় প্রতি শতাংশে গোবর ৬০ কেজি, টিএসপি ১২০০ গ্রাম, এমপি ৮০০ গ্রাম।

খ) ইউরিয়া পার্শ্ব প্রয়োগ হিসেবে রোপনের ১৫ দিন পর ৫২৫ গ্রাম/শতাংশ মাটির সাথে মিশিয়ে গাছের গোড়ায় আইল করে দিতে হবে। পুনরায় প্রতি শতাংশে ৩০ দিন পর ৫২৫ গ্রাম ইউরিয়া ও ৪০০ গ্রাম এমপি সার মাটির সাথে মিশিয়ে গাছের গোড়ার আইলে দিতে হবে।

৭। ফসল ব্যবস্থাপনা ও পরিচর্যা

ক) ব্যবস্থাপনা

১) বিকালে চারা রোপন করে চারার গোড়ায় সাথে সাথে পানি দিতে হবে এবং কাগজ বা কলা পাতা দিয়ে কয়েকদিন চারা ঢেকে রাখতে হবে।

২) চারা ঢেকে না রাখা গেলে গোড়া সব সময় ভিজা রাখতে হবে।

খ) আগাছা দমন; জমি আগাছা মুক্ত রাখতে হবে।

৮। ফসল কাটা চারা রোপনের ৬০-৯০ দিনের মধ্যে খাওয়ার উপযোগী হয়।

## করলা

**জলবায়ু ও মাটি**

উষ্ণ ও আর্দ্র আবহাওয়ায় করলা ভাল জন্মে। পরিবেশগতভাবে এটি একটি কষ্টসহিষ্ণু উদ্ভিদ। মোটামুটি শুষ্ক আবহাওয়াতেও এটি জন্মানো যায়। তবে বৃষ্টিপাতের আধিক্য এর জন্য খুব ক্ষতিকর নয়। তবে জলাবদ্ধতা সহ্য করতে পারে না। অতিরিক্ত বৃষ্টিপাতে পরাগায়ন বিঘ্নিত হতে পারে। তাই শীতের ২/১ মাস বাদ দিলে বাংলাদেশে বছরের যেকোন সময় করলা জন্মানো যায়। শীতকালে গাছের বৃদ্ধির হার কম। ভাল ফলন পেতে হলে সারাদিন রোদ পায় এবং পর্যাপ্ত সেচের ব্যবস্থা আছে এমন স্থানে করলার চাষ করা উচিত। সব রকম মাটিতেই করলার চাষ করা সম্ভব তবে জৈব সারসমৃদ্ধ দোআঁশ ও বেলে দোআঁশ মাটিতে ভালো জন্মে। চরাঞ্চলে শুষ্ক মৌসুমে অধিক লবণাক্ত থাকায় পুকুর পাড়ে অথবা বসতবাড়ীর আশে পাশে উঁচু জায়গায় এই ফসলের চাষ করা হয়।

**জাত:** বারি করলা-১, উফশী গজ করলা, হাইব্রীড টিয়া, হাইব্রীড গ্রীন রকেট বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য

**জীবন কাল:** করলার জীবন কাল চার থেকে সাড়ে চার মাস। তবে জাত ও আবহাওয়াভেদে কোন কোন সময় কমবেশি হতে পারে।

### বীজ বপনের সময়

বছরের যে কোন সময় করলার চাষ সম্ভব হলেও এদেশে প্রধানত: খরিফ মৌসুমেই করলার চাষ করা হয়ে থাকে। ফেব্রুয়ারী থেকে মে মাসের মধ্যে যে কোন সময় করলার বীজ বোনা যায়। জানুয়ারি মাসে বীজ বুনলে তাপমাত্রা কম থাকায় গাছ দ্রুত বাড়তে পারে না। ফলে আগাম ফসল উৎপাদনে তেমন সুবিধা হয় না। তবে পর্যাপ্ত সেচের ব্যবস্থা করতে পারলে আশাব্যঞ্জক ফলন পাওয়া যায়। তবে উচ্ছে চাষ বছরের যে কোন সময় করা যায় এবং শীতকালে বেশি চাষ হয়ে থাকে। হেক্টর প্রতি বীজের হার ৬-৭.৫ কেজি।

### জমি তৈরি ও বপন পদ্ধতি

খরিফ মৌসুমে চাষ হয় বলে করলার জন্য এমন স্থান নির্বাচন করতে হবে যেখানে পানি জমে না। বসতবাড়িতে করলার চাষ করতে হলে দু'চারটি মাদায় বীজ বুনে গাছে বেয়ে উঠতে পারে এমন ব্যবস্থা করলেই হয়। তবে বাণিজ্যিকভাবে চাষের জন্য প্রথমে সম্পূর্ণ জমি ৪-৫ বার চাষ ও মই দিয়ে প্রস্তুত করে নিতে হয় যাতে শিকড় সহজেই ছড়াতে পারে। জমি বড় হলে নির্দিষ্ট দূরত্বে নালা কেটে লম্বায় কয়েক ভাগে ভাগ করে নিতে হয়। বেডের প্রশস্ত হবে ১ মিটার এবং দু'বেডের মাঝে ৩০ সে.মি. নালা থাকবে। উচ্ছে ও করলার বীজ সরাসরি মাদায় বোনা যায়। এক্ষেত্রে প্রতি মাদায় কমপক্ষে ২টি বীজ বপন কতে হবে অথবা পলিব্যাগে (১০ সেমি x ১৫ সে.মি.) ১৫-২০ দিন বয়সের চারা উৎপাদন করে নেওয়া যেতে পারে। উচ্ছের ক্ষেত্রে সারিতে ১ মিটার এবং করলার জন্য ১.৫ মিটার দূরত্বে মাদা তৈরি করতে হবে। চারা গজানোর পর একের অধিক তুলে ফেলে দিতে হবে। বীজের ত্বক শক্ত ও পুরু বিধায় বোনার পূর্বে বীজ ২৪ ঘন্টা পানিতে ভিজিয়ে নিলে বীজ তাড়াতাড়ি অংকুরিত হয়। মাদায় বীজ বুনতে বা চারা রোপণ করতে হলে অন্তত: ১০ দিন আগে মাদায় নির্ধারিত সার প্রয়োগ করে তৈরি করে নিতে হবে। মাদার আয়তন হবে ৪০ সে.মি. x ৪০ সে.মি. x ৪০ সে.মি.।

### সারের পরিমাণ ও প্রয়োগ

করলার জমিতে হেক্টরপ্রতি নীচে বর্ণিত হারে সার প্রয়োগ করতে হয়।

| সারের নাম | মোট পরিমাণ (হেক্টরপ্রতি) | জমি ও মাদা তৈরির সময় দেয় | পরবর্তী পরিচর্যা হিসেবে দেয় | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | প্রথম কিস্তি চারা গজানোর ২০ দিন পর | দ্বিতীয় কিস্তি চারা গজানোর ৪০ দিন পর | তৃতীয় কিস্তি চারা গজানোর ৬০ দিন পর |
| গোবর | ১০ টন | সব | - | - | - |
| ইউরিয়া | ১৫০ কেজি | - | ৫০ কেজি | ৫০ কেজি | ৫০ কেজি |
| টিএসপি | ১৭৫ কেজি | সব | - | - | - |
| এমপি | ১৫০ কেজি | ৫০ কেজি | ৪০ কেজি | ৩০ কেজি | ৩০ কেজি |
| জিপসাম | ৭০ কেজি | সব | - | - | - |
| জিংক অক্সাইড | ১০ কেজি | সব | - | - | - |
| বোরিক এসিড | ১০ কেজি | সব | - | - | - |

- মাটির উর্বরতা ভেদে সারের পরিমাণ কম বেশি হতে পারে।

### অন্তর্বর্তীকালীন পরিচর্যা

সময়মত নিড়ানি দিয়ে আগাছা সবসময় পরিষ্কার করে সাথে সাথে মাটির চটা ভেঙ্গে দিতে হবে। খরা হলে প্রয়োজন অনুযায়ী সেচ দিতে হবে ও সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা করতে হবে। পানির অভাব হলে গাছের বৃদ্ধির বিভিন্ন অবস্থায় এর লক্ষণ প্রকাশ পায় যেমন: প্রাথমিক অবস্থায় চারার বৃদ্ধি বন্ধ, পরবর্তীতে ফুল ঝরে যাওয়া এবং ফলের বৃদ্ধি বন্ধ হওয়া ও ঝরে যাওয়া ইত্যাদি। বাউনী দেয়া করলার প্রধান পরিচর্যা। চারা ২০-২৫ সে.মি. হলে উঁচু মাচা তৈরি করে (১-১.৫ মিটার) এবং বাউনীর ব্যবস্থা করতে হবে। কৃষকরা সাধারণত: উচ্ছে চাষে বাউনী ব্যবহার করে না তার বদলে মাদা বা সারির চারপাশের জমি খড় দিয়ে ঢেকে দেয় হয়। উচ্ছের গাছ খাটো বলে এ পদ্ধতিতেই ভাল ফলন পাওয়া যায়। তবে বর্ষাকালে

এভবে করলা চাষ করলে প্রচুর ক্ষতির সম্ভাবনা দেখা দিতে পারে। বাউনী ব্যবহার করলে খড়ের আচ্ছাদনের তুলনায় উচ্ছের ফলন ২৫-৩০% বৃদ্ধি পায়। বাউনী দিলে ফলন বেশি ও ফলের গুণগত মানও ভাল হয়। গাছের গোড়া থেকে যে ডালপালা বের হয় সেগুলো কেটে দিতে হয় এতে গোড়া পরিষ্কার থাকে, রোগবালাই ও পোকামাকড়ের উপদ্রব কম হয় এবং আন্ত: পরিচর্যার কাজ সহজ হয়। জুন-জুলাই মাস থেকে বৃদ্ধি শুরু হওয়ার পর আর সেচের প্রয়োজন হয় না। জমির পানি নিকাশের জন্য বেড ও নিষ্কাশন নালা সর্বদা পরিষ্কার করে রাখতে হবে। করলা গাছ জলাবদ্ধতা সহ্য করতে পারে না।

**ফসল সংগ্রহ ও ফলন**

চারা গজানোর ৪০-৪৫ দিন পর উচ্ছে গাছ ফল দিয়ে থাকে। কিন্তু করলার বেলায় প্রায় ২ মাস লাগে। কচি ও খাওয়ার উপযোগী পুষ্ট ফল ২-৩ দিন পর ফল সংগ্রহ করতে হয়। আগাম জাতে লাগানোর একমাস পরই গাছে ফুল ধরা শুরু হয়। স্ত্রীফুলের পরাগায়নের ১৫-২০ দিনের মধ্যে ফল খাওয়ার উপযুক্ত হয়। ফল আহরণ একবার শুরু হলে তা ২ মাস পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। উন্নত পদ্ধতিতে চাষাবাদ করলে উচ্ছে ও করলার হেক্টরপ্রতি ফলন যথাক্রমে ৭-১০ এবং ২০-২৫ টন পাওয়া যায়।

## বরবটি

**মাটি ও জলবায়ু**

সব রকম মাটিতে বরবটির চাষ করা যায়। তবে দোআঁশ মাটি অধিকতর উপযোগী। কারণ বর্ষাকালে এ জাতীয় মাটির ব্যবস্থাপনা সহজ। অপেক্ষাকৃত উচ্চ তাপমাত্রায় বরবটি ভাল জন্মে। সাধারণভাবে ২০°-৩০° সে. তাপমাত্রা গাছের বৃদ্ধির জন্য সবচেয়ে উপযোগী। বাংলাদেশের বছরের যে কোন সময় বরবটি জন্মানো সম্ভব তবে শীতকালে গাছের বৃদ্ধির হার কম। বরবটি শুষ্ক ও আর্দ্র উভয় অবস্থায় জন্মানোর উপযোগী তবে অতিবৃষ্টির সময় ফলধরা ব্যাহত হয়। আকাশের দীর্ঘস্থায়ী মেঘাচ্ছন্নতায় বরবটির ফলন কম হয়।

**ফসলের জীবনকাল**

সবজির জন্য বরবটি বীজ লাগানোর ৪০-৪৫ দিন পরই তোলা যায়। ফসল পাকতে (বীজের জন্য) ১২০-১৪০ দিন সময় লাগবে।

**জাত:** জাত হিসাবে বারি বরবটি-১, কেগরনাটকী ও হাইব্রীড জাত সমূহ চাষ করা যেতে পারে।

**বীজ বপনের সময়**

মার্চ থেকে আগস্ট মাস পর্যন্ত বীজ বপন করা যায়। হেক্টর প্রতি বীজের হার ৮-১০ কেজি।

**চারা উৎপাদন**

পলিপটে (৪ x ৫" মাপের) গোবর ও মাটি মিশ্রিত মিশ্রণ ভর্তি করে পলিপটে বীজ দিতে হবে। বীজ দেওয়ার পর ৪-৫ দিন পর্যন্ত প্রতিদিন সকাল ও বিকালে পলিপটে পানি দিতে হবে। আবার সরাসরি পিট করে পিটের গর্তে সরাসরি বীজ বপন করা যায়। তবে সারি পদ্ধতিতে ৩০ সে.মি. দূরে দূরে বীজ বপন করতে হবে এবং সারি থেকে সারির দূরত্ব হবে ৬০ সে.মি.। এক সপ্তাহ পর্যন্ত নিয়মিত পানি দিতে হবে।

**জমি তৈরি**

| | | | |
|---|---|---|---|
| বেডের আকার | প্রস্থ | : | ১০০ সে.মি. |
| | দৈর্ঘ্য | : | জমির দৈর্ঘ্যের উপর নির্ভর করবে |
| | উচ্চতা | : | মাটি হতে ১০ সে.মি. উঁচু হতে হবে |
| নালার আকার | প্রস্থ | : | ৫০ সে.মি. |
| বেডে বীজ বুনার দূরত্ব | সারি থেকে সারি | : | ৬০ সে.মি. |
| | গাছ থেকে গাছ | : | ৩০ সে.মি. |
| বীজ বুনার গভীরতা | | : | ২.৫-৫ সে.মি. |
| প্রতি বেডের সারির সংখ্যা | | : | ২ টি |

### সারের পরিমাণ (কেজি/হেক্টর) ও প্রয়োগ পদ্ধতি

বরবটি ডাল জাতীয় শস্য। এতে সারের পরিমাণ বিশেষ করে নাইট্রোজেন সারের পরিমাণ কম লাগে।

| সারের নাম | মোট পরিমাণ | শেষ চাষের সময় প্রয়োগ | গর্তে বপন/রোপনের সময় (মাদায় প্রয়োগ) | উপরি প্রয়োগ |
|---|---|---|---|---|
| গোবর | ১০ টন | সব | - | - |
| ইউরিয়া | ৫০ কেজি | - | ২৫ কেজি | ২৫ কেজি |
| টিএসপি | ১৫০ কেজি | সব | - | - |
| এমপি | ১৫০ কেজি | ৭৫ কেজি | ৪০ কেজি | ৩৫ কেজি |
| জিপসাম | ১০০ কেজি | সব | - | - |
| জিংক সালফেট | ১২ কেজি | সব | - | - |
| বোরিক এসিড | ১০ কেজি | সব | - | - |

- শেষ চাষের সম্পূর্ণ গোবর সার এবং জিপসাম ও বোরিক এসিড সবটুকু ছিটিয়ে জমিতে প্রয়োগ করে চাষ দিয়ে মাটির সাথে ভালভাবে মিশিয়ে দিতে হবে।
- বীজ বপনের বা চারা রোপণের ৪-৫ দিন আগে ইউরিয়া এবং এমপি (পটাশ) সারের অর্ধেক এবং টিএসপি সারের সবটুকু একত্রে ছিটিয়ে প্রয়োগ করে মাদার মাটির সাথে (১০ সে.মি. গভীর পর্যন্ত) কোদালের হালকা কোপ দিয়ে ভাল ভাবে মিশিয়ে দিতে হবে। ইউরিয়া এবং এমপি (পটাশ) সারের বাকি অর্ধেক বপনের ৩০ দিন পর মিড়িতে ছিটিয়ে প্রয়োগ করে কোদাল দিয়ে হালকা কুপিয়ে মাটির সাথে ভালভাবে মিশিয়ে দিতে হবে। উল্লেখ্য সারের উপরি প্রয়োগের পর অবশ্যই সেচ দিতে হবে। মাদা তৈরির ৪-৫ দিন পর মাদায় বীজ বপন করা বা চারা রোপণ করা হয়। সাধারণত বীজ সরাসরি মাদায়ও বপন করা হয়। তবে পলিব্যাগে চারা তৈরি করেও মাদায় রোপণ করা যেতে পারে।

### সেচ ব্যবস্থা

বেডের দু'পাশের নালা দিয়ে বরবটির জমিতে সেচ দেয়া সুবিধাজনক। এসব নালার মাধ্যমে জমির সব জায়গায় সমানভাবে পানি সেচ দেয়া বা জমি থেকে অতিরিক্ত সেচের বা বৃষ্টির পানি বের করে দেয়া যায়। ফসলের সুষ্ঠু বৃদ্ধির জন্য কোন অবস্থায় পানির অভাব হওয়া উচিত নয় এবং প্রয়োজনমত সেচ দেয়া জরুরী।

### আগাছা দমন ও গাছের গোড়ায় মাটি দেয়া

বীজ বুনার ২০-৩০ দিন পর্যন্ত বরবটির জমিতে আগাছামুক্ত রাখতে হবে। সারের উপরি প্রয়োগ এবং গাছের গোড়ায় মাটি দেয়া একই সংগে করা উচিত।

### মাচা তৈরি

বরবটিতে মাচা বা বাউনি দেওয়া অত্যাবশ্যক। এর লতা যত মুক্তভাবে বাইতে পারবে ফলন ততো বেশি হবে। লতা বড় হলে বাঁশ বা বাঁশের কঞ্চি অথবা কাঠি দিয়ে মাচা তৈরি করে দিতে হবে।

### ফসল সংগ্রহ

সবজির জন্যে চারা গজানোর ৪০-৪৫ দিন পর বরবটি গাছ হবে সংগ্রহ করা যায়। বরবটি হাত দিয়ে না ছিড়ে ধারালো ছুরির সাহায্যে কাটা উচিত। হেক্টর প্রতি ফলন ১৬-১৭ টন।

# অধ্যায়-৭
# মসলা ফসলের আবাদ

## পেঁয়াজ

পানি নিষ্কাশনের সুবিধাযুক্ত, ঝুরঝুরে হালকা দোঁআশ বা পলিযুক্ত মাটি পেঁয়াজ চাষের পক্ষে সবচেয়ে ভাল। অধিক অম্ল বা ক্ষারযুক্ত এবং এঁটেল মাটি পেঁয়াজ চাষের জন্য উপযুক্ত নয়।

**রোপনের পদ্ধতি ও সময়**

পেঁয়াজ সাধারণত: তিনটি পদ্ধতিতে চাষ করা যায়। যেমন- (১) সরাসরি বেতে বীজ বুনে, (২) কন্দ রোপন করে এবং (৩) বীজ তলায় বীজ বুনে চারা উত্তোলন করে তা রোপণ করে। উল্লিখিত প্রথম ও দ্বিতীয় পদ্ধতি অর্থনৈতিক দিক থেকে তেমন লাভজনক হয় না। অপরপক্ষে, বীজ হতে চারা তৈরী করে রোপণ করলে ফলন বেশী হয়। এ পদ্ধতিতে অক্টোবর মাসে বীজ তলায় বীজ বপন করতে হয়।

বাংলাদেশে পেঁয়াজের এলাকাভেদে বিভিন্ন স্থানীয় জাত রয়েছে। এদের মধ্যে তাহেরপুরী, ফরিদপুর বাটি, ঝিটকা, সালতা, কৈলাসনগর ইত্যাদি উলেস্নখযোগ্য। এছাড়া উচ্চ ফলনশীল জাতের মধ্যে বারিপেঁয়াজ-২, ৩ ও ৫ গ্রীষ্মকালে এবং বারিপেঁয়াজ-১ ও ৪ শীতকালে আবাদ করা হয়।

**চারা উৎপাদন**

- সরাসরি জমিতে বীজ বুনে পেঁয়াজ চাষে, প্রতি শতাংশে প্রায় ৩২ গ্রাম বীজের প্রয়োজন হবে
- চারা রোপন ১৬ গ্রাম প্রতি শতাংশ
- কন্দ রোপন ৫ কেজি প্রতি শতাংশ

**সাধারণত:** ৪-৫টি গভীর চাষ ও মই দিয়ে আগাছা বেছে, ঢেলা ভেংগে, মাটি ঝুরঝুরে ও সমান করে পেঁয়াজ চাষের জন্য জমি তৈরী করতে হবে।

**রোপণ ও পরবর্তী পরিচর্যা**

সচরাচর ৪০-৫০ দিন বয়সের চারা রোপনের জন্য উত্তম। সারি থেকে সারি এবং গাছ থেকে গাছের দূরত্ব ২০x১০ সে.মি. হতে হবে। এ দূরত্বে প্রতি হেক্টরে প্রায় ৩,৭৫,০০০ টি গাছ উৎপাদনের উপযোগী হবে।

সাধারণত: মধ্যম-উর্বর জমির জন্য হেক্টর-প্রতি ১০ টন গোবর সার, ২০০ কেজি ইউরিয়া, ১২৫ কেজি টিএসপি এবং ১৮০ কেজি পটাশ সার প্রয়োগ করতে হবে। জমি তৈরীর শেষ চাষের সময়, সম্পূর্ন গোবর সার এবং টিএসপি প্রয়োগ করতে হবে। ইউরিয়া ও এমপি সারকে সমান দুভাগ করে দুকিস্তিতে, যথাক্রমে চারা রোপনের ২০ দিন এবং ৫০ দিন পর জমিতে প্রয়োগ করে ভালভাবে মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হবে।

পেঁয়াজের জমিতে মাটির প্রয়োজনীয় রস না থাকলে ১০-১৫ দিন অন্তর পানির সেচ দিতে হবে। মনে রাখা দরকার যে, সেচের অভাব আমাদের দেশের পেঁয়াজের ফলন কম হওয়ার অন্যতম কারণ। পেঁয়াজের ক্ষেত্রে মাটির জোঁ আসার সাথে সাথে চটা ভেংগে দিতে হয়। অন্যথায় কন্দের বৃদ্ধি ব্যাহত হয়ে ফলন কমে যায়।

**ফসল সংগ্রহ ও ফলন**

পেঁয়াজ গাছের পরিপক্কতা এসে গেলে, এর গলার দিকের "টিসু" নরম হয়ে যায়। ফলে পাতা হেলে পড়ে। ক্ষেতের ফসলের প্রায় ৫০% গাছের পাতা এভাবে নিজে নিজেই ভেংগে গেলে, পেঁয়াজ সংগ্রহের উপযুক্ত সময় হয়েছে বলে ধরে

নিতে হবে। হেক্টরে দেশী পেঁয়াজ ১০-১৫ টন এবং উফশী জাত ১৬-২২ টন পর্যন্ত হতে পারে এবং বীজ প্রায় ৫০০-৮০০ কেজি উৎপাদন করা সম্ভব।

পেঁয়াজ সংগ্রহের পর পাতা কেটে ৫-৭ দিন বায়ু চলাচল সুবিধাযুক্ত, শীতল ও ছায়াময় স্থানে শুকিয়ে নিতে হয়। পরে যথারীতি বাছাই ও শ্রেণীবিন্যাস করে শুষ্ক, ঠান্ডা ও বায়ুময় গুদামে সংরক্ষণ করতে হয়। কিছু দিনের জন্য পাতলা বুনটের চটের বস্তায় পুরে সারিবদ্ধভাবে খামাল দিয়ে সংরক্ষণ করা যায়। এছাড়া দীর্ঘ সময়ের জন্য আলো-বাতাসময় শীতল স্থানে মাচা তৈরী করে মাচায় ছড়িয়ে সংরক্ষণ করা উত্তম। মাঝে মাঝে পঁচা পেঁয়াজ বেছে সরিয়ে ফেলতে হয়। ঠান্ডা গুদামে শুন্য ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রা ও ৬৪% আর্দ্রতায় ইহা সংরক্ষণ করা যায়।

## রসুন

পানি জমে থাকতে পারে না এমন উর্বর বেলে দোআঁশ মাটি রসুন চাষের জন্য উপযোগী। অধিক অম্ল বা ক্ষারযুক্ত এঁটেল মাটি রসুন চাষের জন্য উযুক্ত নয়। সচরাচর ৪-৬টি চাষ ও মই দিয়ে মাটিকে ঢেলাবিহীন ও সমতল করে জমি তৈরী করে নিতে হবে। স্থানীয় জাত ছাড়াও উফশী জাতের মধ্যে বারি রসুন-১ ও ২ এবং বাউ রসুন-২ শীত মৌসুমের জন্য উপযোগী বলে চাষ করা হয়।

**উৎপাদন পদ্ধতি**

ভাল ফসলের জন্য পুষ্ট ও সতেজ রসুনের কোয়া বীজ হিসাবে ব্যবহৃত হয়। প্রতি শতাংশ জমিতে প্রায় ১.৫-২.০ কেজি রসুনের কোয়া বীজ প্রয়োজন হয়।

- সরাসরি জমিতে বীজ বুনে পেঁয়াজ চাষে, প্রতি শতাংশে প্রায় ৩২ গ্রাম বীজের প্রয়োজন হবে
- চারা রোপন ১৬ গ্রাম প্রতি শতাংশ

রসুন কার্তিক মাসের মধ্যে বপন করতে হবে। জমির আকার অনুসারে লম্বা বেড তৈরী করতে হবে। বেডের প্রস্থ হবে ১ মিটার এবং বেডের পাশে জমির দৈর্ঘ্য বরাবর নালার প্রশস্ততা ৩০ সে.মি. দূরত্বে সারি করে সারিতে ১০ সে.মি. ব্যবধানে কোয়া বপন করতে হবে। কোয়া বপনের গভীরতা ৫-৬ সে.মি.। প্রতি ছয় সারি পর পর ৩০ সে.মি. জায়গা ফাঁকা রাখতে হবে যাতে আন্ত:পরিচর্যা কাজে কোন অসুবিধা না হয়। মধ্যম উর্বর মাটির জন্য হেক্টরপ্রতি ১০ টন গোবর, ২০০ কেজি ইউরিয়া, ১২৫ কেজি টিএসপি এবং ১০০ কেজি এমপি সার ব্যবহার্য। জমি তৈরীর শেষ চাষের সময় সমুদয় গোবর সার এবং টিএসপি প্রয়োগ করতে হয়। ইউরিয়া ও এমপি সারকে সমান দুভাগে ভাগ করে দুকিস্তিতে বীজ বপনের ৩০ দিন এবং ৬০ দিন পর জমিতে প্রয়োগ করতে হবে।

রসুনক্ষেতে মাটির প্রয়োজনীয় রস না থাকলে, প্রতি ১০-১৫ দিন অন্তর পানি সেচ আবশ্যক। রসুনের ক্ষেতে মাটির চটা বাঁধতে দেয়া যাবে না। পানি সেচের পর জোঁ আসার পর পরই, মাটির চটা ভেংগে দিয়ে গাছের গোড়া ঢেকে দিতে হয়।

**ফসল সংগ্রহ ও ফলন**

রসুন গাছের পরিপক্কতা আসলে, এর গাছের পাতার উপরিভাগ হলুদ থেকে বাদামী রং ধারণ করে এবং পাতা ভেংগে পড়ে। এরূপ সময়ে রসুন উত্তোলন করতে হয়। উপযুক্ত মাটি ও আবহাওয়ায় এবং সঠিক পরিচর্যায় রসুনের ফলন হেক্টরপ্রতি ৬-১০ টন পর্যন্ত হতে পারে। রসুন সংগ্রহের পর, এর গলা কেটে ভালভাবে ৪/৫ দিন ছায়াযুক্ত স্থানে শুকাতে হয়। ফলে এর গলা সংকুচিত হয়ে যায় এবং কন্দ শুকিয়ে পাতলা ও শক্ত আবরণে পরিণত হয়। রসুনের এ পরিবর্তনকে "কিউরিং" বলা হয়। কিউরিং ভাল হলে রসুন দীর্ঘদিন সংরক্ষণ করা যায়।

## মরিচ

সব ধরনের দোআঁশ মাটিতেই মরিচ জন্মানো যায়। তবে মাটি অবশ্যই উর্বর এবং সেচ ও নিষ্কাশন সুবিধাযুক্ত হওয়া প্রয়োজন। মরিচ উষ্ণ ও শুষ্ক জলবায়ুর ফসল। চর অঞ্চলে সারা বছর এই ফসলটি আবাদ হয়ে থাকে এবং ইহা এসব এলাকার একটি প্রধান অর্থকরী ফসল হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

**জাত ও রোপণের সময় :** এলাকাভেদে মরিচের বিভিন্ন স্থানীয় জাত আছে। এদের মধ্যে বগুড়ার বোনা, বাইন,সাইটা, ইরি, বালিজুরী ইত্যাদি বোনা মরিচের জাত রয়েছে। রোপা মরিচের মধ্যে সূর্যমুখী পবা স্পেসাল, সিটিন, হালদা, জারলা, শিকারপুরী, চৌরা, উবধা, বালিজুরী পাটনাই ইত্যাদি মৌসুমী রোপা-মরিচের জাত আছে। এছাড়া উফশী জাতের বারি মরিচ-১ এবং বিভিন্ন হাইব্রীড জাতের মরিচ চাষাবাদ করা যায়। রবি মৌসুমে বোনা ও রোপা মরিচ চাষের জন্য সেপ্টেম্বর হতে অক্টোবর মাসের মধ্যে সরাসরি জমিতে বপন অথবা চারা তৈরীর জন্য বীজতলায় বীজ ফেলতে হয়। তবে বর্তমানে প্রায় সারা বছর মরিচের চাষ করা হয়ে থাকে।

**উৎপাদন পদ্ধতি**

বীজ বপনের পূর্বে ২৪ ঘন্টা সময় পানিতে ভিজিয়ে রাখলে গজানোর জন্য ভাল হয়। বীজতলা ৩ মিটার X ১ মিটার আকারের হবে। রোপা মরিচের ক্ষেত্রে ১.৫ হতে ২.৫ গ্রাম বীজের চারা উত্তোলন করে এক শতাংশ জমিতে রোপন করা চলে।

বোনা মরিচের জন্য ২ থেকে ৩ কেজি বীজ প্রতি হেক্টর জমিতে ছিটিয়ে বুনতে হবে। পরবর্তী সময়ে চারা পাতলা করে ১৫-২০ সে.মি. দুরত্বে গাছ রাখলেই চলবে। সচরাচর ৫/৬ টি চাষ ও মই দিয়ে জমি উত্তমভাবে চাষ করা হয়। মাটিতে যেন বেশী ঢেলা না থাকে সে দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। চারার বয়স ৩০-৩৫ দিন হলে তা রোপনের জন্য উত্তম হয়। সারি থেকে সারি এবং গাছ থেকে গাছের দুরত্ব ৪০ সে.মি. হতে হবে।

**সার প্রয়োগ ও পরিচর্যা**

সাধারণত: মধ্যম উর্বর জমির জন্য হেক্টরপ্রতি ৫ টন গোবর সার, ১৮০ কেজি ইউরিয়া, ২০০ কেজি টিএসপি এবং ১০০ কেজি এমপি প্রয়োগ করতে হবে। জমি চাষের সময় সম্পূর্ন পরিমান গোবর সার, টিএসপি এবং পটাশ সার প্রয়োগ করতে হবে। ইউরিয়া সারের শতকরা ৫০ ভাগ চারা রোপণের ৩০ দিন পর এবং বাকী শতকরা ৫০ ভাগ চারা রোপণের ৬০ দিন পর জমিতে প্রয়োগ করে মাটির সাথে মিশিয়ে, প্রয়োজনীয় হালকা পানি-সেচ দিতে হবে। জমির আগাছা পরিষ্কার করে মাটি ঝুরঝুর রাখা এবং মাটির অবস্থা ভেদে, শুষ্ক মৌসুমে ১০-১৫ দিন অন্তর পানি সেচ দিতে হবে। মরিচের ক্ষেতে কোন প্রকারেই জলাবদ্ধতা হতে দেয়া উচিত নয়।

**ফল সংগ্রহ ও ফলন**

মরিচের চারা রোপণের ৩০-৪৫ দিন পর গাছে ফুল ধরে এবং ৫০-৬০ দিন পর থেকে ধাপে ধাপে মরিচ সংগ্রহ করা যায়। কাঁচা অবস্থায় হেক্টরপ্রতি ফলন হয় ৬ থেকে ১০ টন। পাকা মরিচ শুকিয়ে হেক্টরপ্রতি ১.৫ থেকে ২.৫ টন পর্যন্ত ফলন পাওয়া যায়। সাধারণত: পাকা মরিচের ৪ ভাগের ১ ভাগ হয় শুকনা মরিচ। প্রতি কেজি শুকনা মরিচ হতে জাত-ভেদে ১৫০-২০০ গ্রাম এবং হেক্টরে ৮০-১০০ কেজি বীজ পাওয়া যায়।

## হলুদ

প্রায় সব রকম মাটিতেই হলুদ চাষ করা যায়। বেলে দোআঁশ, দোআঁশ ও পলি দোআঁশ মাটি হলুদ চাষের জন্য উত্তম। সাধারণত: উঁচু থেকে মাঝারী জমিতে যেখানে পানি দাঁড়ায় না এমন জায়গায় এর চাষ ভাল হয়। হলুদ গ্রীষ্ম মন্ডলের ফসল এবং এ এলাকার জলবায়ু হলুদ উৎপাদনের জন্য বেশ উপযোগী।

সাধারনত: মধ্য মার্চ থেকে এপ্রিল মাসের শেষ নাগাদ হলুদ বপনের উপযুক্ত সময়। দেশের নানা এলাকার স্থানীয় উপজাতসহ বাংলাদেশের সর্বত্র ব্যাপক চাষাবাদের অনুমোদিত দুটি হলুদের জাত রয়েছে। এ দুটি জাত হচ্ছে ডিমলা ও সিন্দুরী। এছাড়া বারি হলুদ-১, ২ ও ৩ গ্রীষ্ম মৌসুমে চাষের জন্য উপযোগী।

**জমি প্রস্তুতকরণ ও বপন**

হলুদের কন্দই বীজ। হলুদ বপনের জন্য প্রতি শতাংশে প্রায় ৯-১০ কেজি বীজ প্রয়োজন। প্রতি বীজকন্দের মধ্যে কমপক্ষে দুটি উন্নত চোখ থাকা প্রয়োজন। প্রতি বীজকন্দের ওজন প্রায় ৩০ গ্রাম হতে হবে। বীজ বপনের জন্য ৫০ সে.মি. দূরত্বে সারি করে সারিতে ২৫ সে.মি. ব্যবধানে বীজ বপন করতে হয়। ভালভাবে জমি তৈরী করার পর বপনের জন্য হাতে-টানা লাঙ্গল দিয়ে প্রায় ৫-৭ সে.মি. গভীর করে ৫০ সে.মি. দূরত্বে লাইন করতে হয়। এরপর লাইনে বীজগুলি ২৫ সে.মি. দূরে দূরে স্থাপন করা হয়। এরপর লাইনের মধ্যবর্তী জায়গা থেকে মাটি নিয়ে বীজ কন্দগুলিকে প্রায় ১০ সে.মি. উঁচু করে ঢেকে দিতে হয়। এর ফলে দুটি পাশাপাশি ঢিবি/মিড়ির মাঝখানে ৩০ সে: মি: প্রশস্ত যে নালা তৈরী হয় তা দিয়ে পানি সেচ এবং

বৃষ্টির অতিরিক্ত পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করা যায়। প্রতিটি ঢিবি/মিড়ি কত লম্বা হবে তা নির্ভর করবে জমি ও কাজের সুবিধার উপর। বীজ বপনের প্রায় এক মাস পর থেকে গাছ গজাতে শুরু করে। হলুদ ফসল উৎপাদনে বেশ দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন হয়। বপন থেকে ফসল তোলা পর্যন্ত প্রায় ৯-১০ মাস সময় লাগে।

**সার প্রয়োগ**

**সারণী: সারের পরিমাণ ও প্রয়োগ বিধি (প্রতি হেক্টরে)**

| সার | মোট পরিমাণ | জমি তৈরীর সময় দেয় | শেষ চাষের পরবর্তী পরিচর্যা হিসাবে দেয় | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | প্রথম কিস্তি | দ্বিতীয় কিস্তি | তৃতীয় কিস্তি |
| জৈব সার (টন) | ১০ | সবটাই | - | - | - |
| টিএসপি (কেজি) | ১৮০ | সবটাই | - | - | - |
| ইউরিয়া (কেজি) | ২২০ | - | ১১০ | ৫৫ | ৫৫ |
| এমপি (কেজি) | ২০০ | ১০০ | - | ৫০ | ৫০ |

জমি তৈরীর সময় সমুদয় জৈব সার এবং টিএসপি ও অর্ধেক এমপি সার প্রয়োগ করতে হবে। সার প্রয়োগের পূর্বে প্রথমে আগাছা পরিষ্কার করে তারপর মাঝখানে সার প্রয়োগ করতে হবে। বীজ বপনের ৫০-৬০ দিন পর অর্ধেক ইউরিয়া সার প্রয়োগ করতে হয়। আবার প্রথম কিস্তির সার প্রয়োগের ৫০-৬০ দিন পর দ্বিতীয় কিস্তিতে মোট ইউরিয়া ও পটাশ সারের এক চতুর্থ ভাগ প্রয়োগ করতে হয়। তৃতীয় কিস্তিতে মোট পরিমাণের এক চতুর্থাংশ ইউরিয়া ও এমপি সার দ্বিতীয় কিস্তি সার প্রয়োগের ৫০-৬০ দিন পর জমিতে প্রয়োগ করতে হবে। বপনের পর মোট তিন বারে এ ভাবে সম্পূর্ণ সার প্রয়োগ করা হয়। সার সারির মাঝখানে প্রয়োগ করে কোদাল দিয়ে কুপিয়ে আগাছা পরিষ্কার করে মাটি ঝুরঝুরা করে উক্ত সারসহ ঝুরঝুরা মাটি ১৫-২০ সে.মি. উঁচু করে মিড়ি বা ভেলি বা রিজ বেঁধে দিতে হয়।

**অন্তর্বর্তী পরিচর্যা**

বাংলাদেশের সর্বত্র চৈত্র ও বৈশাখে হলুদ বপন করা হয়। এ সময় সেচের প্রয়োজন হতে পারে। বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, প্রতিবার সেচের পর জমিতে "জো" আসার সাথে সাথে মাটির উপরের চটা ভেঙ্গে দেয়া উচিত। আগাছা দমন ও মিড়ি বা ভেলি বেঁধে দেয়া গাছের স্বাভাবিক বৃদ্ধির জন্য দরকার। হলুদের ক্ষেত্রে অতি বৃষ্টির সময় যাতে গাছের গোড়ায় পানি না জমে সে জন্য প্রয়োজন হলে দ্রুত নালা কেটে পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করতে হবে।

**ফসল সংগ্রহ ও ফলন**

এদেশে হলুদ সাধারণত: ৯-১০ মাসের ফসল। যখন হলুদ গাছের কান্ড পর্যন্ত শুকিয়ে যায় তখন হলুদ সংগ্রহ করতে হয়। হলুদ উঠানোর পর রাইজোমগুলি শিকড় ও মাটি পরিষ্কার করে দিতে হয়। ৫ মণ কাঁচা হলুদ থেকে ১ মণ (৫:১) শুকনা হলুদ পাওয়া যায়।

## ধনিয়া

ধনিয়া বা ধনিয়ার পাতা কাঁচা অবস্থায় সালাদ, আচার, ভর্তা, চাটনি, ইত্যাদি সহ নানা প্রকার খাদ্যসামগ্রীর সাথে যোগ করা হয়। আবার বিভিন্ন প্রকার ব্যঞ্জন, ডাল, ইত্যাদি রান্নাতেও পাতার প্রচুর ব্যবহার করে থাকে। ধনে বীজ একটি নিত্য-নৈমিত্তিক মশলারূপে নিয়মিতভাবে ব্যবহৃত হয়। ধনের পাতা পুষ্টি-সমৃদ্ধ সবজিসমূহের অন্যতম। ধনে একাকী অথবা অন্য শস্যের সাথে মিশ্র ফসল রূপে চাষ করা যায়।

**জাত**

স্থানীয় জাত ছাড়াও উফশী জাত হিসেবে বারি ধনিয়া-১ বিভিন্ন অঞ্চলে চাষ করা হয়ে থাকে।

**চাষের নিয়ম**

এই অতি ছোট আকারের গাছটি এদেশে কেবল শীতকালে তথা রবি মৌসুমে জন্মে। অক্টোবর থেকে জানুয়ারী পর্যন্ত বীজ বোনা যায়। এর চাষের জন্য মাটি পরিপাটি ও ঝুরঝুরে করে তৈরী করতে হয়। বীজ বোনার আগে ২৪ ঘন্টাকাল ভিজিয়ে রাখলে অঙ্কুরোদ্‌গম ত্বরান্বিত হয়। বীজ সারিতে বোনা উত্তম। সারিগুলো ২০ সে.মি. দূরত্বে স্থাপন করে সারিতে ঘন করে বীজ বোনা হয়। হেক্টর প্রতি প্রায় ২০ কেজি বীজ লাগে। বীজের সাথে কেরোসিন মিশিয়ে নিলে অথবা পাটির চারপাশে কেরোসিন ঢেলে দিয়ে পিঁপড়া দ্বারা বীজ টেনে নিয়ে যাওয়া প্রতিহত করা যায়।

বীজ ও পাতার জন্য চাষ করলে, ঘন করে বোনা ধনে ফসলের মধ্য থেকে, পাতার জন্য ধনে গাছ তুলে ফসল পাতলা করা যায়, অবশিষ্ট গাছগুলো বীজের জন্য রাখা যায়। ধনে ফসলের জন্য জমি তৈরী কালে হেক্টরপ্রতি ১০-১৫ টন গোবর সার, ১০০-১২০ কেজি ইউরিয়া, ৪০-৭০ কেজি টিএসপি ও ৪০-৭০ কেজি এমপি সার প্রয়োগ করা যেতে পারে। কেবলমাত্র পাতা উৎপাদনে গোবর সার ও ইউরিয়ার পরিমাণ অধিক, এবং কেবলমাত্র বীজের বেলায় টিএসপি ও এমপি সারের পরিমাণ অধিক হলে ভাল হয়।

**ফসল সংগ্রহ**

হেক্টর প্রতি ২-৩ টন পাতা ও ৫০০-৭৫০ কেজি বীজ সংগ্রহ করা যেতে পারে। এক মৌসুমে একই জমিতে দুই-তিন দফায় ধনে চাষ করা সম্ভব। তাতে ধনে বেশ অর্থকরী শস্যরূপে পরিগণিত হতে পারে। কেবল মাত্র পরিবারের প্রয়োজনেই বসতবাড়িতে ধনে চাষ একটি অবশ্য করণীয় বিষয় বললে চলে।

# অধ্যায়-৮
# তৈল ফসলের আবাদ

## সরিষা

বাংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চলে সরিষা আবাদ হলেও নোয়াখালীর চরাঞ্চলে এর আবাদ নেই বললেই চলে। অত্র এলাকায় নাবি জাতের আমন ধান চাষ ও লবণাক্ততা সমস্যার দরুন সফলভাবে সরিষা উৎপাদন সম্ভব হয় না। এমতাবস্থায় সঠিক জাত নির্বাচন ও উৎপাদন প্রযুক্তি ব্যবহার করে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনষ্টিটিউটের এর সরেজমিন গবেষণা বিভাগ অত্র এলাকায় সরিষা উৎপাদনে সফলতা অর্জন করেছে এবং এতে সরিষার জাত টরি-৭ এর হেক্টর প্রতি ১০০০ কেজি পর্যন্ত ফলন হয়েছে।

### জাত

জাত হিসেবে টরি-৭ এর পাশাপাশি লবণাক্ত সহিষ্ণু বিনা সরিষা-৫, ৬, ১১ ও ১৬ জাতগুলো চরাঞ্চলে চাষাবাদের জন্য খুবই উপযোগী।

### জমি প্রস্তুত

লবণাক্ত এলাকায় বিনা চাষে বা স্বল্প চাষে সরিষা আবাদ করাই উত্তম। এতে জমিতে রসের ঘাটতি থাকে না এবং বীজের অংকুরোদ্গম ভাল হয়। চারা গাছের বাষ্পীভবনের মাধ্যমে লবণ নীচ থেকে উপরে উঠতে পারে না এবং লবণাক্ততা গাছের কম ক্ষতি করে। বিনা চাষ প্রযুক্তিতে আমন ধান কাটার সাথে সাথে জমির 'জো' অবস্থায় দেশী লাঙ্গল দিয়ে ২টি অথবা ট্রাক্টর দিয়ে ১টি চাষ দিয়ে সার ও বীজ ছিটিয়ে মই দেয়া হয়। সরিষা চাষের জমি সমান হওয়া প্রয়োজন। হালকা মাটির জন্য ৩টি চাষ ও ৪টি মই এবং ভারী মাটির জন্য ৬-৭ টি চাষ ও ৪-৫ টি মই দিয়ে সরিষার জমি প্রস্তুত করতে হবে। বেশী চাষ দিয়ে মাটি পাউডারের মত করা ঠিক নয়।

### বীজ বপনকাল ও পদ্ধতি

নভেম্বর মাসের ৩য় সপ্তাহের মধ্যে বীজ বপনের উপযুক্ত সময়। রসালো মাটিতে বীজ অর্ধ সে.মি. গভীরে এবং অপেক্ষাকৃত কম রসালো মাটিতে একটু গভীরে বীজ বপন করতে হবে। সারি বা ছিটিয়ে বীজ বপন করা যেতে পারে।

### বীজ বপনের হার

ছিটিয়ে বপনের ৰেত্রে প্রতি শতাংশে ৩০ গ্রাম বীজ বপন করতে হবে। সারিতে বপনের ক্ষেত্রে অপেক্ষাকৃত কম বীজ লাগে। সারি থেকে সারির দূরত্ব হবে ২৫ সে.মি. এবং গাছ থেকে গাছের দূরত্ব হবে ৬-৮ সে.মি.। জমিতে সঠিক সংখ্যক গাছ রাখার জন্য প্রয়োজনে বীজ গজানোর ১২ দিন পরে গাছ পাতলা করে দিতে হবে।

### সার ব্যবস্থাপনা

অর্ধেক পরিমাণ ইউরিয়া সার এবং সম্পূর্ণ পরিমান অন্যান্য সকল সার শেষ চাষের আগে জমিতে ছিটিয়ে প্রয়োগ করতে হবে। অবশিষ্ট অর্ধেক ইউরিয়া সার ২৫-৩০ দিন বয়সের গাছে (ফুল ফোঁটার আগে) প্রয়োগ করতে হবে। মনে রাখতে হবে ফলের মধ্যে পুষ্ট বীজের জন্য বোরাক্স অত্যন্ত প্রয়োজন। বাজারে এটা সোহাগা নামে পরিচিত। বিভিন্ন সারের মাত্রা নিম্নে দেয়া হলো-

| সার (কেজি) | ইউরিয়া | টিএসপি | এমপি | জিংকসার | সোহাগা | গোবর |
|---|---|---|---|---|---|---|
| প্রতি হেক্টরে (২৪৭ শতাংশ) | ৩০০ | ১২৫ | ৫০ | ৮ | ১০-১২ | ১০০০-১২০০ |

### রোগবালাই দমন

সরিষা ক্ষেতে অলটারনারিয়া ব্লাইট রোগ বেশী দেখা যায়। এ রোগের আক্রমণ দেখা মাত্র রোভরাল-৫০ ডব্লিউপি প্রতি লিটার পানির সাথে ২গ্রাম মিশিয়ে ১০ দিন অন্তর ৩ বার স্প্রে মেশিনের সাহায্যে সম্পূর্ণ গাছে ছিটিয়ে দিতে হবে। এছাড়া

একই হারে ডাইথেন এম-৪৫ ব্যবহার করা যেতে পারে। সরিষা গাছে জাব পোকার আক্রমণ দেখা দিলে ম্যালাথিয়ন-৫০ ইসি বা মার্শাল-২০ ইসি অথবা জুলন-৩৫ ইসি প্রতি লিটার পানিতে ২ মিলি হিসাবে সম্পূর্ণ গাছে স্প্রে করতে হবে।

**পানি সেচ**

লবণাক্ত এলাকায় জমির শুষ্কতাভেদে ১-২ বার পানি সেচ দিয়ে অধিক ফলন পাওয়া যেতে পারে। সরিষা গাছ ফুলন্ত অবস্থা থেকে ফল পুষ্টকালীন সময় পর্যন্ত সর্বাধিক পানি গ্রহণ করে থাকে। এসময়ে জমিতে রস থাকতে হবে। ফল পুষ্ট হওয়ার পরে সরিষার ক্ষেতে পানি সেচ দিলে ফসলের জীবনকাল দীর্ঘায়িত হয়।

**ফসল কর্তন, মাড়াই এবং সংরক্ষণ**

ফসল কর্তনের উপযুক্ত সময়ের ব্যাপারে অধিক যত্নশীল হওয়া প্রয়োজন। গাছের রং হলুদ, ফল নাড়াচাড়া করলে শব্দ হয়, এ সময়কে ফসল কর্তনের উপযুক্ত সময় হিসাবে বিবেচনা করতে হবে। বিলম্বে কর্তন করলে ফল ফেটে বীজ ঝরে পড়তে পারে। কাটা ফসল ২-৩ দিন রৌদ্রে শুকিয়ে মাড়াই করে বীজ ভালভাবে পরিষ্কার করে ৪-৫ দিন টানা রৌদ্রে শুকাতে হবে। পলিথিন বা চটের ব্যাগে বীজ ভরে কম তাপমাত্রা ও ৬-৮% আর্দ্রতায় সংরক্ষণ করতে হবে।

**বীজ উৎপাদনের জন্য বিবেচ্য বিষয়**

**পৃথকীকরন দূরত্ব:** সরিষার জাত গুলো স্বপরাগায়িত। তবু এদের কিছু অংশ পর পরাগায়িত। এজন্য যাতে পরাগায়ন মিশ্রিত না হয় সে জন্য এক জাত হতে অন্য জাতের ২০০ মি: নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখতে হবে।

**ফসলের পরিচর্যা:** পরিচর্যার মধ্যে গাছ পাতলা করন করতে হবে যাতে বীজ নীচু মানের না হয়। প্রয়োজনীয় আগাছা দমন করতে হবে। জমিতে রসের অভাব হলে সেচ প্রয়োগ করা প্রয়োজন। সাধারনত: ২ বার সেচের প্রয়োজন হয়। সরিষার ক্ষেতে পাতার দাগ পড়া রোগ দেখা যেতে পারে। এরোগ দেখা দিলে ডাইথেম এম-৪৫ জাতীয় ঔষধ প্রয়োগ করে এরোগ দমন করা যায়। জাব পোকা সরিষার প্রধান ক্ষতিকারক পোকা। এ পোকার আক্রমন হলে জুলন-৩৫ ইসি অথবা প্রিমোর জাতীয় কীটনাশক ব্যবহার করতে হবে। **ঔষধ প্রয়োগের সময় খেয়াল রাখতে হবে যে মৌমাছিরা সকাল ৮ টা থেকে বিকাল ৪ টা পযন্ত রস/মধু সংগ্রহ করে এবং পরাগায়নে সাহায্য করে। সুতরাং ঔষধ ৪টার পর অথবা সকাল ৮ টার পূর্বে প্রয়োগ করতে হবে।**

**মাঠ পরিদর্শন ও রোগিং:** কমপক্ষে তিনবার সরিষা ক্ষেত পরিদর্শন করতে হবে। ফুল আসার পূর্বে, ফুল আসার পর ও ফল ধরার সময় থেকে ফল পাকা পযন্ত। ক্ষেতে অন্য জাত দেখা গেলে বিজাতটি হাত দিয়ে তুলে ফেলতে হবে।

## চিনা বাদাম

চিনা বাদাম উৎকৃষ্ট তৈল ফসল। খোসা ছড়ানো বাদামে ৪৮-৫০ ভাগ তেল থাকে, ২৪-২৫ ভাগ আমিষ থাকে। চিনা বাদামের গাছের শিকড় জমির উর্বরা শক্তি বৃদ্ধি করে। উপকূলীয় চরাঞ্চলে চিনা বাদাম ভাল জন্মে।

**জমি নির্বাচন**

হালকা বেলে দোআঁশ মাটি এই ফসলের জন্য খুবই ভাল। উন্নত বীজের জন্য খরিফ মৌসুমে জমির অতিরিক্ত পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা থাকলে চাষ করা যায় এবং রবি মৌসুমে উচুঁ জমিতে হালকা সেচের ব্যবস্থা থাকতে হবে।

**জমি তৈরী**

৩/৪ বার জমি চাষ ও ২টি মই দিয়ে মাটি ঝুর ঝুরে করে নিতে হবে।

**সার প্রয়োগ**

ইউরিয়া ৭০-৯০ কেজি, টিএসপি - ১৮০-১৯০ কেজি, এমপি - ৮০-১০০ কেজি, জিপসাম - ১১০-১২০ কেজি, জিঙ্ক অক্সাইড - ৫ কেজি প্রতি হেক্টরে।

ইউরিয়া অর্ধেক জমি শেষ চাষের সময় বাকী অর্ধেক গাছে ফুল আসার সময় দিতে হবে। অন্যান্য সার শেষ চাষের সময় দিতে হবে।

**জাত নির্বাচন**

স্থানীয় উন্নত জাত এবং ঐ এলাকার উপযোগী উফশী জাত নির্বাচন করতে হবে। বর্তমানে বারি চিনাবাদাম ৫, ৬, ৮ ও ৯ এবং বিনা চিনা বাদাম ৫ ও ৬ রবি মৌসুমে চাষ হয় এবং দুটি জাতই লবণাক্ততা সহ্য করতে পারে। বারি চিনাবাদাম ৮ ও ৯ এবং বিনা চিনা বাদাম ১ থেকে ৪ জাত গুলি শীত ও গ্রীষ্ম দুই মৌসুমেই চাষ করা যায় তবে বীজ উৎপাদনের জন্য খরিফ-১ মৌসুম উপযোগী।

**পৃথকীকরণ দূরত্ব**

চিনা বাদাম স্ব-পরাগায়িত হওয়ায় সাধারনত: একজাত হতে অন্য জাতের দূরত্ব ৩ মিটার হলেই চলে।

**বীজ শোধন**

প্রতি কেজি বীজ শোধনের জন্য ৫ গ্রাম ডাইথেন এম-৪৫ অথবা যে কোন বীজ শোধনকারী ঔষধ দিয়ে শোধন করে নিতে হবে।

**বীজ বপন পদ্ধতি**

বপনের আগে বাদামের খোসা হতে বীজ ছাড়িয়ে নিতে হয়। বীজ সারিতে বপন করা ভাল। সারি হতে সারির দূরত্ব ৩৫-৪০ সে:মি:। সারিতে বীজ হতে বীজের দূরত্ব ১৫ সে:মি:।

**বীজ ফসল পরিচর্যা**

বীজ লাগানোর ২ সপ্তাহের মধ্যে চিনা বাদাম বীজ গজায়। প্রয়োজনবোধে আগাছা পরিষ্কার রাখতে হবে। ১ম বার ৩-৪ সপ্তাহ পরে এবং ২য় বার ৬-৭ সপ্তাহ পরে নিড়ানি দিয়ে আগাছা তুলে দিয়ে মাটি আলাদা করে দিলে ফুল পরাগায়নের পর ফুলের অংশ বিশেষ মাটিতে ঢুকার পক্ষে সহজ হয়। ফুল আসার পূর্বে কোদালের সাহায্যে মাটি নরম করতে হয়। ফুল আসার পরে সে কাজ করা উচিত নয়, কারণ এতে মাটির ভিতরের বাদামের ক্ষতি হয়।

**সেচ ও পানি নিষ্কাশন**

গ্রীষ্ম মৌসুমে প্রচুর বৃষ্টি হয় তাই এ মৌসুমে সেচের দরকার হয় না। বরঞ্চ ক্ষেতের অতিরিক্ত পানি সরানোর ব্যবস্থা নিতে হয়। রবি মৌসুমে উচুঁ জমিতে সেচের দরকার হয়। প্রয়োজন অনুযায়ী হালকা সেচ দিতে হয়।

**রোগ দমন**

চিনা বাদামের বিভিন্ন রোগ দেখা যায়। যেমন টিক্কা রোগ ও মরিচা রোগ। এ রোগ দেখা দিলে ছত্রাক নাশক ঔষধ প্রয়োগ করে রোগ দমন করা যায়। এছাড়া গোড়া পঁচা রোগ এবং মোজাইক রোগ দ্বারা আক্রান্ত গাছ দেখা মাত্র তুলে ফেলতে হবে।

**রোগিং**

চিনা বাদামের ক্ষেতে যে জাতের চাষ করা হয়েছে সে জাত ছাড়া ভিন্ন জাতের পাতা বা গাছ দেখা গেলে অবশ্যই তুলে ফেলতে হবে। ফুল আসার পূর্বে এবং ফল ধরার পর রোগিং করার উপযুক্ত সময়।

**ফসল কর্তন, বীজ শুকানো ও গুদামজাতকরণ**

বাদাম যখন শতকরা ৭০-৭৫ ভাগ চাপ দিলে খোসা ভেঙ্গে যায়, খোসার ভিতর দিকে কালো দেখা যায় এবং দানার উপর পাতলা আবরন লাল বা গোলাপী রং দেখা যায় তখন বাদাম তোলার উপযুক্ত সময়। বাদাম তুলে ধুয়ে পরিষ্কার করে আস্তে আস্তে অর্থাৎ ১ম দিন ২ ঘন্টা, ২য় দিন ৩ ঘন্টা এমন ভাবে শুকায়ে আর্দ্রতা ৭-৮% করে রেখে দিতে হবে। পলিথিন ব্যাগে ঠান্ডা ও শুকনো জায়গায় সংরক্ষণ করতে হবে। খেয়াল রাখতে হবে বীজের আর্দ্রতা যেন বেড়ে না যায়।

## সয়াবীন

সয়াবীন সারা বিশ্বে বর্তমানে আমিষ ও ভোজ্যতেল উৎপাদনের প্রধান শস্য। এতে শতকরা ৪২-৪৫ ভাগ উৎকৃষ্ট মানের আমিষ এবং ২০-২২ ভাগ উন্নত মানের তৈল আছে। সয়াবীন বায়ুমন্ডল থেকে যথেষ্ট পরিমানে নাইট্রোজেন সংগ্রহ করতে পারে ফলে পরবর্তী ফসলে কোন ইউরিয়া সার প্রয়োজন হয় না। এভাবে মাটির উর্বরতা বৃদ্ধি করে।

বৃহত্তর নোয়াখালী অঞ্চল সয়াবীন চাষাবাদের জন্য ইতিমধ্যে উপযুক্ত বলে প্রমানিত হয়েছে। সয়াবীন চাষে ঝুকি কম এবং লাভ বেশী। সয়াবীন কর্তনের পর আউশ ধানের ফলন খুবই ভাল হয় কারণ সয়াবীন প্রত্যেক আবাদ মৌসুমে মাটিতে হেক্টর প্রতি ২৫০-২৭০ কেজি নাইট্রোজেন সংযোজন করতে পারে অর্থাৎ প্রায় ৮০-৮৫ ভাগ ইউরিয়া সারের চাহিদা মেটায়। সয়াবীন খরা ও লবণাক্ততা সহিষ্ণু ফসল। তাই উপকূলীয় অঞ্চলের আমন ধান কাটার পর খরা ও লবণাক্ততার জন্য যে সব জমি অনাবাদী থাকে সে সব জমিতে অনায়াসে সয়াবীন চাষ করা যেতে পারে। সম্প্রতি বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন কর্তৃক এসকল এলাকায় চুক্তিবদ্ধ কৃষকদের মাধ্যমে বীজ উৎপাদন করার ফলে সাধারণ বাজার হতে অধিক মূল্যে বীজ ক্রয় নিশ্চিত করা হচ্ছে।

বর্তমানে প্রায় ১৬-১৭ লক্ষ টন সয়াবীনের চাহিদা থাকলেও মাত্র ১ লক্ষ টন উৎপাদিত হয়। সয়াবীন বৃহত্তর নোয়াখালী জেলার চরাঞ্চলে যেমন-সুবর্ণচর, হাতিয়া, রামগতি, রায়পুর, চাঁদপুর জেলার হাইমচর, ফরিদগঞ্জ ইত্যাদি এলাকায় নিবিড় ভাবে প্রায় ৫০,০০০ হেক্টর জমিতে সয়াবীন চাষ হচ্ছে। সয়াবীন চাষের কিছু উৎপাদন কৌশল নিম্নে দেয়া হলো-
নিম্নে বর্নিত কিছু উৎপাদন কৌশল অবলম্বন করলে উৎপাদন খরচ কমিয়ে ফলন বৃদ্ধি করা সম্ভব

- **ভাল বীজ ব্যবহার করা:** অধিক ফলন পেতে হলে উন্নত জাতের মান সম্পন্ন বীজ ব্যবহার করতে হবে, কারণ অল্প সময়ে সয়াবীন বীজের অঙ্কুরোদগম ক্ষমতা নষ্ট হতে পারে।
- **ইনক্লাইন প্লেন্টার ব্যবহার করা:** এই প্লেন্টার এর মাধ্যমে বীজ বপন করা হলে বীজের পরিমান কম লাগে এবং শ্রমিক খরচ শতকরা ৮৫ ভাগ কমায়। প্রতি ঘন্টায় ৪০-৬০ শতাংশ জমিতে বীজ লাগানো যায়। এছাড়া শতকরা ২৫-২৭ ভাগ উৎপাদন বৃদ্ধি পায়।
- **শুকনো জমিতে নিড়ানি যন্ত্র ব্যবহার করা:** সয়াবীনের শুকনো জমিতে ড্রাই উইডার (Dry weeder) ব্যবহার করলে শ্রমিক এবং সময় খরচ অনেক কমে যায়। প্রতি ঘন্টায় একজন শ্রমিক ৫ শতাংশ জমির আগাছা পরিষ্কার করতে পারে এবং শতকরা ৩০-৩৮ ভাগ ফলন বৃদ্ধি পায়।
- **সঠিক মাত্রায় সার প্রয়োগ:** সঠিক মাত্রায় সার প্রয়োগ করা হলে সয়াবীনের ফলন অনেক বৃদ্ধি করা যায়। যেহেতু এটি সালফার (জিপসাম) প্রিয় ফসল, তাই হেক্টর প্রতি ৮০-১১৫ কেজি জিপসাম সার প্রয়োগ করা প্রয়োজন।
- **জীবানু সার ব্যবহার করা:** সয়াবীন চাষে জীবানু সার ব্যবহার করলে ইউরিয়া সার লাগে না। ব্রেডিরাইজোবিয়াম বা ইনোকুলাম নামক জীবানু সার ব্যবহারে সয়াবীনের উৎপাদন বৃদ্ধি পায়।

### জমি তৈরী

দোআঁশ ও বেলে দোআঁশ মাটিতে সয়াবীন খুব ভাল জন্মে। জমির প্রকারভেদে ৫-৬ টি চাষ ও মই দিয়ে গভীর চাষ করে মাটি ঝুরঝুরে করে নিতে হয়।

### সার প্রয়োগ

ইনোকুলাম মিশিয়ে বীজ বপন করলে জমিতে ইউরিয়া সার দেয়ার প্রয়োজন নেই, সেক্ষেত্রে হেক্টর প্রতি ১২০ কেজি টিএসপি এবং ৬৫ কেজি এমপি সার শেষ চাষের সময় দিতে হয়। ইনোকুলাম না মিশালে হেক্টর প্রতি ৫০ কেজি ইউরিয়া সারও প্রয়োগ করতে হয়।

### জাত নির্বাচন

এ পর্যন্ত ৫ টি উচ্চ ফলনশীল সয়াবীন জাত অবমুক্ত করা হয়েছে। এগুলো হলো- ব্রাগ, ডেডিস, পিবি-১ (সোহাগ), জি-২ এবং বারি সয়াবীন ৬। এসকল জাতের ফলন হেক্টর ১৬০০-২০০০ কেজি পাওয়া যায়।

### বীজ বপনের সময় ইনোকুলাম মিশানো

সয়াবীনে নডিয়ুল গঠনের জন্য বীজ বপনের সময় বীজে প্রতি কেজিতে ২০ গ্রাম ইনোকুলাম মিশিয়ে বীজ বপন করা ভাল। হাতে একটু পানি নিয়ে বীজ ভিজিয়ে অথবা চিটাগুড় বীজে মিশিয়ে তারপর ইনোকুলাম ভালভাবে মিশাতে হবে। ইনোকুলাম মিশানো বীজ সাথে সাথে বপন করতে হবে। ইনোকুলামসহ বীজ বপন করলে বিকালে বীজ বপন করাই উত্তম।

**বীজ বপন পদ্ধতি**

সারিতে বীজ বপন করাই ভাল। সারি হতে সারির দূরত্ব ৩০ সে.মি. এবং বীজের দূরত্ব ৫-৬ সে. মি.।

**বীজের পরিমাণ**

রবি মৌসুমে ৫০-৬৫ কেজি এবং খরিফ মৌসুমে ৭৫-৮০ কেজি বীজের প্রয়োজন হবে প্রতি হেক্টরে।

**বীজ বপনের সময়**

১লা পৌষ হতে ৩০ শে পৌষ। তবে ১৫ই মাঘ পর্যন্ত বপন করা যায়। খরিফ-১ মৌসুম চৈত্র-বৈশাখ। খরিফ-২ মৌসুম আষাঢ়-শ্রাবণ।

**ফসলের পরিচর্যা**

বীজ বপনের ২০-২৫ দিন পর একবার নিড়ানী দিতে হয়। সম্ভব হলে ৪০-৪৫ দিন পর আর একবার নিড়ানী দিলে ভাল হয়।

**সেচ প্রয়োগ**

চরাঞ্চলে সেচের পানির অভাব থাকে তাই সম্ভব হলে ২/৩ বার সেচ দিতে পারলে বীজ পুষ্ট হয় এবং ফলনও ভাল হয়।

**পোকামাকড় দমন**

সাধারনত: বিছা পোকার আক্রমন লক্ষ্য করা যায়। ডিম যুক্ত বা ক্রীড়াযুক্ত আক্রান্ত পাতাগুলো উঠিয়ে পুড়ে ফেলতে হবে বা মেরে ফেলতে হবে। এছাড়া ডাইমেক্রন ১০০ ইসি অথবা নগস ১০০ ইসি কীটনাশক প্রয়োগ করতে হবে।

**রোগবালাই দমন**

ভাইরাস জনিত হলুদ পাতা রোগ (ইউলোমোজাইক ভাইরাস) দেখা যায়। এরোগ দেখা দিলে রোগাক্রান্ত গাছগুলো পুড়ে ফেলতে হবে।

**মাঠ পরিদর্শন ও রোগিং**

মাঠ পরিদর্শন করে নির্ধারিত মাঠ মান ও বীজ মান সম্পর্কে নিশ্চিত হতে হবে এবং বিজাত গুলো তুলে ফেলতে হবে। এছাড়া ভাইরাস আক্রান্ত গাছ তুলে মাটিতে পুতে ফেলতে হবে।

**বীজ সংরক্ষণ**

সয়াবীনের বীজ সংরক্ষণ অত্যন্ত সতর্কতার সাথে করতে হবে কারণ বীজে তৈলের পরিমান বেশী থাকায় সঠিক ভাবে সংরক্ষণ করা না হলে অঙ্কুরোদগম ক্ষমতা নষ্ট হয়ে যায়। বীজ মাড়াই করার সাথে সাথে বীজ রোদে শুকাতে হবে, তবে এক নাগাড়ে ৩-৪ ঘন্টার বেশী নয়। তাই ২-৩ ঘন্টা করে প্রথম পর্যায়ে কয়েকদিন শুকাতে হবে। এজন্য ত্রিপল অথবা চাটাইয়ের উপর বীজ শুকানো উত্তম। বীজের আর্দ্রতা ৮-১০% মধ্যে রাখতে হবে। বীজ রাখার জন্য পলিথিন ব্যাগ, টিনের ড্রাম, আলকাতরা মাখা মাটির মটকা বা কলসি, বিস্কুটের টিন ইত্যাদি ব্যবহার করা যেতে পারে। ভাল ভাবে মুখ আটকাতে হবে যা বাতাস ঢুকতে বা বের হতে না পারে। বীজ ঠান্ডা করে শীতল জায়গায় রাখতে হবে এবং সরাসরি মেঝেতে না রেখে মাচা বা তক্তার উপর রাখতে হবে।

**জাত ও জাতের বৈশিষ্ট্য**

| | | | |
|---|---|---|---|
| ১। | জাত | নীলা, স্থানীয় উন্নত | |
| ২। | গাছের উচ্চতা | ৪৫ সে.মি. | |
| ৩। | জীবনকাল | ১২০ দিন | |
| ৪। | ফলন | ক) সম্ভাব্য | ২.৬ কেজি প্রতি শতাংশে |
| | | খ) চর এলাকার গড় | ১.০ কেজি প্রতি শতাংশে |

**উৎপাদন প্রযুক্তি**

| | | |
|---|---|---|
| ১। | রোপন পদ্ধতি | বীজ সরাসরি ছিটিয়ে বা সারিতে বপন। |
| ২। | বীজ বোনার সময় | মধ্য কার্তিক - মধ্য অগ্রহায়ণ (নভেম্বর) |
| ৩। | বীজের হার | ছিটিয়ে বুনলে ৮০ গ্রাম প্রতি শতাংশে, সারিতে বুনলে ৬০ গ্রাম প্রতি শতাংশে। |
| ৪। | রোপনের দূরত্ব | সারি থেকে সারি ৩০ সে.মি. |
| ৫। | সার প্রয়োগ | |
| | ক) শেষ জমি তৈরীর সময় | প্রতি শতাংশে গোবর/কম্পোষ্ট ২০ কেজি, টিএসপি ৩০০ গ্রাম, এমপি ৮০ গ্রাম |
| | খ) ইউরিয়া | উপরি প্রয়োগ বপনের ৩০ দিন পর ৩০ গ্রাম প্রতি শতাংশে |
| ৬। | ফসল সংগ্রহ: | ক্যাপসুল পুরোপুরি শুকিয়ে গেলে। |

# অধ্যায়-৯
# ডাল ফসলের আবাদ

## ফেলন

**জাত ও জাতের বৈশিষ্ট্য**

| | | |
|---|---|---|
| ১। | জাত | বারি ফেলন-১ |
| ২। | গাছের | উচ্চতা ৬০ সে.মি. |
| ৩। | জীবনকাল | ১৪০ দিন |
| ৪। | ফলন | ক) সম্ভাব্য ৫ কেজি প্রতি শতাংশে |
| ৫। | ব্যবহার | দানা - ডাল হিসেবে, ফল - সবজী হিসেবে, গাছ সবুজ সার হিসেবে |

**উৎপাদন প্রযুক্তি**

| | | |
|---|---|---|
| ১। | রোপন পদ্ধতি | ছিটিয়ে বোনা তবে সারিতে বপন করা ভাল |
| ২। | বীজতলায় বীজ বপনের সময় | অগ্রহায়ণ-মাঘ (মধ্য ডিসেম্বর থেকে মধ্য ফেব্রুয়ারী) |
| ৩। | বীজের হার | ছিটিয়ে বুনলে ১৮৫ গ্রাম প্রতি শতাংশে, সারিতে বুনলে ১২৫ গ্রাম প্রতি শতাংশে |
| ৪। | সারি থেকে সারির দূরত্ব | ২৫ সে.মি. |
| ৫। | সার প্রয়োগ | |
| | ক) বপনের আগে (শতাংশে) | গোবর বা কম্পোষ্ট ১০ কেজি, টিএসপি ১৬০ গ্রাম, এমপি ৮০ গ্রাম |
| | খ) ইউরিয়া | উপরি প্রায়াগ ৮০ গ্রাম প্রতি শতাংশে, চারা গজানোর ৩০ দিন পর |
| ৬। | ফসল সংগ্রহ | সবজির জন্য ৬০ দিন পর; দানার জন্য ফল শুকিয়ে গেলে। |

## মুগ ডাল

**জাত ও জাতের বৈশিষ্ট্য**

| | | |
|---|---|---|
| ১। | জাত | বারি মুগ-৫ |
| ৩। | জীবনকাল | ১২০ দিন |
| ৪। | ফলন | ৪ কেজি প্রতি শতাংশে |

**উৎপাদন প্রযুক্তি**

| | | |
|---|---|---|
| ১। | রোপন পদ্ধতি | ছিটিয়ে বোনা তবে সারিতে বপন করা ভাল |
| ২। | বীজ বোনার সময় | মাঘের শেষ (ফেব্রুয়ারীর প্রথমার্ধে) |
| ৩। | বীজের হার | ছিটিয়ে বুনলে ১২৫ গ্রাম প্রতি শতাংশে |
| ৪। | সারি থেকে সারির দূরত্ব | ২৫ সে.মি. |
| ৫। | সার প্রয়োগ(শতাংশে) | ক) বপনের আগে-গোবর বা কম্পোষ্ট২০ কেজি, টিএসপি ১৬০ গ্রাম, এমপি ৮০ গ্রাম<br>খ) ইউরিয়া উপরি প্রায়াগ ৮০ গ্রাম চারা গজানোর ৩০ দিন পর |
| ৬। | আগাছা ও রোগ পোকা দমন | |
| | ক) আগাছা | প্রথম ৩০ দিন পর্যন্ত আগাছা মুক্ত রাখতে হবে। |
| | খ) পোকা | রিপকর্ড, ম্যালাথিয়ন, সুমিথিয়ন ১ মিলি প্রতি লিটার পানিতে মিশাতে হবে। |
| ৭। | ফসল সংগ্রহ | ফল সবগুলো এক সাথে পাকে না তাই বীজ বপনের ৯০ দিন পর থেকে কয়েক দিন পর থেকে কয়েক ধাপে পাকা ফল সংগ্রহ করা দরকার। |

# খেসারী

**জাত ও জাতের বৈশিষ্ট্য**

| | | |
|---|---|---|
| ১। জাত | স্থানীয় জাত, বারি খেসারী-১ | |
| ২। গাছের উচ্চতা | ৪৫ সে.মি. | |
| ৩। জীবনকাল | ১০০ দিন | |
| ৪। ফলন | ক) সম্ভাব্য | ৪ কেজি প্রতি শতাংশে |
| | খ) চর এলাকার গড় | ২ কেজি প্রতি শতাংশে |
| ৫। ব্যবহার | দানা - ডাল হিসেবে | |
| | গাছ - গো-খাদ্য এবং সবুজসার হিসেবে। | |

**উৎপাদন প্রযুক্তি**

| | |
|---|---|
| ১। রোপন পদ্ধতি | ধান পাকার সময় আন্ত:ফসল হিসেবে ছিটিয়ে বোনা |
| ২। বীজ বোনার সময় | কার্তিক মাস (মধ্য অক্টোরব), নাবী ফসলের বেলায় অগ্রহায়ন পর্যন্ত |
| ৩। বীজের হার | ২০০ গ্রাম প্রতি শতাংশে |
| ৪। সার প্রয়োগ | |

ক) আন্ত: ফসলে কোন সার দেয়া হয় না। একক ফসলে নিম্নরূপ সার দেয়া যায়।
টিএসপি- ৩২৫ গ্রাম প্রতি শতাংশে, এমপি- ৮০ গ্রাম প্রতি শতাংশে

খ) ইউরিয়া উপরি প্রয়োগ ৮০ গ্রাম প্রতি শতাংশে, ধান কাটার ২০ দিন পর

৫। আগাছা ও রোগ পোকা দমন

| | |
|---|---|
| ক) আগাছা | প্রথম ২০ দিন পর্যন্ত আগাছা মুক্ত রাখতে হবে। |
| খ) পোকা | সাধারণত প্রয়োজন হয় না |
| গ) রোগ দমন | সাধারণত প্রয়োজন হয় না |
| ৬। ফসল সংগ্রহ | সীম সম্পূর্ণ পেকে গেলে মাটির উপরের অংশ কেটে আনা দরকার। |

# অধ্যায়-১০
# বসতবাড়ির আঙ্গিনায় চাষাবাদ

**বসত বাড়ির আঙ্গিনায় সবজি চাষ ও আট কপালিয়া মডেল'**

নোয়াখালী জেলার চর জব্বর এবং চর জুবলী চরাঞ্চল হিসেবে পরিচিত। এই এলাকায় রবি মৌসুমে লবণাক্ততার পরিমাণ ২-৮ ডিএস/মি। এই এলাকায় চাষীরা বছরব্যাপী সবজি উৎপাদন করতনা বললেই চলে। বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, নোয়াখালী কর্তৃক উদ্ভাবিত 'রূপান্তরিত কালিকাপুর মডেল' ব্যবহার করে ব্যাপক সাফল্য অর্জিত হয়। যার নামকরণ করা হয় 'আট কপালিয়া মডেল'। এই মডেলটি ব্যবহার করে চরাঞ্চলে বছরব্যাপী সবজি চাষ করা সম্ভব এবং আয় বৃদ্ধি সহায়ক।

**সবজি বিন্যাস: সবজি বাগানের ৫টি বেড নিম্নের সবজি বিন্যাস অনুসারে বিন্যস্ত করা হয়।**

| স্থান | ফসল বিন্যাস | | |
|---|---|---|---|
| ১. উন্মুক্ত জমি: | রবি | খরিপ-১ | খরিপ-২ |
| ১ম বেড | লালশাক/মুলা, টমেটো | ডাঁটা | পুঁইশাক |
| ২য় বেড | বাটিশাক/টমেটো | ঢেঁড়স | ডাঁটা |
| ৩য় বেড | ফুলকপি | গিমা কলমিশাক | গিমা কলমিশাক |
| ৪র্থ বেড | লালশাক+বেগুন | ঢেঁড়স | লালশাক |
| ৫ম বেড | বাঁধাকপি/পালংশাক মুলা/বাটিশাক | পুঁইশাক | ডাঁটা |

২. মাচায় ও পুকুর পাড়ে: সীম, লাউ, ঝিঙ্গা, শশা, করলা
৩. ঘরের চালে (লতানো সবজি): সীম, কুমড়া, লাউ।

## লাউ

লাউ একটি উপাদেয় সবজি। এটি প্রধানত: শীতকালীন ফসল। তবে সারা বছর লাউয়ের আবাদ করা যায়। শীতকালীন লাউ কার্তিক থেকে পৌষ মাস সময়ের মধ্যে এবং গ্রীষ্মকালীন লাউ ফাল্গুন থেকে বৈশাখ পর্যন্ত বপন করা যায়।

**জাত ঃ** বারি লাউ-১, বারি লাউ-২ ও বারি লাউ-৩ ও হাইব্রিডের বিভিন্ন জাত।

**চাষের নিয়ম**

সাধারণত: ২.৫-৩.৫ মিটার দূরত্বের সারিতে ২.০-২.৫ মিটার দূরত্বে গর্ত বা মাদা করে প্রতি মাদায় দুই-তিনটি করে বীজ বোনা হয়। মাদার জন্য ৬০-৯০ সে.মি. ব্যাস ও ৫০-৮০ সে.মি. গভীরতা বিশিষ্ট গর্ত করা যেতে পারে। শতাংশে ২০.০-২৫.০ গ্রাম বীজ লাগাতে পারে। মাঝারী উর্বর মাটির জন্য প্রতি শতাংশে ৫০০ গ্রাম ইউরিয়া, ৬৫০ গ্রাম টিএসপি, ৫০০ গ্রাম এমপি, ৩০০ গ্রাম জিপসাম ও ১৬ গ্রাম জিংক অক্সাইড প্রয়োগ করা যেতে পারে। তাছাড়া জৈবসার রূপে ২০ কেজি গোবর সার ও ২ কেজি খৈল ব্যবহার করা যেতে পারে। ইউরিয়া ছাড়া অন্যান্য সার চারা রোপন বা বীজ বোনার ১০-১২ দিন আগে মাদার মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হবে যাতে পঁচে যায়। ইউরিয়া সারের অর্ধেক রোপণের ৩০ দিন পরে এবং বাকী অর্ধেক ৪৫ দিন পরে গাছের গোড়ার মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হবে।

লাউ এর লতা মাচায় অথবা চালায় তুলে দেওয়া হয়। পুকুরের পাড়ে মাদা তৈরী করে পুকুরের উপরে মাচা বেঁধে লতাগুলোকে বাইতে দিলে ভাল ফলন হতে পারে। পুকুরের তলার পাঁকমাটি মাদার মাটিতে দিয়ে সাররূপে কাজে লাগানো যায়। গাছ অতি মাত্রায় বৃদ্ধিশীল হলে তার কিছু কিছু লতাপাতা কেটে ব্যবহার করে পুষ্টিকর শাক পাওয়া ও অধিক পরিমাণ লাউ ফলানো দুটো কাজই হতে পারে। লাউ এর পোকামাকড় ও রোগ অনেকটা মিষ্টি কুমড়ার মত।

**ফল সংগ্রহ**

ঠিকমতো যত্ন দিয়ে চাষ করলে, হেক্টরপ্রতি ১৫-৩০ টন বা তারও বেশী লাউ ফলতে পারে। তা ছাড়া বাড়তি ফলন রূপে পাওয়া যায় লতা ও পাতা। এগুলো বেশ জনপ্রিয় শাক-সবজি।

## দেশী সীম

সীম সব ধরনের মাটিতে চাষ করা যায়। দোআঁশ ও বেলে-দোআঁশ মাটিতে ইহা সবচেয়ে ভাল জন্মে। সীমগাছ দাঁড়ানো-পানি সহ্য করতে পারে না। সুনিষ্কাশিত ও ছায়ামুক্ত জমি উত্তম। পর্যাপ্ত ফুল ও ফল ধরার জন্য জমিতে যথেষ্ট রস থাকা বাঞ্চনীয়। ইহা শীত মৌসুমে ভাল জন্মে। চর অঞ্চলে বসতবাড়ি, পতিত জমিতে এবং রাস্তার পাশে উঁচু জমিতে প্রচুর পরিমানে দেশী সীম উৎপাদিত হয়। এতদঞ্চলে উৎপাদিত সীম এবং সীমের বীচি দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বাজারজাত করা হয়। এমনকি সীমের বীচি বিদেশে ও রপ্তানি করা হয়।

**সীমের জাত**

স্থানীয় উন্নত জাত, সীতাকুন্ড ও চাটঁগায়ী ইত্যাদি স্থানীয় জাত সমূহ চর অঞ্চলে আবাদ হয়ে থাকে। এছাড়াও উফশী জাতের মধ্যে বারি সীম-৪, ৫, ৬ এবং ইপসা সীম-১ ও ইপসা সীম-২ এতদঞ্চলে চাষাবাদ করা যেতে পারে।

**চাষের নিয়ম**

দেশী সীম প্রধানত: মাদা-প্রথায় বসতবাড়ীর আশেপাশে, পুকুর পাড়ে, পথের ধারে ও জমির আইলে চাষ করা হয়। মাদা ৪৫ সে.মি. x৪৫ সে.মি. আকারের হলেই চলে এবং গর্তে মাটিতে আবর্জনা মিশিয়ে পচিয়ে তাতে বীজ বপন করতে হয়। অধিক এলাকা জুড়ে ব্যবসায়িক ভিত্তিতে আবাদের জন্য প্রথমে জমি চাষ ও মই দিয়ে সেচ ও নিষ্কাশনের সুবিধার্থে পুরো জমি কয়েকটি খন্ডে বিভক্ত করে নিতে হয়। পরে তিন মিটার দূরত্বে সারি করে সারিতে দেড় মিটার পর পর মাদা অথবা দেড় মিটার চওড়া বেডের উপরে এক মিটার ব্যবধানে জোড়া সারিতে ৩০ সে.মি. পর পর ঘুবরী তৈরী করতে হয়। মাদা অথবা ঘুবরীতে সার প্রয়োগ করে ভালভাবে মাটির সাথে মিশিয়ে ২/৩ দিনের মত রেখে দিতে হয়। ২/৩ দিন পর প্রতি মাদায় ৫/৬টি বা প্রতি ঘুবরীতে ২/৩টি বীজ ফাঁক ফাঁক করে বুনতে হয় এবং চারা গজানোর ১০/১৫ দিন পর মাদায় দুটি ও ঘুবরীতে একটি সুস্থ গাছ রেখে বাকীগুলো উঠিয়ে ফেলতে হয়। বিশেষ প্রয়োজনে পলিথিন ব্যাগেও চারা রোপণ করা চলে।

অন্তবর্তী পরিচর্যা হিসাবে আগাছা ও পোকা-মাকড় দমন, পানি নিষ্কাশন ও বাউনির ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। বাঁশের মাচা, ঘরের চালা, গাছের ডালপালা সচরাচর বাউনির কাজে ব্যবহার করা হয়। ঘুবরী প্রথায় আবাদের ক্ষেত্রে চটা ও কঞ্চির সাহায্যে ইংরেজী 'A' আকারে কাঠামো তৈরী করে জমিতে বাউনি দেওয়া সুবিধাজনক। বাউনির অভাবে গাছে শাখা-প্রশাখার বৃদ্ধি ব্যাহত হয় ও ফলন কমে যায়। তাছাড়া শুষ্ক মৌসুমে জমিতে সেচের ব্যবস্থা করা হলে ফলন বৃদ্ধি পায়। সীতাকুণ্ড এলাকায় একটি বা দুইটি বাঁশের কঞ্চি বাউনি হিসাবে ব্যবহার করা হয়।

**ফল সংগ্রহ**

ধাপে ধাপে সংগ্রহপূর্বক বিপনন করতে হয়। আগাম ফসল পাওয়া জাতের বৈশিষ্ট্যের উপর নির্ভরশীল। জাতভেদে কার্তিক থেকে চৈত্র মাস পর্যন্ত সীম সংগ্রহ চলে। হেক্টরে ৭-১০ টন সীম পাওয়া যায়।

## বাটিশাক

পাতাজাতীয় সবজির মধ্যে বাটিশাক একটি উল্লেখযোগ্য সবজি। গ্রীষ্মকালে যে সময়ে বাংলাদেশে পাতাজাতীয় পুষ্টিকর সবজির প্রকট অভাব দেখা দেয়, যে সময় পাতাজাতীয় এ সবজিটি দেশের শাকসবজির চাহিদা মেটাতে এক বিশেষ ভূমিকা পালন করে। সবচেয়ে মজার ব্যপার হল, এ সবজি শীতকালে আমাদের দেশের আবহাওয়ায় প্রচুর পরিমাণে বীজ উৎপাদন করে। যার ফলে অন্যান্য সরিষা জাতীয় সবজির মত এর জন্যও বিদেশ থেকে বীজ আমদানী করতে হয় না। আমাদের দেশে প্রধানত: বারি বাটিশাক-১ যা ডচনা শাক নামে পরিচিত। জাতটি সারা দেশে আবাদ হয়ে থাকে। তবে এই সবজিটি উপকূলীয় চর অঞ্চলের অত্যধিক লবণাক্ত (১৬ ডিএস/মি:) মাটিতেও উৎপাদিত হয়।

**জমি প্রস্তুতকরণ**

বাটিশাক মূলত: গ্রীষ্মকালে জন্মে। অবশ্য শীতকালেও এর চাষ করা যায়। বীজ উৎপাদনের জন্য শীতকালেই এর চাষ করতে হয়। সব ধরণের মাটিতেই বাটিশাক চাষ করা যায়। তবে বেলে ও বেলে-দোঁআশ মাটিতেই ভালো জন্মে। ৩-৪ বার উত্তমরূপে জমি চাষ করে তিন ফুট প্রশস্ত ভিটি তৈরী করতে পারলে ভালো হয়। সেচ দেয়া ও অতিরিক্ত পানি বের করে দেয়ার জন্য প্রয়োজনীয় পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা রাখতে হবে। বাটিশাকের জন্য শতাংশ প্রতি ২০ কেজি গোবর সার, ৮০০ গ্রাম ইউরিয়া (দুই কিস্তিতে), ৮০০ গ্রাম পটাশ ও ৬০০ গ্রাম টিএসপি সার প্রয়োগ করতে হবে।

**চারা উৎপাদন**

বীজতলায় চারা তৈরী করে বাটিশাক জমিতে লাগানো হয়। প্রথম ভিটিতে বীজ বপন করে ১০ দিন পর অংকুরিত চারা দ্বিতীয় ভিটিতে স্থানান্তর করতে হয়। দ্বিতীয় ভিটিতে (১০ x ৩ ফুট) ৬ কেজি গোবর সার, ৩০ গ্রাম ইউরিয়া, ২৪ গ্রাম পটাশ ও ৪৫ গ্রাম টিএসপি চারা স্থানান্তরের ৭/৮ দিন আগে প্রয়োগ করতে হবে। বীজ তলায় মাটির সাথে অর্ধেক গোবর ও বালি মিশাতে হবে। হেক্টর প্রতি ১০০ থেকে ১২০ গ্রাম বীজ দরকার হয়।

**চারা রোপণ**

২০-২৫ দিনের চারা জমিতে রোপন করা হয়। ৩ ফুট প্রশস্ত ভিটিতে দুই সারিতে (সারি থেকে সারি ৪৫ সে.মি.) চারা লাগাতে হবে। প্রত্যেক সারিতে চারা থেকে চারার দূরত্ব রাখতে হবে ৩০ সে.মি. ফুট। চারা লাগানোর সাথে সাথে চারার গোড়ায় ও নালাতে পানি দিতে হবে।

**পরবর্তী পরিচর্যা ও সংগ্রহ**

সাফল্যজনকভাবে বাটিশাক চাষ করতে হলে পরিমিত পানি সেচ অত্যন্ত জরুরী। তাছাড়াও প্রয়োজন মত নিড়ানী দ্বারা সব সময় আগাছা দমন এবং সাথে সাথে পোকা-মাকড় এবং রোগ-বালাই দমনের জন্য প্রয়োজনীয় সময়োচিত পদক্ষেপ অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে। বীজ বপনের ৬০ দিন পর বাটিশাক সংগ্রহের উপযোগী হয়।

**বীজ উৎপাদন**

বীজ উৎপাদনের জন্য আবাদ প্রণালী প্রায় একই রকম। তবে তার জন্য আরও বিশেষ পরিচর্যার প্রয়োজন হয়। যেমন- বীজ-ফসলের জন্য নভেম্বর মাসের মাঝামাঝি বীজ বপন করাই শ্রেয়। সব সময় লক্ষ্য রাখতে হবে, যেন বীজ-ফসলের ৫০০ মিটারের মধ্যে অন্য কোন সরিষা গোত্রের ফসল না থাকে। গাছে ফুল আসার পর অতিরিক্ত কিস্তি সার প্রয়োগ করতে হবে। গাছ ঢলে না পড়ার জন্য প্রত্যেক গাছে খুঁটি বেঁধে দিতে হবে।

## বিলাতী ধনিয়া

বিলাতী ধনিয়া সারা বছর ধরে জন্মে এবং এদিক থেকে এর গুরুত্ব রয়েছে। এই গাছ অতি সহজে জন্মে। আধা ছায়াযুক্ত স্থানেও গাছ বেঁচে থাকে এবং বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। এর জন্য তেমন যত্নের প্রয়োজন হয় না। কোথাও একবার লাগালে তা বহুদিন ধরে সেখানে স্থায়ী হয়ে থাকে। রবি মৌসুমে গাছে ফুল আসে এবং পরে বীজ মাটিতে পড়ে নিজে নিজেই চারা উৎপাদন করে। এভাবেই প্রকৃতিতে এর বংশ বৃদ্ধি ঘটছে। এর চাষের জন্য বীজ সংগ্রহ করে অথবা চারা নিয়ে সারিতে বুনে অথবা রোপণ করা যেতে পারে। সাধারনত: প্রতি শতাংশে গোবর সার ৫ কেজি এবং প্রতি কিস্তিতে ইউরিয়া ১ কেজি, টিএসপি ২৫০ গ্রাম ও এমপি সার ১ কেজি করে দুই কিস্তিতে প্রয়োগ করতে হবে। বীজ ঘরে সংরক্ষণ করা কঠিন। তাই গাছ থেকে বীজ নিয়ে সরাসরি বুনতে হয়। তবে ক্ষেত থেকে চারা তুলে নিয়ে রোপন করেও চাষ করা যায়।

## পুদিনা

পুদিনা সুগন্ধি মুখরোচক চাটনী তৈরীতে ব্যবহৃত হয়। পুদিনার গাছ বেশ ছোট আকারের এবং ছড়ানো প্রকৃতির। আধা ছায়াযুক্ত স্থানেও পুদিনা জন্মে। পুদিনা রোপণের ভালো সময় জৈষ্ঠ্য/আষাঢ় মাস। তখন গাছের ডগা, কান্ড কিংবা ফেকরী ২০-৩০ সে.মি. ব্যবধানের সারিতে ১০-১৫ সে.মি. অন্তর অন্তর পুঁতে দেওয়া যেতে পারে। পুদিনার বীজও বোনা যায়। বীজ বোনার জন্য প্রশস্ত সময় হচ্ছে কার্তিক /অগ্রহায়ণ মাস। যদিও পুদিনা গাছ একই স্থানে বহুদিন ধরে টিকে, তবে মাঝে মাঝে চাষের জমি স্থানান্তরিত করা উত্তম। একই স্থানে রাখতে হলে, বর্ষাকালে অন্তত: একবার জংগল ও আগাছা পরিষ্কার করে প্রতি শতাংশে ৫ কেজি গোবর সার প্রয়োগ করা উচিত। এছাড়াও প্রতি শতাংশে এবং প্রতি কিস্তিতে ইউরিয়া ১ কেজি, টিএসপি ২৫০ গ্রাম ও এমপি সার ১ কেজি করে দুই কিস্তিতে প্রয়োগ করা যেতে পারে।

# অধ্যায়-১১
# চরাঞ্চলে ফলের চাষ

## তরমুজ

### জাত

চর অঞ্চলের জন্য হাইব্রীড গ্লোরী জাতটি ইতোমধ্যেই চাষাবাদের জন্য উপযোগী বলে বিবেচিত হয়েছে এবং কৃষকদের কাছে জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। গাছের দৈর্ঘ্য ১৮০-২০০ সে. মি. লতানো। জীবনকাল ১২০ দিন। ফলের ভিতরের রং লাল। ফল প্রদান কাল ৩-৪ মাস। সম্ভাব্য ফলন ২০০ কেজি প্রতি শতাংশে তবে চর এলাকার গড় ফলন ১৬০ কেজি প্রতি শতাংশে।

### উৎপাদন প্রযুক্তি

| | |
|---|---|
| রোপন পদ্ধতি | : বেডের কেন্দ্রে মাদায় বীজ ডিবলিং |
| বীজ বোনার সময় | : অগ্রহায়ন (নভেম্বর/ডিসেম্বর) |
| বীজের হার | : প্রতি শতাংশে ২.৫ গ্রাম |
| প্রাক বপন | : বীজ তৈরী ১২ ঘন্টা বীজ ভিজিয়ে রেখে ২-৩ দিন জাগ দিতে হবে। |
| বেডের আকার ও বীজ বপন | : ১৫ সে.মি. উঁচু ১৫০ সে.মি. বর্গাকার বেডের কেন্দ্রে একটি মাদা। প্রতি মাদায় ৩টি বীজ বপন করার পর সবল চারাটি রেখে অন্যগুলো তুলে ফেলতে হবে। |

### সার প্রয়োগ

ক) জমি তৈরির সময় গোবর/কম্পোষ্ট ৪০ কেজি, টিএসপি ৪০০ গ্রাম ও এমপি ৭০০ গ্রাম প্রতি শতাংশে

খ) ইউরিয়া উপরি প্রয়োগ প্রতি শতাংশে প্রতিবার ২০০ গ্রাম করে চারা গজানোর ২০, ৪০ ও ৬০ দিন পর পর।

### আগাছা ও রোগ পোকা দমন

ক) আগাছা: ক্ষেত আগাছা মুক্ত রাখতে হবে এবং মাটির চটা ভেঙ্গে দিতে হবে।

খ) পোকা/মাকড়: চরাঞ্চলে তরমুজ চাষে মাইটস বা মাকড়ের আক্রমণ প্রায়ই লক্ষ্য করা যায়। এ পোকা খালি চোখে দেখা যায় না। এদের আক্রমণে পাতা/ডগা কুকঁড়ে যায় ফলে গাছের বৃদ্ধি থেমে যায়। এদের দমন করতে ক্যালথেন ৫ মিলি/ শতাংশে বা সালফার ৪ গ্রাম/ শতাংশে ব্যবহার করতে হবে।

সাদা মাছি পোকা পাতার রস চুষে খায় বলে পাতায় অসংখ্য ছোট ছোট সাদা বা হলদে দাগ পড়ে এবং একসময় সম্পূর্ণ পাতা হলুদ হয়। সাবান বা সাবানের গুঁড়া ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে পাতার নীচে স্প্রে করা, হলুদ রং এর আঠা ফাঁদ ব্যবহার করা এবং আক্রমন বেশি হলে ম্যালাথিয়ন, সুমিথিয়ন ১ মিলি ঔষধ ১ লিটার পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করা।

পাতার হপার পোকা ৫ গ্রাম গুঁড়া সাবান প্রতি লিটার পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করা।

গ) রোগ দমন: আক্রান্ত গাছ ধ্বংস করা, ক্ষেত আগাছা পরিষ্কার রাখা এবং কীটনাশক দিয়ে বাহক পোকা দমন করা।

### ফসল সংগ্রহ

লাগানোর ৪০-৪৫ দিন পর থেকে ফল সংগ্রহ করা যাবে। ফলের বোঁটার উপরের আকর্শী শুকিয়ে গেলে বুঝতে হবে ফল পরিপক্ক হয়েছে।

## পেঁপে

### পেঁপের জাত

বারি পেঁপে-১ বা শাহী একটি একলিঙ্গ জাতের পেঁপে। স্ত্রী ও পুরুষ ফুল আলাদা গাছে ধরে। স্ত্রী গাছের প্রতিটি পত্র কক্ষের একটি বোঁটায় ৩টি করে স্ত্রী ফুল আসে। অপর পক্ষে পুরুষ গাছে লম্বা বোঁটায় একসংগে অনেক পুরুষ ফুল ধরে। গাছ হালকা সবুজ বর্ণের। তবে পাতার রং গাঢ় সবুজ। চারা লাগানোর ৩-৪ মাস পর ফুল আসে। কান্ডের খুব নিচু হতে ফল ধারণ শুরু হয়। ফুল আসার ৩-৪ মাস পর পাকা পেঁপে সংগ্রহ করা যায়। জাতটি দেশের সর্বত্রই চাষোপযোগী। এ জাত প্রায় সারা বছরই ফল দিয়ে থাকে এবং রোপণের ৮-৯ মাসের মধ্যেই পাকা ফল পাওয়া যায়। উৎকৃষ্ট মানের সবজি হিসেবে

সারাদেশেই কাঁচা ফলের চাহিদা আছে। তাই শাহী পেঁপের চাষ অত্যন্ত লাভজনক। এছাড়া বিভিন্ন হাইব্রিড জাত যেমন- রেড লেডী, হানি কুইন ইত্যাদি। হাইব্রীড জাতগুলো উভলিঙ্গ। তাই প্রতিটি ফুল হতে ফল হয় বলে প্রচুর ফলন পাওয়া যায়। তবে মনে রাখতে হবে যে, হাইব্রীড জাতের পেঁপে থেকে কোন বীজ রাখা যাবে না। এছাড়া স্থানীয়ভাবে উন্নত ও উচ্চফলনশীল জাত গ্রাম অঞ্চলে লক্ষ্য করা যায়। সেক্ষেত্রে ঐ গাছের বীজ সংগ্রহ করে আবাদ করা যায়।

**মাটি**

উঁচু ও মাঝারি উঁচু জমি ভাল। উপযুক্ত পরিচর্যার দ্বারা প্রায় সব ধরনের মাটিতেই পেঁপের চাষ করা যায়।তবে কোন মতেই গাছের গোড়ায় পানি জমতে দেয়া যাবে না।

**বীজের হার**

দুই মিটার দূরে দূরে সারি করে প্রতি সারিতে ২ মিটার দূরত্বে চারা রোপণ করলে ১ হেক্টর জমিতে ২৫০০ গাছের জন্য ৭৫০০ চারার প্রয়োজন হয়। স্থানীয় জাতগুলোর সদ্য সংগৃহীত বীজ হলে ১৪০-১৬০ গ্রাম বীজ দিয়ে প্রয়োজনীয় চারা তৈরী করা যায়।

**চারা তৈরি**

বীজ থেকে বংশ বিস্তার করা যায়। পলিথিন ব্যাগে চারা তৈরি করলে রোপণের পর চারা দ্রুত বৃদ্ধি পায়। ১৫x১০ সে.মি. আকারের ব্যাগে সমপরিমাণ বালি, মাটি ও পচা গোবরের মিশ্রণ ভর্তি করে ব্যাগের তলায় ২-৩টি ছিদ্র করতে হবে। তারপর এতে সদ্য সংগৃহীত বীজ হলে ১টি এবং পুরাতন হলে ২-৩টি বীজ বপন করতে হবে। একটি ব্যাগে একের অধিক চারা রাখা উচিত নয়। ২০-২৫ দিন বয়সের চারায় ১-২% ইউরিয়া স্প্রে করলে চারার বৃদ্ধি ভাল হয়।

**চারা রোপণ পদ্ধতি**

দেড় থেকে ২ মাস বয়সের চারা রোপণ করা হয়। ২ মিটার দূরে দূরে ৬০ x ৬০ সে.মি. আকারের গর্ত করে রোপণের ১৫ দিন পূর্বে গর্তের মাটিতে সার মিশাতে হবে। পানি নিকাশের জন্য দুই সারির মাঝখানে ৫০ সে.মি. নালা রাখতে হবে।

**রোপণ সময়**

পেঁপে সারা বছর চাষ করা যায়। তবে ফাল্গুণ ও আশ্বিণ/কার্তিক মাসে চারা রোপন করার উত্তম সময়।

**সারের পরিমাণ**

প্রতি গাছে ইউরিয়া ৪৫০-৫৫০ গ্রাম, টিএসপি ৪৫০-৫৫০ গ্রাম, এমপি ৪৫০-৫৫০ গ্রাম, জিপসাম ২৪৫-২৫০ গ্রাম, বোরাক্স ২০-৩০ গ্রাম, জিংক সালফেট ১৫-২০ গ্রাম এবং জৈব সার ৫-১০ কেজি করে প্রয়োগ করতে হবে।

**সার প্রয়োগ পদ্ধতি**

চারা লাগানোর পর গাছে নতুন পাতা আসলে ইউরিয়া ও এমপি সার ৫০ গ্রাম করে প্রতি এক মাস অন্তর প্রয়োগ করতে হবে। গাছে ফুল আসলে এ মাত্রা দ্বিগুণ করা হয়। শেষ ফল সংগ্রহের এক মাস পূর্বেও সার প্রয়োগ করতে হবে। পচা গোবর, টিএসপি, জিপসাম, বোরাক্স এবং জিংক সালফেট গর্ত তৈরির সময় প্রয়োগ করতে হবে।

**অন্তর্বর্তীকালীন পরিচর্যা**

প্রতি গর্তে স্থানীয় জাতের ৩টি চারা রোপণ করা যায়। ফুল আসলে ১টি স্ত্রী গাছ রেখে বাকি গাছ তুলে ফেলতে হবে। তবে হাইব্রীড জাতের ক্ষেত্রে প্রতি গর্তে ১/২ টি চারা রোপন করতে হবে। স্থানীয় জাতের বেলায় পরাগায়ণের সুবিধার জন্য বাগানে ১০% পুরুষ গাছ রাখা হয়। ফুল হতে ফল ধরা নিশ্চিত মনে হলে একটি বোঁটায় একটি ফল রেখে বাকিগুলো ছিড়ে ফেলতে হবে। গাছ যাতে ঝড়ে না ভাঙ্গে তার জন্য বাঁশের খুটি দিয়ে গাছ বেঁধে দিতে হবে। দুই সারির মাঝখানের নালার মাধ্যমে পানি নিকাশ নিশ্চিত করতে হবে। ফলের কষ জলীয়ভাগ ধারণ করলে সবজি হিসেবে সংগ্রহ করা যায়। ফলের ত্বক হালকা হলুদ বর্ণ ধারণ করলে পাকা ফল হিসেবে সংগ্রহ করা হয়। নিয়ন্ত্রিত পরাগায়ণের মাধ্যমে জাতের বিশুদ্ধতা বজায় রাখা যায়। **হাইব্রিড জাতের গাছ উভলিঙ্গ হওয়ায় সাধারণত: যতগুলি ফুল আসে তার প্রত্যেক ফুলেই একটি করে ফল হয়।**

অন্যান্য পরিচর্যা

**পেঁপের ড্যাম্পিং অফ রোগ দমন**

পেঁপের ঢলে পড়া রোগে প্রচুর চারা গাছ মারা যায়। তাছাড়া এ রোগের জীবাণুর আক্রমণে বর্ষা মৌসুমে কান্ড পঁচা রোগও হয়ে থাকে। বর্ষা মৌসুমে ঢলে পড়া রোগের প্রকোপ খুব বেশি দেখা যায়। বৃষ্টির পানিতে অথবা সেচের পানিতে এ রোগের জীবাণু ছড়ায়। অনেক সময় জিংকের অভাবে মোজাইকের মত লক্ষণ প্রকাশ পায়।

**প্রতিকার**

- গাছের গোড়ার পানি নিকাশের ভাল ব্যবস্থা রাখতে হবে।
- বীজতলার মাটি ৫% ফরমালডিহাইড দ্বারা জীবাণুমুক্ত করতে হবে।
- রোগাক্রান্ত চারা গাছ মাটি হতে উঠিয়ে পুড়ে ফেলতে হবে।
- রিডোমিল এমজেড-৭২ প্রতি লিটার পানিতে ২ গ্রাম হারে মিশিয়ে ৭ দিন পর পর গাছের গোড়ার চার পার্শ্বের মাটিতে প্রয়োগ করতে হবে।
- জিংকের ঘাটতির জন্য মোজাইক লক্ষণ দেখা দিলে গাছের গোড়ায় গাছ প্রতি ৫-১০ গ্রাম জিংক প্রয়োগ করলে এবং ০.২% জিংক গাছের পাতায় স্প্রে করলে এ সমস্যা দুরীভূত হয়।

## কুল

কুল পুষ্টিমান সমৃদ্ধ একটি ফল। কুলের ফল ও পাতা বাটা বাতের জন্য উপকারী। ফল রক্ত শোধন, রক্ত পরিষ্কার এবং হজমীকারক। পেটে বায়ু ও অরুচি, অতিসারে, প্রদর রোগে কুল থেকে তৈরী ওষুধ ব্যবহার করা হয়। শুকনো কুলের গুঁড়ো ও আঁখের গুড় মিশিয়ে চেটে খেলে মেয়েদের সাদা স্রাবের কিছুটা উপকার হয়।

**জাত**

বর্তমানে দেশে বেশ কিছু স্থানীয় জাত রয়ে ছে যা কুমিল্লা কুল, সাতক্ষীরা কুল, রাজশাহী কুল নামে পরিচিত। এছাড়া আধুনিক জাতের মধ্যে বাউ কুল-১,২,ও ৩, বারিকুল-৩, আপেল কুল ইত্যাদি বেশ জনপ্রিয়তা পেয়েছে।

**মাটি ও জমি**

যে কোন ধরনের মাটিতেই বিশেষ করে দো-আঁশ মাটিতে কুলের সন্তোষজনক ফলন পাওয়া যায়। কুলগাছ লবণাক্ততা ও জলাবদ্ধতা উভয়ই সহ্য করতে পারে।

**রোপনের সময়**

মধ্য জ্যৈষ্ঠ থেকে মধ্য আশ্বিন চারা রোপনের উপযুক্ত সময়।

**রোপনের দুরত্ব**

সারি থেকে সারি ৫-৭ মিটার এবং চারা থেকে চারা ৪-৬ মিটার।

**গর্ত তৈরী**

গর্তের আকার হবে চওড়া ১ মিটার এবং ১ মিটার গভীর।

প্রতি গর্তে সারের পরিমান: চারা রোপনের ১০-১২ দিন আগে পঁচা গোবর ২০-২৫ কেজি, টিএসপি ২০০-২৫০ গ্রাম, এমপি ২৪৫-২৫৫ গ্রাম প্রয়োগ করতে হবে।

**রোপন**

গর্ত ভর্তি করার ১০-১৫দিন পর গর্তের মাঝখানে নির্বাচিত চারাটি সোজাভাবে লাগিয়ে খুঁটি, বেড়া ও পানি দেয়ার ব্যবস্থা করতে হবে।

### ডাল ছাঁটাই

প্রতি বছর ফল সংগ্রহের পর ছাঁটাইয়ের সময় শক্ত সমর্থ শাখাগুলো গোড়া থেকে না কেটে কিছু অংশ রেখে আগা কেটে ফেলতে হবে। এছাড়া দুর্বল, রোগা ও কীটাক্রান্ত ঘনভাবে বিন্যস্ত ডালগুলো কেটে পাতলা করে দিতে হবে। অতপর নতুন যে ডালপালা গজাবে সেগুলোও বাছাই করে ভাল ডালগুলো রেখে দুর্বল ডাল কেটে ফেলে দিতে হবে।

**সার প্রয়োগঃ বয়স বাড়ার সাথে সাথে প্রতিটি গাছের জন্য সারের পরিমান হবে-**

| গাছের বয়স | গোবর (কেজি) | ইউরিয়া (গ্রাম) | টিএসপি (গ্রাম) | এমপি (গ্রাম) |
|---|---|---|---|---|
| ১-২ | ১০-১২ | ২৫০-৩০০ | ২০০-২৫০ | ২০০-২৫০ |
| ৩-৪ | ১৫-২০ | ৩৫০-৫০০ | ৩০০-৪৫০ | ৩০০-৪৫০ |
| ৫-৬ | ২১-২৫ | ৫৫০-৭৫০ | ৫০০-৭০০ | ৫০০-৭০০ |
| ৭-৮ | ২৬-৩৫ | ৮০০-১০০০ | ৭৫০-৮৫০ | ৭৫০-৮৫০ |
| ৯ ও তদুর্ধ | ৩৬-৪৫ | ১১৫০-১২৫০ | ৯০০-১০০০ | ৯০০-১০০০ |

এসব সার বছরে ২ কিস্তিতে প্রয়োগ করতে হবে। ফুল আসার আগে ও ফল সংগ্রহের পর সার প্রয়োগ করতে হবে। সার দেয়ার পর হালকা সেচ দিতে হবে।

### সেচ

চারা রোপনের পর প্রয়োজন অনুসারে সেচ দিতে হবে। ফল ধরার পর ১৫ দিন পরপর সেচ দিলে আশানুরূপ ফলন পাওয়া যাবে।

### পাউডারি মিলডিউ রোগ

গাছের পাতা, ফুল ও কচি ফল পাউডারি মিলডিউ রোগে আক্রান্ত হয়। আক্রান্ত ফুল ও ফল গাছ হতে ঝরে পড়ে। গাছে ফুল দেখা দেয়ার পর থিউভিট নামক ছত্রাক নাশক প্রতি লিটার পানিতে ২ গ্রাম অথবা টিল্ট ২৫০ ইসি প্রতি লিটার পানিতে ০.৫ মিলি মিশিয়ে ১৫ দিন পর পর ২-৩ বার স্প্রে করতে হবে।

### ফল ছিদ্রকারী পোকা

বয়স্ক পোকা ফলের বোঁটার কাছে ডিম পাড়ে এবং শুককীট ফলে সুড়ঙ্গ তৈরী করে শাঁস খেয়ে ফেলে। এতে ফল খাওয়ার উপযোগী থাকে না। রিপকর্ড/সিমবুস/ফেনম ১০ ইসি ১ মিলি হারে অথবা সুমিথিয়ন/ম্যালাথিয়ন/লিবাসিড ২ মিলি হারে প্রতি লিটার পানিতে মিশিয়ে ফল মটর দানার মত হওয়ার পর থেকে প্রতি ১৫ দিন পরপর ২ বার স্প্রে করতে হবে।

### মাছি পোকা

এ পোকার কীড়া পাকা ফলের শস্যের মধ্যে ঢুকে শাঁস খেতে খেতে আঁটি পর্যন্ত পৌছে যায় এবং কুল খাওয়ার অযোগ্য হয়ে যায়। দমনের জন্য অতিরিক্ত পাকার আগে ফল সংগ্রহ করতে হবে। আক্রান্ত ফল এবং গাছের নিচে পড়া ফল সংগ্রহ করে মাটিতে পুঁতে রাখতে হবে। প্রতি লিটার পানির সাথে ডেসিস ২.৫ ইসি ১ মিলি হারে মিশিয়ে ফল সংগ্রহের এক থেকে দেড় মাস পূর্বে ১৫ দিন পরপর দু'বার স্প্রে করতে হবে।

### ফল সংগ্রহ

মধ্য পৌষ থেকে মধ্য চৈত্র মাসের মধ্যে ফল পাওয়া যায়। ফলের রঙ হালকা-সবুজ বা হলদে হলে সংগ্রহ করতে হয়।

## নারিকেল

খাদ্যোপযোগী ডাবের পানিতে ক্যালসিয়াম, ফসফরাস ও অন্যান্য পুষ্টি উপাদান রয়েছে। বিভিন্ন রকম পেটের গোলযোগে গ্লুকোজ স্যালাইনের বিকল্প হিসেবে ডাবের পানি খুবই উপযোগী। ঘন ঘন পাতলা পায়খানা ও বমির ফলে দেহে যে পানির অভাব ঘটে তা পুরণে ডাবের পানি অত্যন্ত কার্যকরী। এটি পিত্তনাশক ও কৃমিনাশক। ফলের মালা/আইচা পুড়িয়ে পাথরবাটি চাপা দিয়ে পাথরের গায়ে যে গাম/কাই হয় তা দাদের জন্য মহৌষধ।

**জাত**

নারকেলের জাতকে প্রধানত: দু'টো ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যথা লম্বা ও খাটো। বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট দেশে চাষাবাদের উপযোগী নারকেলের দুটো জাত যথা- বারি নারকেল-১ এবং বারি নারকেল-২ উদ্ভাবন করেছে। এছাড়া মালয়েশিয়ান ও শ্রীলঙ্কান কিছু কিছু জাত এদেশে প্রচলিত আছে।

**মাটি**

নারকেল গাছের জন্য নিকাশযুক্ত দো-আঁশ থেকে পলি দো-আঁশ মাটি উত্তম।

**রোপণ**

বাগান আকারে নারকেলের চারা বর্গাকার বা ষড়ভূজী পদ্ধতিতে রোপণ করা ভাল। মধ্য জ্যৈষ্ঠ থেকে মধ্য আশ্বিন চারা রোপণের উপযুক্ত সময়। রোপণ দূরত্ব রাখতে হবে ৬-৮ মিটার (২০-২৬ ফুট)।

**গর্ত তৈরী**

গর্তের আকার ১ মিটার চওড়া ও ১ মিটার গভীর।

**প্রতি গর্তে সারের পরিমাণ**

টিএসপি ২৫০ গ্রাম, এমপি ৪০০ গ্রাম ও গোবর ১০ কেজি।

**চারা রোপণ**

গর্তে সার মিশানোর ১০-১৫ দিন পর গর্তের মাঝখানে চারা রোপণ করতে হবে এবং প্রয়োজনমত পানি, খুঁটি ও বেড়ার ব্যবস্থা করতে হবে।

**পরবর্তিতে সার প্রয়োগ**

চারার বয়স ৩ মাস হলে ২৫০ গ্রাম ইউরিয়া উপরি প্রয়োগ করতে হবে।

**১০ বছরের উর্ধ্বে ফলন্ত গাছে সারের পরিমাণ**

ইউরিয়া ১.৫০ কেজি, টিএসপি ১ কেজি, এমপি ১.৭০ কেজি, জিপসাম ৫০০ গ্রাম, জিংক সালফেট ২০০ গ্রাম।

দু'কিস্তিতে সার প্রয়োগ করতে হবে। ১ম কিস্তির সার বৈশাখ থেকে মধ্য জ্যৈষ্ঠ (মে) মাসে এবং ২য় কিস্তির সার মধ্য ভাদ্র থেকে মধ্য আশ্বিন (সেপ্টেম্বর) মাসে গোড়া থেকে অন্তত ১.৭৫ মি. দূরে প্রয়োগ করতে হবে। অম্ল মাটিতে প্রতি ৩ বছর অন্তর অন্তর এক কেজি চুন প্রয়োগ করা উচিত।

**সেচ**

শুষ্ক মৌসুমে ১৫ দিন পরপর ২-৩ বার সেচ দেয়া উত্তম। তবে বর্ষা মৌসুমে পানি নিষ্কাশন দরকার।

**ডাব পঁচা রোগ**

ছত্রাক আক্রান্ত অপরিপক্ক ফল গাছ থেকে ঝরে যায়। বর্দোমিশ্রণ (১%) অথবা কপার অক্সিক্লোরাইড বা কুপ্রাভিট (২ গ্রাম/লিটার) স্প্রে করতে হবে।

**গোবরে পোকা**

এ পোকার আক্রমনে শীর্ষ পাতা শুকিয়ে যায়। পূর্ণবয়স্ক গাছের মাথায় আক্রমন করে ও পত্রকান্ড ছিদ্র করে ঢুকে ভেতরের কোষকলা খেতে থাকে। বাগান বা গাছের নিচে গোবর বা কম্পোষ্টের গাদা রাখতে নেই। আক্রান্ত ডালপালা ধারালো ছুরি দিয়ে কেটে দিতে হবে। ছিদ্রে লোহার শিক ঢুকিয়ে খুঁছিয়ে পোকা মারা যায়। ছিদ্রের মধ্যে পেট্রোল/কেরোসিন দিয়ে গর্তের মুখ কাদামাটি বা বর্দোপেস্ট দিয়ে বন্ধ করে এ পোকা দমন করা যায়।

**ফল সংগ্রহ**

ফুল ফোটার ১১-১২ মাস পর ফল সংগ্রহের উপযুক্ত হয়। কচি অবস্থায় ফলের রঙ সবুজ থাকে। পরিপক্ক অবস্থায় নারিকেলের রঙ সবুজ থেকে বাদামী/খয়েরী রঙ ধারণ করে এবং নারিকেলের গায়ে চুলের মত চিকন দাগ পড়ে।

## কলা

কলা অনন্তকাল থেকে রোগীর পথ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। পাকা কলা কোষ্ঠ কাঠিণ্যতা দুরীকরণে ব্যবহার করা হয়। কলার থোড়/মোচা এবং শিকড় ডায়াবেটিস, আমাশয়, আলসার, পেটের পীড়া নিরাময়ে ব্যবহৃত হয়।

### জাত

পৃথিবীতে কলার শত শত জাত রয়েছে। তবে চাষাবাদ যোগ্য কলার জাতের সংখ্যা খুব বেশি নয়। বাংলাদেশে কলার জাতের মধ্যে সবরি, অমৃতসাগর, চিনিচাপা, করবি, জাহাজী উল্লেখযোগ্য। বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট দেশের সর্বত্র চাষের জন্য বারি কলা-১ নামে একটি উন্নত জাত উদ্ভাবন ও মুক্তায়ন করেছে। তবে **চরাঞ্চলে বাংলা কলা বা কাঠাঁলি কলা প্রচুর পরিমানে বসতবাড়ির আঙ্গিনায়, রাস্তার ধারে এবং পুকুর পাড়ে এর চাষ করা হয়ে থাকে। একটু ভাল পরিচর্যা করলে এ কলার ভাল ফলন পাওয়া যায়।**

### জমি নির্বাচন ও তৈরী

পর্যাপ্ত রোদমুক্ত ও পানি নিষ্কাশনের সুব্যবস্থাসম্পন্ন উঁচু জমি কলা চাষের জন্য উপযুক্ত। উর্বর দো-আঁশ মাটি কলা চষের জন্য উত্তম।

### রোপণ পদ্ধতি

বাণিজ্যিকভাবে চাষের জন্য বর্গাকার ও ষড়ভূজী পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে।

### রোপণের সময়

কলার চারা রোপণের উপযুক্ত সময় হলো- আশ্বিন-কার্তিক (মধ্য সেপ্টেম্বর থেকে মধ্য নভেম্বর), মাঘ-ফাল্গুন (মধ্য জানুয়ারী থেকে মধ্য মার্চ) এবং চৈত্র-বৈশাখ (মধ্য মার্চ থেকে মধ্য মে) মাস।

### রোপণের দূরত্ব

সারি থেকে সারি ২ মিটার (৬ ফুট) ও গাছ থেকে গাছ ২ মিটার (৬ ফুট)

### গর্ত তৈরী

গর্তের আকার ৬০ সে.মি. চওড়া এবং ৬০ সে.মি. গভীর।

### প্রতি গর্তে সারের পরিমান

চারা রোপণের মাসখানেক আগেই গর্ত খনন করতে হয়। গর্তে গোবর ১০ কেজি ও টিএসপি ১২৫ গ্রাম মাটির সাথে মিশিয়ে গর্ত ভরাট করতে হবে।

### রোপণ

রোপণের জন্য অসি তেউড় উত্তম। অসি তেউড়ের পাতা সরু, সুচালো এবং অনেকটা তলোয়ারের মত, গুঁড়ি বড় ও শক্তিশালী এবং কান্ড ক্রমশ গোড়া থেকে উপরের দিকে সরু হয়। তিন মাস বয়স্ক সুস্থ সবল তেউড় রোগমুক্ত বাগান থেকে সংগ্রহ করতে হয়। সাধারনত খাটো জাতের গাছের ৩৫-৪৫ সে. মি. ও লম্বা জাতের গাছের ৫০-৬০ সে. মি. দৈর্ঘ্যের তেউর ব্যবহার করা হয়।

### সার প্রয়োগ

প্রতি গর্তে যে হারে সার প্রয়োগ করতে হবে। তাহলো-গোবর/আবর্জনা পঁচা সার ১৫-২০ কেজি, টিএসপি ২৫০-৪০০ গ্রাম, এমপি ২৫০-৩০০ গ্রাম, ইউরিয়া ৫০০-৬৫০ গ্রাম। গোবর সারের ৫০% জমি তৈরির সময় এবং বাকি ৫০% পরবর্তীতে দিতে হয়। এ সময় অর্ধেক টিএসপি গর্তে প্রয়োগ করা হয়। রোপণের দেড় থেকে দু'মাস পর ২৫% ইউরিয়া, ৫০% এমপি ও বাকি টিএসপি জমিতে ছিটিয়ে ভালভাবে কুপিয়ে মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হবে। এরপর দু'থেকে আড়াই মাস পর গাছপ্রতি বাকি ৫০% এমপি এবং ৫০% ইউরিয়া প্রয়োগ করতে হবে। ফুল আসার সময় অবশিষ্ট ২৫% ইউরিয়া জমিতে ছিটিয়ে মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হবে।

### সেচ

চারা রোপণের সময় মাটিতে পর্যাপ্ত আর্দ্রতা না থাকলে তখনই সেচ দেওয়া উচিত। এছাড়া শুষ্ক মৌসুমে ১৫-২০ দিন অন্তর সেচ দেওয়া দরকার। বর্ষার সময় কলা বাগানে যাতে পানি জমতে না পারে তার জন্য নালা থাকা আবশ্যক।

### পানামা রোগ

এটি একটি ছত্রাক জাতীয় মারাত্মক রোগ। এ রোগের আক্রমনে প্রথমে পাতার কিনারা হলুদ হয়ে যায় এবং পরে কচি পাতাও হলুদ রঙ ধারণ করে। পরবর্তীতে পাতা বোটার কাছে ভেঙ্গে গাছের চতুর্দিকে ঝুলে থাকে এবং মরে যায়। কিন্তু সবচেয়ে কচি পাতাটি গাছের মাথায় খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। অবশেষে গাছ মরে যায়। কোন কোন সময় গাছ লম্বালম্বি ভাবে ফেটেও যায়। আক্রান্ত গাছ গোড়াসহ উঠিয়ে পুড়ে ফেলতে হবে।

### বানচি-টপ (ভাইরাস রোগ)

এ রোগের আক্রমনে গাছের বৃদ্ধি হ্রাস পায় এবং পাতা গুচ্ছাকারে বের হয়। পাতা আকারে খাটো, অপ্রশস্থ এবং উপরের দিকে খাড়া থাকে। কচি পাতার কিনারা উপরের দিকে বাকানো এবং সামান্য ফ্যাকাসে হলুদ রঙ ধারণ করে। আক্রান্ত গাছ গোড়াসহ উঠিয়ে পুড়ে ফেলতে হবে। গাছ উঠানোর আগে জীবাণু বহনকারী 'জাব পোকা' ও 'থ্রিপস' কীটনাশক ওষুধ দ্বারা দমন করতে হবে। সুস্থ গাছেও কীটনাশক ওষুধ ডেসিস ২.৫ ইসি (১ মিলি/ লিটার) স্প্রে করতে হবে।

### সিগাটোকা রোগ

এ রোগের আক্রমণে প্রাথমিকভাবে ৩য় ও ৪র্থ পাতায় ছোট ছোট হলুদ দাগ দেখা যায়। ক্রমশ: দাগগুলো বড় হয় ও বাদামি রঙ ধারণ করে। এভাবে একাধিক দাগ মিলে বড় দাগের সৃষ্টি করে এবং তখন পাতা পুড়ে যাওয়ার মত দেখায়। আক্রান্ত গাছের পাতা পুড়ে ফেলতে হবে। প্রতি লিটার পানিতে ০.৫ মিলি টিল্ট ২৫০ ইসি অথবা ১ গ্রাম ব্যাভিস্টিন মিশিয়ে ১৫ দিন পরপর গাছে ছিটাতে হবে।

### কলার পাতা ও ফলের বিটল পোকা

কলার পাতা ও ফলের বিটল পোকা কলার কচি পাতায় হাটাহাটি করে এবং সবুজ অংশ নষ্ট করে। ফলে সেখানে অসংখ্য দাগের সৃষ্টি হয়। অতিরিক্ত আক্রমণে গাছ দুর্বল হয়ে যায়। কলা বের হওয়ার সময় হলে পোকা মোচার মধ্যে ঢুকে কচি কলার উপর হাটাহাটি করে এবং রস চুষে খায়। ফলে কলার গায়ে বসন্ত রোগের মত দাগ হয়। এসব দাগের কারনে কলার বাজার মূল্য কমে যায়। পোকা আক্রান্ত মাঠে বারবার কলার চাষ করা যাবে না। কলার মোচা বের হওয়ার সময় নীল পলিথিন ব্যাগ দ্বারা ঢেকে দিয়ে নিচের দিকে খোলা রাখতে হবে। প্রতি ১ লিটার পানিতে ১ মিলি ডেসিস ২.৫ ইসি মিশিয়ে ১৫ দিন পরপর ২ বার গাছের পাতার উপর ছিটাতে হবে বা লিবাসিড ৫০ ইসি ২ মিলি হারে ব্যবহার করতে হবে।

### ফল সংগ্রহ

রোপণের পর ৯-১৪ মাসের মধ্যেই সাধারনত: সব জাতের কলা পরিপক্ক এবং সংগ্রহের উপযুক্ত হয়।

# অধ্যায়-১২
# ফসলের রোগবালাই ও পোকামাকড় দমন

## সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা

**প্রয়োজনীয়তা**

ফসলের অনিষ্টকারী কীটপতঙ্গ ও রোগব্যাধি বা বালাই দমনে অত্যধিক রাসায়নিক কীটনাশক বা বালাইনাশক ব্যবহার চাষাবাদ অব্যাহত থাকায় জনস্বাস্থ্য এবং পরিবেশ বর্তমানে হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই সমস্যা মোকাবেলার জন্যে বালাই দমন পদ্ধতি পরিবর্ধন ও বহুমুখী করে সমন্বিত ব্যবস্থাপনা প্রয়োগ অত্যন্ত প্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছে।

**সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা নিচে বর্নিত তিনটি নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত।**

১. ফসলের বালাই এর বংশ উৎপাটন না করে অর্থনৈতিক ভাবে ক্ষতিকর পর্যায়ের নিচে রাখা।
২. যথাসম্ভব রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহার ব্যতিরেকে বালাই এর সংখ্যা কম রাখা।
৩. অন্য কোন উপায় না থাকলে এমন ভাবে বালাইনাশক নির্বাচন ও প্রয়োগ করা যেন উপকারী জীব, মানুষ ও পরিবেশ ক্ষতিকর প্রভাব থেকে মুক্ত থাকে।

## ধানের সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা

**প্রয়োগ পদ্ধতি**

সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপায় নিম্নে বর্নিত পদ্ধতি প্রয়োগে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে।

**১. উপকারী কীটপতঙ্গ ও পোকামাকড় সংরক্ষণ ও বংশবিস্তার**

ফসলের জমিতে বসবাসকারী সব কীটপতঙ্গ ও পোকামাকড় অনিষ্টকারী নয়। এদের অনেকেই পরজীবি অর্থাৎ অনিষ্টকারী কীটপতঙ্গ ও পোকামাকড় বা তাদের ডিম, কীড়া ও পুত্তলি ধরে খায়। ফলে অনিষ্টকারী কীটপতঙ্গ ও পোকামাকড়ের বংশ বৃদ্ধি সীমিত থাকে।

সুতরাং ফসলের জমিতে অনিষ্টকারী কীটপতঙ্গ ও পোকামাকড় দমনের জন্য উপকারী কীটপতঙ্গ ও পোকামাকড়ের উপস্থিতি অপরিহার্য। এরা ফসল উৎপাদনে উপকার করে। অবিচক্ষণতার সাথে বিষাক্ত রাসায়নিক দ্রব্যাদির ব্যবহারের ফলে উপকারী কীট পতঙ্গ ও পোকামাকড়ের বংশবৃদ্ধি কমে যায় বা বিলুপ্ত হয়।

**উপকারী কীটপতঙ্গ ও পোকামাকড়ের সংরক্ষণ ও বংশবৃদ্ধি পদ্ধতি**

ক. চিটাগাং পদ্ধতি: ফসলের জমির আইলে দ্রুত বর্ধনশীল দেশী সীম, শসা বা অন্যান্য রঙ্গীন ফুলের শস্য আবাদ করা। রঙ্গীন ফুলে উপকারী কীটপতঙ্গ ও পোকামাকড় আকৃষ্ট হয়ে আইলের ফসলে আশ্রয় নেয়। এতে এদের বংশবিস্তারে সহায়তা হয়।

খ. চায়না পদ্ধতি: ফসল কাটার পর ক্ষেতের আইলে খড় বিছিয়ে রেখে উপকারী কীটপতঙ্গ ও পোকামাকড়ের সাময়িক আশ্রয়ের ব্যবস্থা করা। যাতে করে ফসলহীন জমিতে পরবর্তী ফসল শুরু পর্যন্ত বসবাসের সুযোগ পায়।

গ. আশ্রয়ের ব্যবস্থা: ফসল সংগ্রহের পর জমিতে চাষ দেয়া বা সেচ পানি প্রয়োগে বিলম্ব হওয়া। যেন উপকারী কীটপতঙ্গ ও পোকামাকড় নিজেদের আশ্রয়স্থল খুঁজে নেয়ার সময় পায়। প্রয়োজন হলে উপকারী কীটপতঙ্গের বংশ বৃদ্ধির জন্য জমির মাটিতে আর্দ্রতা রাখতে হবে।

ঘ. বুষ্টার পদ্ধতি: মাথা সমান বা ১.৫ মিটার উচ্চতার একটি বাঁশের উপরের দিকে গিট রেখে সমান করে কাটতে হবে। তারপর গিটের নিচে দেড় আঙ্গুল বা ৩ সে.মি. দৈর্ঘ্য ও সমান প্রস্থ্যের বর্গাকৃতির ছিদ্র করতে হবে। ছিদ্র করা বাঁশের নিচের দিকে সামান্য চোখা করে ফসলের জমিতে খাড়া করে পুঁতে দিতে হবে। ছিদ্রের চারপাশে রজন বা রেড়ির তেল মিশিয়ে আঠার প্রলেপ দিতে হবে। বাঁশের মাথার উপরে একটি টিনের কোটা বসিয়ে দিতে হবে যেন বৃষ্টির পানি ভিতরে প্রবেশ না করতে পারে। ফসল থেকে কীটপতঙ্গ ও পোকামাকড়ের ডিম বা কীড়া সহ গাছের পাতা বাঁশের ছিদ্রপথে ঢুকিয়ে দিতে হবে। এ থেকে শুক্র পোকার কীড়া ফুটে হামাগুড়ি দিয়ে বের হবার সময়ে আঠায় আটকে মারা যাবে এবং পরজীবী উপকারী পোকা বের হয়ে ছিদ্র পথে উড়ে ফসলের অনিষ্টকারী কীটপতঙ্গ ও পোকামাকড় বা তাদের ডিম, কীড়া ও পুত্তলি ধরে খাবে।

ঙ. পলিথিন ব্যাগ ব্যবহার: ফসল থেকে কীটপতঙ্গ ও পোকামাকড়ের ডিম বা কীড়া সংগ্রহ করে এনে পলিথিন ব্যাগে ভরে মুখ রবার ব্যান্ড দিয়ে আটকিয়ে প্রতিদিন পর্যবেক্ষণ করতে হবে। পূর্নাঙ্গ পোকা হলে ব্যাগে ভিজা তুলা রেখে ডিম পাড়ার ব্যবস্থা করতে হবে। ডিম বা কীড়া থেকে বাচ্চা বের হলে ফসলের ক্ষেতে মুক্ত করে দিলে অনিষ্টকারী কীটপতঙ্গ ও পোকামাকড় বা তাদের ডিম, কীড়া ও পুত্তলি ধরে খাবে।

**২. ফসল উৎপাদনে বালাই সহনশীল বা প্রতিরোধী জাতের ব্যবহার**

ফসলের অনেক জাত আছে যেগুলো বংশগত ভাবে বালাই সহনশীল বা প্রতিরোধ ক্ষমতা সম্পন্ন। অর্থাৎ সহজে কীটপতঙ্গ ও রোগব্যাধিতে আক্রান্ত হয় না। বেশ কিছু নতুন ফসলের জাত সৃষ্টি করা হয়েছে যেগুলোর এই গুণাবলী আছে। যেমন ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট থেকে উদ্ভাবিত অধিকাংশ জাতের টুংরো রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা আছে। একই ভাবে কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত গম, সব্জি, ডাল, তৈল জাতীয় ফসল ব্যাকটেরিয়া ও ছত্রাক রোগ প্রতিরোধী।

**উপকারী পোকার চিত্র**

লেডি বার্ড

ক্যারাবিড

বোলতা

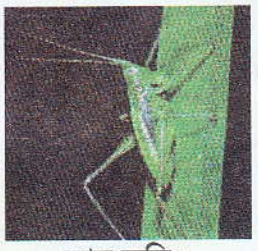

ঘাস ফড়িং

বোলতা

পিঁপড়া

ওয়াটার বাগ

**ফসলের বালাই সহনশীল গুণাবলী তিন ধরনের**

ক. বালাই এর আক্রমন প্রতিরোধ করে যথাযথ ফলন দেয়।

খ. গাছে কীটপতঙ্গ আশ্রয় নিলেও বা ডিম পাড়লেও খেতে পছন্দ করে না।

গ. গাছে কীটপতঙ্গ ঠিকতম বৃদ্ধি পায় না, বাঁচতে পারে না অথবা বংশ বৃদ্ধি হয় না।

**৩. উন্নত পদ্ধতিতে চাষাবাদ**

ফসল উৎপাদনে নিম্নে বর্ণিত উন্নত পদ্ধতি প্রয়োগ করে বালাই দমন করা যায়।

- কীটপতঙ্গ ও রোগমুক্ত বীজ ও সবল চারা ব্যবহার।
- বীজ রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহার করে কীটপতঙ্গ ও রোগমুক্ত করে নেয়া। এতে প্রথম থেকে কীটপতঙ্গ ও রোগব্যাধি সংক্রমন প্রতিরোধ করা যায়।
- মুল ফসলের ফাঁকে কীটপতঙ্গ ও রোগের পছন্দশীল ফসল বা জাত রোপণ। এতে করে অনিষ্টকারী কীটপতঙ্গ ও রোগ মূল ফসল পরিত্যাগ করে ফাঁদে পড়বে।
- একই জমিতে একসাথে বিভিন্ন শস্যের আবাদ। এতে কীটপতঙ্গ ও রোগব্যাধি বিস্তার প্রতিরোধ হতে পারে। যেমন শাকসব্জির ক্ষেতে তামাকের গাছ থাকা ভাল। জাব পোকা তামাকের গাছ পছন্দ করে।
- শস্য আবর্তন: এক এক মৌসুমে ও বৎসরে ভিন্ন ভিন্ন শস্য আবাদ করলে কীটপতঙ্গ ও রোগব্যাধি বিস্তারে ব্যাঘাৎ ঘটে। বিশেষ করে মাটিতে জন্মানো রোগব্যাধি, যেমন নেমাটোড। এক বছর বোরো ধান করে পরবর্তী বৎসরে তৈল বা ডাল জাতীয় শস্য অথবা আলু বা মিষ্টি আলুর আবাদ।
- এক এক ফসলে ভিন্ন ভিন্ন গভীরতায় চাষ, আঁচড়া, বপন, রোপণ, আগাছা দমন, পরিচর্যা করার ফলে কীটপতঙ্গ ও রোগব্যাধি দমন হয়।
- সঠিক সময়ে সঠিক দুরত্বে রোপণ বা বপন। বিলম্বে রোপণে বালাই আক্রমণ বেশী হয়। ঘন রোপণ বা বপনে বালাই বিস্তারের পরিবেশ সৃষ্টি হয়।
- সুষম সার প্রয়োগ: এতে গাছের স্বাস্থ্য ভাল থাকে। জৈব পদার্থ প্রয়োগে মাটির গঠন যথাযথ থাকায় কীটপতঙ্গ ও রোগব্যাধি বিস্তারে ব্যাঘাৎ ঘটে। অন্যদিকে অতি মাত্রায় সার ব্যবহারে অতিরিক্ত গাছের বৃদ্ধি বালাই ও রোগ বিস্তারের পরিবেশ সৃষ্টি করে।
- ছায়া প্রদান: গাছ রোপণ করে ছায়া প্রদানের ব্যবস্থা করলে কীটপতঙ্গের শত্রু আশ্রয় নিতে পারে। যেমন পাখী ও মাকড়সা।
- ফসল আগাছ মুক্ত রাখা: আগাছা গল মাছি ও জাব পোকার আশ্রয়স্থল। জাবপোকার মাধ্যমে ভাইরাস বিস্তৃত হয়।
- সেচ ব্যবস্থাপনা ও উপযুক্ত পরিচর্যা অনিষ্টকারী কীটপতঙ্গ দমনে সহায়ক হয়।
- কর্তনের পর ফসলের অবশিষ্ট পুড়িয়ে ফেলা। এতে জমি কীটপতঙ্গ ও রোগমুক্ত থাকে।
- পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা: মাড়াই স্থল, শুকানোর জায়গা, শস্য গুদাম পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখলে সহজে কীটপতঙ্গ ও রোগব্যাধি বিস্তার লাভ করতে পারে না।

**৪. যান্ত্রিক উপায়ে কীটপতঙ্গ নিয়ন্ত্রণ:**

উপকারী এবং অনিষ্টকারী কীটপতঙ্গ ও পোকামাকড়ের অনুপাত ৩:১ এর কম অর্থাৎ জমির ফসলের বিভিন্ন স্থান থেকে নমুনা হিসেবে কীটপতঙ্গ ও পোকামাকড় সংগ্রহ করে যদি ৪ ভাগের মধ্যে ৩ ভাগের কম উপকারী ও ১ ভাগের বেশী অনিষ্টকারী হয় তা হলে নিম্নলিখিত উপায়ে বালাই দমনের ব্যবস্থা নিতে হবে।

- হাত জালে অনিষ্টকারী কীটপতঙ্গ ও পোকা ধরে ও পোকার ডিম বা কীড়া নষ্ট করে।
- শস্য ক্ষেতে ডাল পুঁতে।
- আলোর ফাঁদ পেতে।
- গাছের অনিষ্টকারী কীটপতঙ্গ ও রোগে আক্রান্ত অংশ কর্তন করে।
- নিমের পাতা বা বীজ পানিতে মিশিয়ে, তামাক গাছের রস, মরিচের গুড়া প্রয়োগ করে। সাবান মিশ্রিত পানি ব্যবহার করে। শাকসব্জি ফসলের কীটপতঙ্গ দমনে এগুলো বেশী কার্যকরী।

**উপকারী পোকার চিত্র**

মাকড়শা

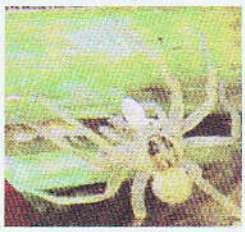

মাকড়শা

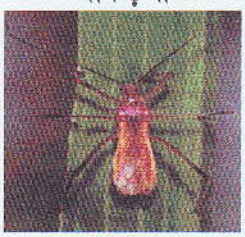

প্লান্ট বাগ

ইয়ার উইগ

ড্যামসেল ফ্লাই

**৫. বিচক্ষণতার সাথে বালাইনাশক ব্যবহার**

উপরোক্ত চারটি উপায়ের মাধ্যমে অনিষ্টকারী কীটপতঙ্গ দমন করা সম্ভব না হলে নিম্নলিখিত অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বালাইনাশক ব্যবহার করতে হবে।

- গাছের পাতা ও কান্ডে অনিষ্টকারী কীটপতঙ্গ আক্রমণে লক্ষণীয় ক্ষতি।
- অনিষ্টকারী কীটপতঙ্গের সংখ্যা মোট কীটপতঙ্গের শতকরা ২৫ ভাগের বেশি।

**অন্যান্য প্রযুক্তি**

**রোপা আমনে পার্চিং**

পার্চিং হলো ফসলের জমিতে প্রাকৃতিক পদ্ধতিতে পোকার আক্রমন নিয়ন্ত্রনে রাখার জন্য জমিতে বাঁশের কঞ্চি, ডালপালা অথবা ধৈঞ্চার গাছ লাগিয়ে পাখি বসার ব্যবস্থা করে দেয়া যা পোকা খেতে পারে।
দুই ভাবে সাধারনত: পার্চিং করা যায়।

**মৃত পার্চিং**

বাঁশের মরা আগা, কঞ্চি, পাটখড়ি, ডালপালা যাবতীয় দ্রব্য যাতে পোকা খেকো পাখি বসার ব্যবস্থা করে দেয়া হল মৃত পার্চিং। পোকা খেকো পাখিরা বিশ্রাম নিতে ফসলখেতে এসকল দ্রব্যাদির উপর বসলে জমিতে বা আশে পাশে ক্ষতিকর পুর্নবয়স্ক পোকা/মথ/কীড়া খেয়ে ফসলকে রক্ষা করে।

**জীবন্ত পার্চিং**

ফসলের জমিতে ধৈঞ্চার চারা অথবা কাটিং পুতে দিলে ধৈঞ্চার গাছ জন্মায়। এসব গাছ বড় হলে তাতে পাখি বসে আশেপাশের পুর্ণ বয়স্ক পোকা, কীড়া খেয়ে ফসলকে পোকার আক্রমন থেকে রক্ষা করে। এছাড়া ধৈঞ্চার পাতা ও শিকড়ের গুটি মাটির উর্বরতা বৃদ্ধি করে।

**আলোর ফাঁদ তৈরীর পদ্ধতি**

রাতের বেলায় ধানের জমি থেকে একটু দুরে খালি জায়গায় হ্যারিকেন, হ্যাজাক লাইট অথবা বৈদ্যুতিক বাতি স্থাপন করে তার নিচে একটি পাত্রে কেরোসিন তেল মিশ্রিত পানি রাখতে হবে। সন্ধ্যার পর বাতি জ্বালিয়ে রাখলে সেখানে অনেক পোকা এসে মারা পড়বে।

**সেক্স ফেরোমন ফাঁদের ব্যবহার**

ক) পুরুষ পোকাকে আকৃষ্ট করার জন্য স্ত্রী মথ এক ধরনের রাসায়নিক পদার্থ নির্গত করে যা সেক্স ফেরোমন নামে পরিচিত। সেক্স ফেরোমন প্রাকৃতিক রাসায়নিক পদার্থ সেহেতু এটি পরিবেশের জন্য ক্ষতিকারক নয়।

খ) দু'টি রাসায়নিক পদার্থ, ই-১১-হেক্সডেসিনাইল এসিটেট ও ই-১১-হেক্সাডেসিন-১ ওএল ১০:১ হতে ১০০:১ অনুপাতে মিশ্রিত করে এটি তৈরী করা হয়। এই ফেরোমন শুধু বেগুনের ডগা ও ফল ছিদ্রকারী পুরুষ পোকা আকৃষ্ট করতে সক্ষম।

গ) সূত্র ছিদ্রসহ প্লাস্টিকের ছোট টিউবে ২-৩ মিলিগ্রাম পরিমাণ ফেরোমন ভরে টিউবটি একটি পোকা ধরা ফাঁদে ঝুলিয়ে রাখলে তা ৬-৮ সপ্তাহ পর্যন্ত পুরুষ মথ আকৃষ্ট করতে পারে, যা পরবর্তীতে সংগ্রহ করে ধ্বংস করা হয়। সেক্স ফেরোমনের টিউবটি ঝুলিয়ে রেখে আকৃষ্ট পুরুষ পোকাকে আটকানো ও পরবর্তীতে মেরে ফেলার জন্য বিভিন্ন ধরণের পোকা ফাঁদ ব্যাবহার করা হয়ে থাকে।

ঘ) তিন লিটার পানি ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন ও ২২ সে.মি. লম্বা চার কোনাকৃতি বা গোলাকার একটি প্লাস্টিকের পাত্র দিয়ে এই ফাঁদ তৈরী করা যায়। পাত্রটির উভয় পার্শ্বে ১০-১২ সে.মি. উচ্চতা এবং নিচের দিকে ১০-১২ সে.মি. পরিমাণ অংশ ত্রিভুজাকারে কেটে ফেলতে হবে। পাত্রের তলা হতে কাটা অংশের নিচের দিক কমপক্ষে ৩-৪ সে.মি. পর্যন্ত সাবান মিশ্রিত পানি ভারে রাখতে হবে। প্লাস্টিকের পাত্রের মুখ হবে সেক্স ফেরোমনসহ প্লাস্টিক টিউবটি একটি সরু তার দিয়ে এমনভাবে ঝুলিয়ে রাখতে হবে যেন টিউবটি পানি হতে মাত্র ২-৩ সে.মি. উপরে তাকে।

ঙ) সেক্স ফেরোমনের গন্ধে আকৃষ্ট হয়ে পুরুষ মথ প্লাস্টিক পাত্রের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে ও ফেরোমনসহ টিউবটির চারিদেকে উড়তে যেয়ে সাবান পানিতে পড়ে আটকে যায় এবং পরবর্তীতে মারা পড়ে।

চ) খেয়াল রাখতে হবে যেন পাত্রের তলায় রক্ষিত সাবান পানি শুকিয়ে না যায়। যত্ন সহকারে ব্যবহার করলে এধরণের প্লাস্টিক পাত্রের ফাঁদ ৩-৪ মৌসুম পর্যন্ত ব্যবহার করা যায়।

ছ) সেক্স ফেরোমনে ভরা প্লাস্টিক টিউবটির মুখ সব সময়ই বন্ধ রাখতে হবে।

জ) বেগুনের চারা লাগানোর ৩-৪ সপ্তাহ হতে শুরু করে শেষ বার ফসল উত্তোলন পর্যন্ত ফেরোমনের ফাঁদ পেতে রাখা আবশ্যক।

ঝ) ফেরোমন ফাঁদ সাধারণত ১০ মি. দূরে দূরে এবং বেগুন গাছের ঠিক উপরে পাতা উচিত। বেগুন গাছ যত বড় হবে ফাঁদের উচ্চতাও সে অনুপাতে বাড়াতে হবে।

**ইদুঁর দমন**

ইদুঁর ধান গাছের কুশি কেটে দেয়, ধান পাকলে ধানের ছড়া কেটে মাটির নিচে সুড়ঙ্গ করে জমা রাখে।
ব্যবস্থাপনার জন্য যা করতে হবে:

- জমির আইল চিকন রাখতে হবে।
- ফাঁদ পেতে ইদুঁর দমন করতে হবে।
- বিষটোপ যেমন- জিংক ফসফাইড, ব্রডিকেকা বা ব্রমাডিওলন অথবা ফেকোমাফেন দিয়ে ইদুঁর দমন করা যায়।
- ইদুঁরের গর্তে এ্যালুমিনিয়াম ফসফাইড বড়ি দিয়ে গর্তের মুখ বন্ধ করে দিলে ইদুঁর মারা যায়।

## রাসায়নিকভাবে ফসলের রোগবালাই ও পোকামাকড় দমন

**বালাইনাশকের প্রয়োগবিধি**

পোকা-মাকড় ও রোগ-বালাইয়ের আক্রমণে বর্তমানে বাংলাদেশে সবজির শতকরা প্রায় ৩০ ভাগ নষ্ট হয়। এই মারাত্মক ক্ষতি থেকে ফসলকে রক্ষা করতে হলে বালাইনাশকের ব্যবহার অপরিহার্য। অন্যান্য পন্থায় পোকা-মাকড় ও রোগ-বালাইয়ের আক্রমণ কিছুটা কমানো গেলেও প্রকৃতপক্ষে বালাইনাশকের ব্যবহার ব্যতীত এসব ক্ষতিকারক বালাই থেকে ফসলকে সার্বিকভাবে রক্ষা করা সম্ভব নয়। তাই ফসল বাড়াতে বালাইনাশক এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তবে সঠিক বালাই-নাশক নির্বাচন, সঠিকভাবে প্রয়োগ এবং সর্বোপরি বালাইনাশক প্রয়োগকৃত ফসল ব্যবহার প্রভৃতি বিষয়ে বিশেষ নজর রাখা প্রয়োজন।

**বালাইনাশকসমূহ**

বালাইনাশকগুলোকে প্রধানত: দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যথা: (১) কীটনাশক ও (২) ছত্রাক-নাশক। এখানে এগুলোকে স্বতন্ত্রভাবে উপস্থাপিত করা হল।

**ছত্রাক-নাশক**

বিভিন্ন সবজিতে নানা প্রকার রোগ-বালাই দেখা যায়। এসব রোগ-বালাই নানা প্রকার জীবাণু, যথা ছত্রাক, ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাস, মাইকোপ্লাজমা, নিমাটোড প্রভৃতি দ্বারা হয়ে থাকে। এসব রোগ জীবাণু বীজের মধ্যে বা গায়ে থাকতে পারে এবং মাটিতে, গাছে বা গাছের পরিত্যক্ত অংশে বেঁচে থেকে গাছকে আক্রমণ করতে পারে। এসব রোগ জীবাণু বীজ নষ্ট করা বা চারা গাছ মেরে ফেলা অথবা বাড়ন্ত গাছ ও ফুল ফল আক্রমণ করে ফলনের সমূহ ক্ষতি সাধন করে থাকে। এসব জীবাণু দমনের প্রকৃষ্ট পন্থা ছত্রাক-নাশক ব্যবহার করা।
ছত্রাকনাশক তিনটি পন্থায় ব্যবহার করা হয় এবং তা হলো: (১) বীজ শোধন, (২) মাটি শোধন, (৩) চারা বা বাড়ন্ত গাছে প্রয়োগ।

একই জীবাণু বিভিন্ন সবজিকে আক্রমণ করতে পারে। আবার কোন কোন জীবাণু বিশেষ বিশেষ সবজিকে আক্রমণ করে থাকে। রোগের লক্ষণ ও দায়ীকৃত জীবাণুকে গণ্য করে সবজির প্রধান প্রধান রোগগুলিকে সাতটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। এ রোগগুলি দমনের কার্যকরী ছত্রাক-নাশকের তালিকা নিম্নে দেয়া হল।

**সারণী:** সবজির রোগ-বালাই দমনের কার্যকরী ছত্রাকনাশক সমূহ

| রোগের নাম | ছত্রাকনাশকের নাম | প্রয়োগমাত্রা (প্রতি লিটার পানিতে) |
|---|---|---|
| ১। সবজির নাবি ধ্বসা রোগ | ১। রিডোমিল এম, জেড-৭২<br>২। ডায়থেন এম-৪৫<br>৩। নেমিস্পোর<br>৪। মেনেক্স | ২ গ্রাম<br>২ গ্রাম<br>২ গ্রাম<br>২ মিলি. |
| ২। অলটারনারিয়া জনিত পাতার দাগ রোগ | ১। রুভরাল ৫০ ডব্লিউ,পি | ২ গ্রাম |
| ৩। কুমড়া জাতীয় গাছের পাউডারী মিলডিউ রোগ | ১। থিওভিট ৮০ ডব্লিউ, পি<br>২। টিল্ট ২৫০ ইসি | ২ গ্রাম<br>০.৫ মিলি. |
| ৪। সীম, বরবটি, পুঁইশাক প্রভৃতির ছারাকোসপোরা জনিত পাতা দাগ রোগ | ১। বেভিসটিন | ১ গ্রাম |
| ৫। সীম, মরিচের এনথ্রাকনোজ জনিত রোগ | ১। টপসিন এম | ২ গ্রাম |
| ৬। বীজ ও মাটি বাহিত রোগ | ১। বেভিসটিন (প্রতি কেজি বীজের জন্য) | ১ গ্রাম |
| ৭। নিমাটোড জনিত শিকড়ে গিট রোগ | ১। ফুরাডান ৩ জি | ৪০-৬০ কেজি প্রতি হেক্টরে |

## ছত্রাকনাশক ব্যবহারের গুরুত্ব ও বৈশিষ্ট্য

রোগ জীবানুর আক্রমণে প্রাথমিক অবস্থায় সাধারণত: কোন লক্ষণ চোখে পড়ে না। রোগের মাত্রা যখন বেশী হয়, তখনই রোগ সচরাচর চোখে পড়ে। এখানেই পোকা মাকড়ের আক্রমণ থেকে রোগের আক্রমণের তফাৎ। ফলে বেশীর ভাগ কৃষকই রোগের আক্রমণের প্রাথমিক অবস্থা বুঝতে পারে না। পরবর্তীতে যখন তার নজরে আসে, তখন ফসলের অনেক ক্ষতি হয়ে যায়। তাছাড়া রোগের আক্রমণ প্রাথমিক অবস্থায় দমন করতে না পারলে, প্রকৃতপক্ষে ফসলকে রক্ষা করা যায় না। তাই রোগ দমনে বীজ শোধন, মাটি শোধন বা রোগাক্রমনের অনুকুল আবহাওয়ার প্রতিষেধক হিসাবে ছত্রাকনাশক প্রয়োগ খুবই গুরুত্ব বহন করে। তবে দুএকটি গাছে রোগ দেখা দিলেও ছত্রাকনাশক ব্যাবহার করে ভাল ফল পাওয়া যায়।

## বালাই নাশকের ব্যবহারে সাবধানতা অবলম্বনে নিয়মাবলী

আমাদের সর্বদা মনে রাখতে হবে যে, বালাইনাশক একটি বিষাক্ত পদার্থ যার সাহায্যে পাখী, পোকা-মাকড়, কৃমি, ঘাস, ছত্রাক প্রভৃতি খুব সফলতার সাথে দমন করা যায়। তাই এটা যেমন গাছপালার জন্য ক্ষতিকর তেমনি সমস্ত প্রাণী জগতের জন্য ক্ষতিকর। সেজন্য এর প্রয়োগের ক্ষেত্রে অসাবধানতা অবলম্বন করলে, অথবা বেশী পরিমাণে ব্যবহার করলে, আবহাওয়া দূষিত হওয়াসহ পশু-পাখি, উপকারী কীট-পতংগ ও মানুষের স্বস্থ্যের গুরুতর ক্ষতি করে। নিম্নে বালাইনাশক ব্যবহারে যাতে মানুষের স্বাস্থ্যের ক্ষতি এবং আবহাওয়া দূষিত না হয়, তার কতকগুলো দিক সম্বন্ধে আলোচনা করা হলো:-

মানুষের বা ব্যবহারকারীর স্বাস্থ্য বিষয়ক সাবধানতা

১) ঔষধ কেনার পরই, প্যাকেটের গায়ে যা লিখা থাকে তা যত্ন সহকারে পড়া এবং সে অনুযায়ী কাজ করা।

২) যে ব্যক্তি ঔষধ প্রয়োগ করবে, তার ঔষধ এবং প্রয়োগবিধি সম্পর্কে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা বা প্রশিক্ষণ থাকতে হবে।

৩) ঔষধ ব্যবহারের সময় অসর্তকতা বা অন্য কোন কারণে ঔষধ হাতে বা শরীরের যে কোন স্থানে লাগতে পারে। তাই তাড়াতাড়ি ধুয়ে ফেলার জন্য পরিষ্কার পানি, সাবান, শরীর মোছার কাপড়, প্রভৃতি প্রস্তুত রাখতে হবে।

৪) গর্ভবতী এবং ছোট বাচ্চার মায়েদের বালাইনাশক প্রয়োগ করা বা ধরা উচিত নহে।

৫) বালাইনাশক রাখার পাত্রে যাতে সর্বদা লেবেল থাকে এবং খাবার ঔষধ ইত্যাদির মধ্যে না রাখা হয়, তার দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখতে হবে। পাত্রটি যাতে বাচ্চাদের নাগালের বাইরে থাকে, তার প্রতিও লক্ষ্য রাখতে হবে। এজন্য এগুলো তালাবদ্ধ অবস্থায় রাখলে ভাল হয়। শোয়ার ঘরে বা খাবার ঘরে এসব পাত্র রাখা কিছুতেই উচিত নয়।

৬) বালাইনাশক মিশানোর সময় পরিষ্কার আলোবাতাস যুক্ত স্থান বেছে নিতে হবে। প্যাকেট দাঁত দিয়ে কখনো খোলা উচিত নয়, এর জন্য চাকু ব্যবহার করতে হবে।

৭) বালাইনাশক প্রয়োগের সময় মুখ, নাক, চোখের প্রতি যত্ন নিতে হবে। এজন্য বিশেষ পোষাক ব্যবহার করতে হবে। মনে রাখতে হবে যে, মাথার সম্মুখ অংশ, কান ও কোমড়ের নীচের অংশ দিয়ে খুব সহজেই বিষ শরীরের ভিতর প্রবেশ করতে পারে। হাতের তালু এবং পায়ের পাতা দিয়ে ভিতরে ঢোকার সম্ভাবনা কম থাকে।

৮) কোন কারণে বালাইনাশক শরীরে প্রবেশ করলে, তখনি ডাক্তারের পরামর্শ নিতে হবে।

পোকা-মাকড় ও রোগ-বালাই দমনে বালাইনাশকের ব্যবহার অপরিহার্য। তবে সঠিক বালাইনাশক, উপযুক্ত সময়ে ও সঠিকভাবে প্রয়োগ করতে হবে। যত্রযত্রভাবে বালাইনাশক ব্যবহার করলে, উপকারের বদলে ক্ষতির সম্ভাবনাই বেশী থাকবে। বালাইনাশক ব্যবহারে সর্তকতা অবশ্যই মেনে চলতে হবে। বালাইনাশক ব্যবহারের মাধ্যমে পোকা-মাকড় ও রোগ-বালাই দমন করে ফসলের ফলন বাড়িয়ে স্বয়ং-সম্পূর্ণতা অর্জন করা সহজ হতে পারে।

**ধান ক্ষেতের পোকামাকড় এর নাম, ক্ষতির ধরন ও প্রতিকার**

| পোকার নাম | ক্ষতির ধরন | প্রতিকার |
|---|---|---|
| মাজরা পোকা | মাজরা পেকার আক্রমণ হলে মরা ডিগ এবং ফুল ফোটার পর সাদা শিষ বের হয়। | • আলোক ফাঁদের সাহায্যে পোকা (মথ) সংগ্রহ করে দমন করুন।<br>• ডালপালা পুঁতে পোকাখেকো পাখির সাহায্য নিন।<br>• পরজীবী (বন্ধু) পোকা মাজরা পোকার ডিম নষ্ট করে; সুতরাং যথাসম্ভব কীটনাশক প্রয়োগ বিলম্বিত করুন।<br>• জমিতে শতকরা ১০-১৫ ভাগ মরা ডিগ অথবা শতকরা ৫ ভাগ সাদা শিষ দেখা দিলে অনুমোদিত কীটনাশক প্রয়োগ করুন।<br>• আমন ধান কাটার পর চাষ দিয়ে নাড়া মাটিতে মিশিয়ে বা পুড়িয়ে ফেলুন। |
| নলিমাছি বা গলমাছি | এ মাছির কীড়া ধানগাছের বাড়ন্ত কুশিতে আক্রমণ করে এবং ওই কুশি পেঁয়াজ পাতার মতো হয়ে যায়। ফলে কুশিতে আর শিষ হয় না। | • রোপণের পর নিয়মিতভাবে জমি পর্যবেক্ষণ করুন।<br>• আলোক-ফাঁদ ব্যবহার করে পূর্ণবয়স্ক পোকা দমন করুন।<br>• জমিতে শতকরা ৫ ভাগ পেঁয়াজ পাতার লক্ষণ দেখা গেলে কীটনাশক ব্যবহার করুন। |
| পামরি পোকা | পামরি পোকার কীড়া পাতার ভেতরে সুড়ঙ্গ করে সবুজ অংশ খায়, আর পূর্ণবয়স্ক পোকা পাতার সবুজ অংশ কুরে কুরে খায়। এভাবে খাওয়ার ফলে পাতা সাদা দেখায়। | • হাতজাল বা মশারির কাপড় দিয়ে পোকা ধরে মেরে ফেলুন।<br>• জমিতে শতকরা ৩৫ ভাগ পাতার ক্ষতি হলে অথবা প্রতি গোছায় চারটি পূর্ণ বয়স্ক পোকা অথবা প্রতি কুশীতে ৫টি কীড়া থাকলে কীটনাশক ব্যবহার করুন। |
| পাতামোড়ানো পোকা | পাতামোড়ানো পোকার কীড়া গাছের পাতা লম্বালম্বিভাবে মুড়িয়ে পাতার ভিতরের সবুজ অংশ খায়। খুব বেশি ক্ষতি করলে পাতা পুড়ে যাওয়ার মতো দেখায়। | • আলোক-ফাঁদের সাহায্যে বয়স্ক পোকা (মথ) দমন করুন।<br>• ক্ষেতে ডালপালা পুঁতে পোকাখেকো পাখি বসার ব্যবস্থা নিন।<br>• গাছে থোড় আসার সময় বা ঠিক তার আগে যদি শতকরা ২৫ ভাগ পাতা ক্ষতিগ্রস্ত হয় তবে কীটনাশক প্রয়োগ করুন। |

| পোকার নাম | ক্ষতির ধরন | প্রতিকার |
|---|---|---|
| চুঙ্গি পোকা 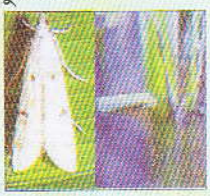 | চুঙ্গি পোকা পাতার উপরের অংশ কেটে ছোট ছোট চুঙ্গি তৈরী করে ভেতরে থাকে। আক্রান্ত ক্ষেতে গাছের পাতা সাদা দেখায় এবং পাতার উপরের অংশ কাটা থাকে। দিনের বেলায় চুঙ্গিগুলো পানিতে ভাসতে থাকে। | • আলোক-ফাঁদের সাহায্যে মথ দমন করুন।<br>• পানি থেকে হাতজাল দিয়ে চুঙ্গিসহ কীড়া সংগ্রহ করে ধবংস করুন।<br>• আক্রান্ত জমির পানি সরিয়ে দিন এবং মাটি শুকিয়ে নিন।<br>• জমিতে শতকরা ২৫ ভাগ পাতা ক্ষতিগ্রস্ত হলে কীটনাশক ব্যবহার করুন। |
| লেদা পোকা 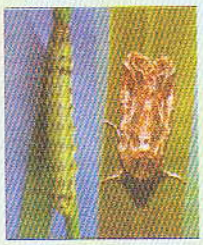 | এ পোকার কীড়া পাতার পাশ থেকে কেটে এমনভাবে খায় যে কেবল ধানগাছের কান্ড অবশিষ্ট থাকে। সাধারণত শুকনো জমিতে এ পোকার আক্রমণের আশংকা বেশি। | • ধান কাটার পর জমি চাষ দিয়ে রাখুন অথবা নাড়া পুড়িয়ে ফেলুন।<br>• আলোক-ফাঁদের সাহায্যে মথ দমন করুন।<br>• ডালপালা পুঁতে পোকাখেকো পাখি বসার সুযোগ করে দিন।<br>• জমিতে ২৫ ভাগ পাতা ক্ষতিগ্রস্ত হলে কীটনাশক ব্যবহার করুন। |
| ঘাসফড়িং | ঘাসফড়িং পাতার পাশ থেকে শিরা পর্যন্ত খায়। জমিতে অধিক সংখ্যায় আক্রমণ করলে এদেরকে পঙ্গপাল বলা হয়। | • হাতজাল দিয়ে পোকা ধরে মেরে ফেলুন।<br>• ডালপালা পুঁতে পোকাখেকো পাখি বসার সুযোগ করে দিন।<br>• জমিতে শতকরা ২৫ ভাগ পাতা আক্রান্ত হলে কীটনাশক প্রয়োগ করুন। |
| লম্বাশুঁড় উরচুঙ্গা 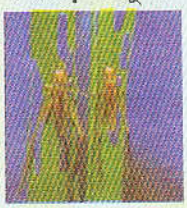 | এ পোকা ধানের পাতা এমনভাবে খায় যে পাতার কিনারা ও শিরা বাকি থাকে। ক্ষতিগ্রস্ত পাতা ঝাঁঝরা হয়ে যায়। | • ডালপালা পুঁতে পোকাখেকো পাখি বসার সুযোগ করে দিন।<br>• আলোক-ফাঁদের সাহায্যে পূর্ণবয়স্ক উরচুঙ্গ দমন করুন।<br>• জমিতে শতকরা ২৫ ভাগ পাতা ক্ষতিগ্রস্ত হলে কীটনাশক ব্যবহার করুন। |
| সবুজ পাতাফড়িং | সবুজ পাতাফড়িং ধানের পাতার রস শুষে খায়। ফলে গাছের বৃদ্ধি কমে যায় ও গাছ খাটো হয়ে যায়। এ পোকা টুংরো ভাইরাস রোগ ছড়িয়ে সবচেয়ে বেশি ক্ষতি করে। | • আলোক-ফাঁদের সাহায্যে পোকা দমন করুন।<br>• হাতজালের প্রতি টানে যদি একটি সবুজ পাতাফড়িং পাওয়া যায় এবং আশপাশে টুংরো রোগাক্রান্ত ধানগাছ থাকে, তাহলে বীজতলায় বা জমিতে উপযুক্ত কীটনাশক ব্যবহার করুন। |
| বাদামি গাছফড়িং | বাদামি গাছফড়িং ধানগাছের গোড়ায় বসে রস শুষে খায়। ফলে গাছ পুড়ে যাওয়ার রং ধারণ করে মরে যায়, তখন বলা হয় হপার বার্ন। | • নিয়মিত গাছের গোড়া পর্যবেক্ষণ করুন।<br>• আলোক-ফাঁদের সাহায্যে পোকা দমন করুন।<br>• পোকা দেখা মাত্র জমি থেকে পানি সরিয়ে শুকনো রাখুন।<br>• তিন সারি পর পর দু'সারির গাছ হেলে দিয়ে আলো-বাতাস প্রবেশের ব্যবস্থা করুন।<br>• চারা ২০ x ২০ বা ২৫ x ১৫ সে.মি. দূরত্বে রোপণ করুন।<br>• শতকরা ৫০ ভাগ গাছে ৪টি গর্ভবতী বা ১০টি বাচ্চা পোকা দেখা দিলে কীটনাশক ব্যবহার করুন।<br>• কীটনাশক অবশ্যই গাছের গোড়ায় প্রয়োগ করতে হবে। |

| পোকার নাম | ক্ষতির ধরন | প্রতিকার |
|---|---|---|
| সাদা-পিঠ গাছফড়িং | বাদামি গাছফড়িংয়ের মতো সাদা-পিঠ গাছফড়িংও ধানগাছের গোড়ায় বসে রস শুষে খায়। এ পোকার আক্রমণেও হপার বার্ন হয়। | • বাদামি গাছফড়িংয়ের মতো এ পোকা দমনের জন্য একই ব্যবস্থা নিন। |
| থ্রিপস্ 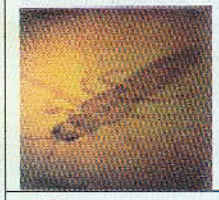 | ধানের চারা এবং রোপণের পর কুশী অবস্থায় এ পোকার আক্রমণ দেখা যায়। থ্রিপস্ পাতায় ক্ষত সৃষ্টি করে রস শুষে খায়। ফলে পাতা লম্বালম্বিভাবে মুড়ে যায়। | • বীজ তলায় / জমিতে পানি দিয়ে ইউরিয়া সার উপরি-প্রয়োগ করুন।<br>• আক্রমণ বেশি হলে কীটনাশক প্রয়োগ করুন। |
| গান্ধি পোকা | গান্ধি পোকা ধানের দানায় দুধ সৃষ্টির সময় আক্রমন করে। বয়স্ক গান্ধি পোকার গা থেকে বিশ্রী গন্ধ বের হয় এবং ক্ষেতে গেলেই তা বোঝা যায়। | • আলোক-ফাঁদের সাহায্য নিন।<br>• প্রতি গোছায় ২-৩টি গান্ধি পোকা দেখা গেলে কীটনাশক প্রয়োগ করুন।<br>• কীটনাশক বিকেল বেলায় প্রয়োগ করতে হবে। |
| শিষ কাটা লেদা পোকা | এ পোকার কীড়া পাতার পাশ থেকে কেটে খায় এবং শিষের গোড়া কেটে দেয়। কীড়াগুলো রাতে ধান ক্ষেতে আক্রমণ করে। | • নাড়া পুড়িয়ে ফেলুন।<br>• ডালপালা পুঁতে পোকাখেকো পাখি বসার সুযোগ করে দিন।<br>• জমিতে সেচ প্রদান করে কীড়া দমন করা যায়। |

**স্মারণী: ধানের অনিষ্টকারী পোকা দমনের জন্য অনুমোদিত কীটনাশক ও প্রয়োগ মাত্রা।**

| কীটনাশক | প্রয়োগমাত্রা / হেক্টরে |
|---|---|
| **মাজরা পোকা ও গলমাছি** | |
| ডায়াজিনন (৬০ তরল) | ১.৭০ লিটার |
| কারটাপ (৫০ পাউডার) | ১.৪০ কেজি |
| ডায়জিনন (১০ দানাদার) | ১৬.৮০ কেজি |
| কার্বোফুরান (৩ দানাদার) | ১৬.৮০ কেজি |
| **পামরি পোকা** | |
| ডাইমোথোয়েট (৪০ তরল) | ১.১২ লিটার |
| ক্লোরপাইরিফস (২০ তরল) | ১.০০ লিটার |
| **পাতামোড়ানো পোকা ও চুঙ্গি পোকা** | |
| ডাইমেথোয়েট (৪০ তরল) | ১.০০ লিটার |
| ডায়াজিনন (১০ দানাদার) | ১৬.৮০ কেজি |

| | |
|---|---|
| **ঘাসফড়িং ও লম্বাশুঁড় উরচুঙ্গা** | |
| কুইনলফস (২৫ তরল) | ১.৫০ লিটার |
| **শিষকাটা লেদাপোকা ও লেদাপোকা** | |
| কারবারিল (৮৫ পাউডার) | ১.৭০ কেজি |
| বাদামি গাছফড়িং সাদা-পিঠ গাছফড়িং ও ছাতরা পোকা | |
| কার্বোফুরান (৩ দানাদার) | ১৬.৮০ কেজি |
| **শুধু বাদামি গাছফড়িং এর জন্য** | |
| ডায়াজিনন (৬০ তরল) | ১.০০ লিটার |
| ডায়াজিনন (১০ দানাদার) | ১৬.৮০ কেজি |
| **সবুজ পাতাফড়িং, থ্রিপস্, গান্ধি পোকা** | |
| কুইনালফস (২৫ তরল) | ১.৫০ লিটার |
| কারবারিল (৮৫ পাউডার) | ১.৭০ কেজি |

## ধানের রোগ বালাই ও প্রতিকার

| রোগের নাম | ক্ষতির ধরন | প্রতিকার |
|---|---|---|
| টুংরো রোগ 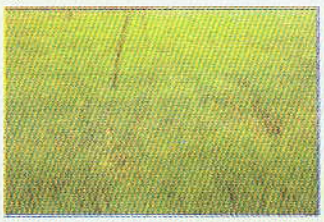 | টংরো একটি ভাইরাসজনিত রোগ। এটি সবুজ পাতাফড়িং দ্বারা সংক্রামিত হয়। চারা অবস্থা থেকে গাছে ফুল ফোটা পর্যন্ত সময়ে এ রোগ দেখা দিতে পারে। কচি পাতায় লম্বালম্বি শিরা বরাবর পর্যায়ক্রমে হালকা সবুজ ও হালকা হলদে রেখা দেখা যায়। পরে সমস্ত পাতার উপর দিক গাঢ় হলদে রঙের হয় এবং আক্রান্ত পাতা একটু মুচড়ে যায়। গাছের বাড় - বাড়তি ও কুশি কমে যায়। ফলে আক্রান্ত গাছ সুস্থ গাছের তুলনায় খাটো হয়। প্রথমদিকে বিক্ষিপ্তভাবে দু-একটি গোছায় রোগটি দেখা যায় এবং ধীরে ধীরে আশপাশের গোছায় ছড়িয়ে পড়ে। | • আলোক-ফাঁদ ব্যবহার করে বাহক পোকা সবুজ পাতাফড়িং মেরে ফেলুন।<br>• রোগের প্রাথমিক অবস্থায় রোগাক্রান্ত গাছ তুলে ফেলে মাটিতে পুঁতে ফেলুন।<br>• সবুজ পাতাফড়িং দমনে কীটনাশক প্রয়োগ করুন। |
| পাতাপোড়া রোগ | পাতাপোড়া একটি ব্যাক্টেরিয়াজনিত রোগ। চারা অবস্থায় পাতাপোড়া রোগ হলে সম্পূর্ণ গোছা পচে যায় এবং তাকে কৃসেক বলে। এ রোগ বোঝার জন্য রোগাক্রান্ত কান্ডের গোড়ায় চাপ দিলে পুঁজের মতো আঠালো ও দুর্গন্ধযুক্ত রস বের হয়।<br>বয়স্ক গাছে থোড় অবস্থা থেকে পাতাপোড়া রোগের লক্ষণ দেখা যায়। প্রথমে পাতার অগ্রভাগ থেকে কিনারা বরাবর পোড়া লক্ষণ দেখা দেয়। পরে পাতাটা শুকনো খড়ের রঙ ধারণ করে এবং ক্রমশ সম্পূর্ণ পাতাটাই মরে শুকিয়ে যায়। পাতা নষ্টকারী কোন পোকার আক্রমণ ও পাতায় পাতায় ঘর্ষণের ফলে সৃষ্ট ক্ষত দিয়ে এর জীবাণু পাতার ভেতরে ঢুকে পড়ে। অনবরত বৃষ্টি ও ঝড়ো হাওয়া এ রোগ বিস্তারে সাহায্য করে। | • সুষম মাত্রায় সার ব্যবহার করুন।<br>• ঝড়-বৃষ্টি এবং রোগ দেখা দেয়ার পর ইউরিয়া সারের উপরি-প্রয়োগ বন্ধ রাখুন।<br>• কৃসেক হলে আক্রান্ত জমির পানি শুকিয়ে ৭-১০ দিন পর আবার সেচ দিন।<br>• রোগাক্রান্ত জমির ফসল কাটার পর নাড়া পুড়িয়ে ফেলুন। |

| রোগের নাম | ক্ষতির ধরন | প্রতিকার |
|---|---|---|
| উফরা রোগ | উফরা ধানের কৃমিজনিত রোগ। এ কৃমি এত ছোট যে তা খালি চোখে দেখা যায় না। এরা ধান গাছের কচি পাতা ও খোলের সংযোগস্থলে আক্রমণ করে। কৃমি গাছের রস শোষণ করায় প্রথমে পাতার গোড়ায় ছিটে-ফোঁটা সাদা দাগ দেখা যায়। ক্রমান্বয়ে সে দাগ বাদামি রঙের হয়ে পুরো আগাটাই শুকিয়ে মরে যায়। আক্রমণের প্রকোপ বেশি হলে গাছের বাড়-বাড়তি কম হয়। থোড় অবস্থায় আক্রমণ করলে থোড়ের মধ্যে শিষ মোচড়ানো অবস্থায় থেকে যায়। ফলে শিষ বের হতে পারে না। উফরা রোগের কৃমি পরিত্যক্ত নাড়া, খড়কুটা এবং ঘাসে, এমনকি মাটিতে কুন্ডলী পাকিয়ে বেঁচে থাকে। | • রোগ দেখা দিলে হেক্টরপ্রতি ২০ কেজি হারে ফুরাডান ৫জি অথবা কিউরেটার ৫জি প্রয়োগ করুন।<br>• রোগাক্রান্ত জমির ফসল কাটার পর নাড়া পুড়িয়ে ফেলুন।<br>• সম্ভব হলে জমি চাষ দিয়ে ১৫-২০ দিন ফেলে রাখুন।<br>• আক্রান্ত জমিতে বীজতলা করবেন না।<br>• ধানের পরে ধান আবাদ না করে অন্য ফসলের চাষ করুন। |
| ব্লাস্ট রোগ | ব্লাস্ট একটি ছত্রাকজনিত রোগ। এ রোগ পাতায় হলে পাতা ব্লাস্ট, গিটে হলে গিট বাস্ট ও শিষে হলে শিষ ব্লাস্ট বলা হয়। পাতা ব্লাস্ট পাতায় ছোট ছোট ডিম্বাকৃতি দাগ সৃষ্টি করে। আস্তে আস্তে দাগ বড় হয়ে দু'প্রান্ত লম্বা হয়ে চোখের আকৃতি ধারণ করে। দাগের চার ধারে বাদামি ও মাঝের অংশ সাদা-ছাই বর্ণ। অনেকগুলো দাগ একত্রে মিশে গিয়ে পুরো পাতা মরে যায়। এ রোগের কারণে জমির সমস্ত ধান নষ্ট হয়ে যেতে পারে। এ রোগ বোরো মৌসুমে বেশি হয়। গিট ব্লাস্ট এবং শিষ বাস্ট হলে গিট ও শিষ ভেঙ্গে পড়ে এবং ধান চিটা হয়ে যায়। | • জমিতে পানি ধরে রাখুন।<br>• রোগমুক্ত জমি থেকে বীজ সংগ্রহ করুন।<br>• সুষম মাত্রায় সার ব্যবহার করুন। আক্রান্ত জমিতে ইউরিয়া সারের উপরি-প্রয়োগ বন্ধ রাখুন।<br>• প্রতি হেক্টরে ৮০০ মিলিলিটার হিনোসান অথবা ২.৫ কেজি হোমাই বা টপসিন-এম অথবা ৪০০ গ্রাম টুপার বা জিল প্রয়োগ করুন। |
| খোলপোড়া রোগ | খোলপোড়া একটি ছত্রাকজনিত রোগ। ধানগাছের কুশি গজানোর সময় হতে রোগটি দেখা যায়। প্রথমে খোলে ধূসর রঙের জলছাপের মতো দাগ পড়ে এবং তা আস্তে আস্তে বড় হয়ে সমস্ত খোলে ও পাতায় অনেকটা গোখরা সাপের চামড়ার মতো চক্কর | • রোগ দেখা দিলে জমির পানি শুকিয়ে ফেলুন।<br>• জমিতে সুষম মাত্রায় সার ব্যবহার করুন।<br>• খাটো গাছের জাতের পরিবর্তে লম্বাটে জাতের ধান চাষ করুন। |

| | | |
|---|---|---|
| | দেখা যায়। গরম ও আর্দ্র আবহাওয়ায় রোগটি বেশি হয়। তাছাড়া বেশী মাত্রায় ইউরিয়া ব্যবহার ও ঘন করে চারা রোপণ এ রোগ বিস্তারে সহায়তা করে। | • রোগাক্রান্ত জমির ধান কাটার পর নাড়া পুড়িয়ে ফেলুন।<br>• জমিতে শেষ মই দেয়ার পর পানিতে ভাসমান আবর্জনা চট বা কাপড় দিয়ে টেনে আইলের উপর তুলে ফেলুন। এতে শতকরা প্রায় ৫০ ভাগ রোগ সংক্রমণ কমানো সম্ভব।<br>• রোগের লক্ষণ দেখামাত্র প্রতি হেক্টরে ৫০০ মিলি ফলিকুল বা কয়ান্টাফ প্রয়োগ করুন অথবা প্রতি হেক্টরে ১ লিটার প্রপিকোনাজল অথবা কারবেনডাজিম জাতীয় ছত্রাকনাশক প্রয়োগ করুন। |
| বাকানি রোগ<br> | এটি একটি ছত্রাকজনিত রোগ। এ ছত্রাক জিবেরিলিন হরমোন নি:সরণ করার কারণে আক্রান্ত গাছ দ্রুত বেড়ে অন্য গাছের তুলনায় লম্বা ও লিকলিকে হয়ে যায়। ধীরে ধীরে আক্রান্ত গাছ মরে যায়। | • রোগাক্রান্ত গাছ তুলে ফেলূন।<br>• সুস্থ গোছা থেকে কুশি এনে ওই স্থানে রোপণ করুন।<br>• এ রোগ বীজবাহিত। তাই বীজ শোধন করতে পারলে ভাল হয়। এ জন্য ব্যাভিস্টিন/নোইন/হেডাজিম/ টপসির প্লাস / সানফানেট নামক ওষুধের যে কোনটি তিন গ্রাম ওষুধ এক লিটার পানিতে মিশিয়ে এক কেজি বীজ সারা রাত ভিজিয়ে রাখলে বীজ শোধন হয়। |
| লক্ষীর গু<br> | এটি একটি ছত্রাকজনিত রোগ। ধান পাকার সময় এ রোগ দেখা যায়। ছত্রাক ধানের বাড়ন্ত চালকে নষ্ট করে বড় গুটিকা সৃষ্টি করে। গুটিকার ভিতরের অংশ হলদে-কমলা রঙ এবং বহিরাবরণ সবুজ যা আস্তে আস্তে কালো হয়ে যায়। | • এ রোগ ব্যবস্থাপনার সবচেয়ে ভাল উপায় হলো রোগাক্রান্ত শিষ তুলে ফেলা।<br>• এ রোগে আক্রান্ত হলে বীজ রাখা যাবে না। |
| পাতা লালচে রেখা রোগ<br> | এটি একটি ব্যাকটেরিয়াজনিত রোগ। এ ব্যাকটেরিয়া ক্ষত বা পাতার কোষের ছিদ্র পথে প্রবেশ করে এবং শিরার মধ্যবর্তী স্থানে সরু রেখার জন্ম দেয়। আস্তে আস্তে রেখা বড় হয়ে লালচে রঙ ধারণ করে। | • এ রোগ ব্যবস্থাপনার জন্য আক্রান্ত জমি থেকে বীজ সংগ্রহ করা হতে বিরত থাকা এবং নাড়া পুড়িয়ে ফেলা উচিত। |

### শাক-সবজির রোগ-বালাই দমন কৌশল

শাক-সবজি উৎপাদনের বিভিন্ন পর্যায়ে নানা প্রকার রোগাক্রমনে এদের মারাত্মক ক্ষতি হতে পারে। আর ছত্রাক, ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাস ও কৃমি জাতীয় অনুজীবগুলো সবজিতে রোগ সৃষ্টি করে। রোগের ফলে সবজি গাছের স্বাভাবিক বৃদ্ধি বাধাপ্রাপ্ত হয়, পাতা ঝরে পড়ে যায়, ফলন ও গুণগত মান নষ্ট হয়ে যেতে পারে, এমন কি আক্রান্ত গাছ মারা যেতে পারে। তাই উন্নতমানের শাক-সবজি উৎপাদনকল্পে এসব রোগ-বালাই দমন করা একান্ত আবশ্যক।

### রোগমুক্ত শাক-সবজি উৎপাদনের মূলনীতিসমূহ

নিম্নলিখিত মূলনীতিগুলো অনুসরণের মাধ্যমে রোগমুক্ত, সুস্থ ও পুষ্টিকর শাক-সবজি উৎপাদন করা যায়।

### রোগ প্রতিরোধী জাত ব্যবহার

রোগ প্রতিরোধী জাতের শাক-সবজি উৎপন্ন করে রোগ নিয়ন্ত্রণ করা যায়। যে সব রোগ প্রতিরোধী ক্ষমতা থাকে, সেসব গাছে রোগ জীবাণু সহজে রোগ সৃষ্টি করতে পারে না, বা করলেও ক্ষতির পর্যায়ে পৌঁছায় না। রোগ দমনের ক্ষেত্রে এটি সবচেয়ে সহজ এবং স্বল্প ব্যয় ব্যবস্থা।

### রোগমুক্ত বীজ ও বংশবিস্তারের উপকরণের ব্যবহার

রোগ দমনের জন্য যতদূর সম্ভব রোগমুক্ত বীজ ও অযৌন অঙ্গজ উদ্ভিদদের অংশ চাষের জন্য ব্যবহার করা অত্যাবশ্যক।

### রাসায়নিক ঔষধ ও বালাইনাশকের ব্যবহার

গাছের উপর বিভিন্ন প্রকার বালাইনাশক/ছত্রাকনাশক প্রয়োগ করে, গাছকে রোগের আক্রমণ থেকে রক্ষা করা যায়। ছত্রাকনাশক গাছের উপর অথবা পাতার উপর একটি পাতলা আবরণের সৃষ্টি করে বা গাছের শরীর-কোষে প্রবেশ করে রোগজীবাণুকে প্রতিহত করে। ছত্রাকের বীজ কনার অঙ্কুরিত বীজনল এই ঔষধের সংস্পর্শে এসে বিষক্রিয়ায় মারা যায়। ছত্রাকনাশক ছত্রাকের দেহে বিষের ন্যায় কাজ করে।

### সঠিক সময়ে চাষ

সঠিক সময়ে বীজ বপন ও শাক-সবজি সংগ্রহের ফলে অনেক রোগ দমন করা যায়। এক্ষেত্রে, রোগ আক্রমণের উপযুক্ত আবহাওয়াকে এড়িয়ে ফসল লাগানো এবং কর্তনের ফলেই তা সম্ভব হয়।

### রোগাক্রান্ত গাছের ধ্বংশ সাধন

রোগাক্রান্ত গাছ থেকে পরবর্তী বৎসরে সুস্থ গাছে রোগ ছড়ায়। তাই আক্রান্ত গাছ দেখা দেয়ার সাথে সাথে তা ধ্বংশ করে রোগ নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয়।

### পর্যায়ক্রমে চাষ

প্রতি বছর একই জায়গায় একই ফসল লাগানোর ফলে জমিতে সেই গাছের রোগ জীবাণুর সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। পর্যায়ক্রমে চাষের মাধ্যমে এসব রোগ উৎপাদনকারী জীবাণুর সংখ্যা কমিয়ে সহজেই রোগ দমন করা যায়। একই ফসল প্রতি বছর একই জায়গায় না লাগিয়ে সুপরিকল্পিত উপায়ে অন্য ফসলের চাষ করা উচিত।

### স্বাস্থ্য ব্যবস্থা অনুসরণ

ফসল কেটে নেবার পর গাছের অবশিষ্টাংশে প্রচুর রোগ উৎপাদক জীবাণু সুপ্ত অবস্থায় থাকতে পারে। এক্ষেত্রে, ছত্রাক মাইসেলিয়াম, স্কেলেরেশিয়াম ইত্যাদি জমিতে ঝরে পড়া শুকনা পাতায় বহুদিন পর্যন্ত বেঁচে থাকে। সঠিক স্বাস্থ্য ব্যবস্থা অবলম্বনের মাধ্যমে জমিতে বিদ্যমান অবশিষ্ট অংশের উপর ও নীচ হতে রোগ জীবাণু পরিষ্কার করে তাদের নির্মূল করা যায়।

### গাছের ক্ষত চিকিৎসা

গাছের রোগ সৃষ্টিকারী অনেক জীবাণু যেমন- ছত্রাক, ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাস ইত্যাদি গাছের ক্ষতের মধ্য দিয়ে প্রবেশ করে রোগ সৃষ্টি করে। তাই কোনক্রমে অর্থাৎ ঝড়ে বা কৃষিতাত্তিক পরিচর্যার সময় যদি গাছে কোন ক্ষত সৃষ্টি হয়, তবে তা সাথে সাথে ঔষধ প্রয়োগের মাধ্যমে নিরাময় করতে হবে। যার ফলে আর কোন রোগ জীবাণু দ্বারা আক্রান্ত হবে না।

### রোগ-সৃষ্টিকারী বা রোগের বাহক দমন

অনেক রোগ সাধারণত: ভাইরাস, বিভিন্ন প্রকার শোষক পোকা ও মাটিতে বিদ্যমান ছত্রাক ও কৃমি দ্বারা বিস্তার লাভ করে। তাই রোগের এসব বাহক দমন করে সহজেই গাছকে রোগের আক্রামণের হাত থেকে রক্ষা করা যায়।

### রোগ-বালাই দমনের ব্যবস্থা

বিভিন্ন সবজিতে যেসব রোগ-বালাই দেখা যায়, সেগুলোকে দমনের জন্য নানাবিধ কার্যকরী ব্যবস্থা রয়েছে। এসব ব্যবস্থা অবলম্বন দ্বারা শাক-সবজির রোগসমূহকে প্রতিরোধ করা কিংবা দমন করা সম্ভব হতে পারে। নিম্নে উপস্থাপিত তালিকায় রোগের নাম, রোগের কারণ বা রোগ-উৎপাদক জীবাণুর নাম, আক্রান্ত ফসলের নাম, রোগের বিস্তার পদ্ধতি, রোগের অনুকুল পরিবেশ, রোগের লক্ষণ ও প্রতিকার ব্যবস্থা বর্ননা করা হল।

সারণীঃ বিভিন্ন সবজির রোগ ও তার দমন ব্যবস্থা

| ক্রমিক নং | রোগের নাম ও কারণ | আক্রান্ত ফসলের নাম | বিস্তার পদ্ধতি ও অনুকুল পরিবেশ | রোগের লক্ষণ | প্রতিকার ব্যবস্থা |
|---|---|---|---|---|---|
| ১। | কান্ডের গোড়া পচন | সীম, বেগুন, মটরশুটি | মাটি ও পানি। উষ্ণ ও আর্দ্র আবহাওয়ায় অর্থাৎ ২৪-২৭° সেঃ তাপমাত্রা ও ৭০-৮০% আর্দ্রতা | ছত্রাক মাটিতে থাকে এবং উষ্ণ ও আর্দ্র পরিবেশে কান্ডের ভূসংলগ্ন অংশ আক্রমণ করে। পরবর্তীতে চারাগাছ অথবা বয়স্ক গাছ মরে যায় | রোগ-প্রতিরোধী জাতের ব্যবহার, পর্যায়ক্রমে চাষ, মাটির অতিরিক্ত আর্দ্রতা পরিহার করা, ভিটাভাক্স-২০০ (০.২৫%) দিয়ে বীজ শোধন করা |
| ২। | লেট ব্লাইট বা নাবী ধ্বসা | আলু, টমেটো | গাছের আক্রান্ত অংশ, বীজ ও মাটি। আপেক্ষিক আর্দ্রতা ৯১-১০০% এবং ১২-১৩° সেঃ তাপমাত্রায় ছত্রাক দ্রুত বৃদ্ধি পায়, রোগ বৃদ্ধির জন্য ২১-২৪° সেঃ তাপমাত্রার দরকার | অনিয়মিত আকৃতির ভিজা বাদামী দাগ পড়ে। আর্দ্র আবহাওয়ায় দ্রুত বিস্তার লাভ করে এবং কয়েক দিনের মধ্যে গাছ ধ্বংশ হয়ে যায় | ফসলের পরিত্যক্ত অংশ পুড়ে ফেলা, নীরোগ বীজ ব্যবহার, রোগ দেখা দেয়ার সংগে সংগে রিডোমিল এম জেড-৭২ (প্রতি লিটার পানিতে ২ গ্রাম মিলিয়ে) ৭-১০ দিন অন্তর স্প্রে করা |
| ৩। | পাতার ব্লাইট রোগ | কচু, মুখিকচু | গাছের আক্রান্ত অংশ, বীজ ও মাটি। অধিক আর্দ্রতা (৯০-১০০%) এবং তাপমাত্রা ১৫-৩০° সেঃ | পাতার উপরিভাগে ভিজা, বাদামী রংয়ের দাগ দেখা যায়। অনেকগুলি দাগ একত্রে মিশে বড় দাগের সৃষ্টি হয় | লেট ব্লাইট রোগের অনুরূপ |
| ৪। | পাউডারী মিলডিউ | মিষ্টিকুমড়া, লাউ, শসা, মটরশুটি | আগাছা, বায়ু। শুকনা আবহাওয়ায় অর্থাৎ ৪৬% আর্দ্রতার রোগ বা ছত্রাক দ্রুত বিস্তার লাভ করে | গাছের পাতার উপর সাদা পাউডারের মত আবরন দেখা যায়, গাছ দুর্বল হয়ে ফলন কম হয় | আগাছা দুর করা, আক্রান্ত গাছে টিল্ট (০.৫%) বা ক্যারাথেন (০.১%) ১৫ দিন অন্তর স্প্রে করা, পরিমানমত সার ও সেচ প্রয়োগ করা |
| ৫। | অ্যানথ্রাকনোজ (পঁচন রোগ) | মটরশুটি, সীম, ডাঁটা, কুমড়া, বরবটি | বীজ, গাছের আক্রান্ত অংশ। জলাবদ্ধ অবস্থায় এবং ২৬-৩০ ডিগ্রী সেঃ তাপে রোগের প্রকোপ বেশী | পাতায় হলুদ দাগ দেখা যায় পরে বাদামী বা কালো হয়ে যায়। | ভিটাভেক্স ২০০ প্রতি কেজি বীজে ২ গ্রাম মিশিয়ে বীজ শোধন করে গায়ে বাদামী দাগ দেখা যায়। লাগানো, আক্রান্ত গাছে টপসিন এস (০.২%) বা টিল্ট ২৫০ ইসি/(০.৫%) ১০-১২ দিন অন্তর স্প্রে করা |

| ক্রমিক নং | রোগের নাম ও কারণ | আক্রান্ত ফসলের নাম | বিস্তার পদ্ধতি ও অনুকুল পরিবেশ | রোগের ক্ষণ | প্রতিকার ব্যবস্থা |
|---|---|---|---|---|---|
| ৬। | আর্লী ব্লাইট | টমেটো, আলু | গাছের আক্রান্ত অংশ, বীজ। অত্যধিক শিশির, ঘনঘন বৃষ্টিপাত এবং ২৪-২৯ ডিগ্রী সেঃ তাপমাত্রা | পাতায় বাদামী বা ধুসর বাদামী রঙের গোল চক্রাকার দাগ হয়। | ফসলের পরিত্যক্ত অংশ পুড়ে ফেলা, নীরোগ বীজ ব্যবহার করা, আক্রান্ত গাছে রোব্রাল (০.২%) অথবা ডাইথেন এম-৪৫ (০.২%) স্প্রে করা। |
| ৭। | ধ্বসা ধরা | বেগুন, ফুলকপি, বাঁধাকপি, টমেটো | মাটি তাপমাত্রা ২৮-৩১° সেঃ এ বেশী আক্রমণ হয়। পটাশ সারের স্বল্পতা ও নাইট্রোজেন সার আধিক হলে রোগ ছড়ায় | উষ্ণতায় রোগাক্রমণ বেশী হয়। | পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা রাখা, রোগ প্রতিরোধী জাত চাষ করা। বীজতলায় চেশান্ট কমপাউনড (তুতে ৫ গ্রাম, এমোনিয়াম কার্বোনেট ২৫ গ্রাম, পানি ২ গ্যালন) দ্বারা সেচ দেওয়া। |
| ৮। | নুইয়েপড়া | বেগুন, টমেটো, ফুলকপি, বাঁধাকপি, মটরশুটি, সীম, আলু, শসা | মাটি ও বীজ। অত্যধিক অর্থাৎ ৯০-১০০% আর্দ্রতা ও ২৪° সেঃ তাপে আক্রমণ বেশী হয়। | চারাগাছের গোড়ায় বাদামী দাগ পড়ে, গোড়া পচে যায় ও গাছ মরে যায়। | রোগ প্রতিরোধী জাত চাষ করা, শসা পর্যায় অনুসরণ, আক্রান্ত গাছ উঠিয়ে ফেলা, পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা রাখা। |
| ৯। | নরম পচা | কপি, আলু, গাজর, শালগম | মাটি, বীজ ও পানি। অত্যধিক বৃষ্টিপাত ও পোকার আধিক্য, গাছে ক্ষত সৃষ্টি হলে। | আক্রান্ত অংশে ভিজা বাদামী বর্ণের দাগ দেখা যায় এবং সেগুলি দ্রুত বিস্তার লাভ করে, আক্রান্ত অংশ পচে যায়। | নীরোগ বীজ বপন করা। শস্য সংগ্রহের সময় লক্ষ্য রাখা যাতে ক্ষত না হয়। |
| ১০। | শিকড় গিট | বেগুন, টমেটো, আলু, কুমড়া, সীম, ঢেঁড়স, পুঁইশাক | মাটি ও আগাছা। ২৭° সেঃ তাপমাত্রায় দ্রুত রোগ বৃদ্ধি ঘটে | আক্রান্ত গাছের শিকড়ে গিটের সৃষ্টি হয়, গাছের বৃদ্ধি কমে যায় ও গাছ দুর্বল হয়ে পড়ে, ফলন হ্রাস পায়। | আক্রান্ত অংশ পুড়ে ফেলা, গম, ভুট্টা, বাদাম প্রভৃতির দ্বারা ফসল চক্র অনুসরণ করা। ফুরাডান বা মিরাল ৩ জি (প্রতি একর জমিতে ৬০ কেজি হিসাবে) মাটিতে প্রয়োগ করা। |
| ১১। | মোড়ক | বেগুন, স্কোয়াশ | বীজ, মাটি, গাছের পরিত্যক্ত অংশ ২১-৩২° সেঃ তাপমাত্রার আবহাওয়ায় দ্রুত রোগবৃদ্ধি ঘটে | আক্রান্ত গাছে বাদামী রঙের দাগ দেখা যায়। দাগগুলির কেন্দ্রস্থল কিছুটা হালকা রঙের হয়, গাছের কান্ডে ও ফলে এ রোগ দেখা যায় | নীরোগ বীজ বপন, ভিটাভেক্স ২০০ (০.২৫%) দ্বারা বীজশোধন করা। আক্রান্ত গাছে স্প্রে করা। |

| ক্রমিক নং | রোগের নাম ও কারণ | আক্রান্ত ফসলের নাম | বিস্তার পদ্ধতি ও অনুকুল পরিবেশ | রোগের ক্ষণ | প্রতিকার ব্যবস্থা |
|---|---|---|---|---|---|
| ১২। | গোড়া ও কান্ড পচা | বেগুন, বরবটি ঢেঁড়স, পুঁইশাক | বীজ, মাটি, আক্রান্ত গাছের অংশ। উষ্ণ ও আর্দ্র আবহাওয়ায় রোগ দ্রুত বিস্তার লাভ করে | গাছের গোড়ায় কালো দাগ পড়ে। কান্ডেও এ রোগ দেখা যায় এবং কান্ড পচে যায় ও গাছ মরে যায় | নীরোগ বীজ বপন, ভিটাভেক্স ২০০ ও অন্যান্য বীজ শোধন ঔষধ (০.২%) দ্বারা বীজ শোধন করা, আক্রান্ত অংশ পুড়ে ফেলা |
| ১৩। | হোয়াইট রাস্ট | ডাঁটা, লালশাক | গাছের পরিত্যক্ত অংশ, বাতাস। পাতার নীচের দিকে দেখা যায় | আক্রান্ত অংশ সাদা, উঁচু ধরণের দাগ। | গাছের পরিত্যক্ত অংশ পুড়ে ফেলা, ম্যাকুপেক্স (০.২%) বা ডাইথেন এম-৪৫ (০২%) স্প্রে করা |
| ১৪। | ব্যাকটেরিয়াল ব্লাইট | লেটুস, কপি, টমেটো, বীট | মাটি ও বীজ। অধিক আর্দ্রতা ও ২৪° সেঃ এর বেশী তাপমাত্রায় রোগ বৃদ্ধি পায় | প্রথমে বাদামী অথবা হলুদ দাগ পড়ে। পরে দাগগুলি বড় হয়ে এক সাথে মিলে বড় দাগের সৃষ্টি করে | শস্য পর্যায়, পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা |
| ১৫। | পাতায় দাগ রোগ | বেগুন, সীম, টমেটো, পালংশাক, ঝিংগা, মুলা, কাকরল, উচ্চে, বরবটি, পুঁইশাক | আক্রান্ত গছের অংশ। অতিরিক্ত আর্দ্রতা | পাতায় খুব ছোট ধূসর বাদামী দাগ হয়; পরে দাগগুলি বড় হয় ও সংখ্যায় বৃদ্ধি পায়। | আক্রান্ত গাছের অংশ নষ্ট করা। আক্রান্ত পাতা সংগ্রহ করে গর্তে পূতে ফেলতে হবে। ব্যাভিষ্টিন (০.১%) বা নেহিন (০.১%) ১৫ দিন অন্তর স্প্রে করা |
| ১৬। | মোজাইক (ভাইরাস) | সীম, কুমড়া, আলু, টমেটো, ঢেঁড়স | বীজ, পতংগ | আক্রান্ত গাছের পাতায় হলুদ ও সবুজ রংঙের ছোট ছোট দাগ পড়ে। রোগের প্রবল আক্রমণে ফসলের ফলন কমে যায় | নীরোগ বীজ সংগ্রহ, পতংগ দমন। ক্ষেতে আক্রান্ত গছে দেখা দেয়া মাত্র তা উপড়ে মাটিতে পূতে বা পুড়িয়ে রোগের বাহক নিয়ন্ত্রণ করা |
| ১৭। | হলুদ মোজাইক (ভাইরাস) | মটর, সীম | পতংগ | আক্রান্ত পাতায় হলুদ ও সবুজ দাগ পরিলক্ষিত হয়। হলুদ অংশ ক্রমে বড় হয়ে সমস্ত পাতা হলুদ হয়ে যায় | শস্য পর্যায়, নীরোগ বীজ ব্যবহার, পতংগ দমন |

| ক্রমিক নং | রোগের নাম ও কারণ | আক্রান্ত ফসলের নাম | বিস্তার পদ্ধতি ও অনুকুল পরিবেশ | রোগের ক্ষণ | প্রতিকার ব্যবস্থা |
|---|---|---|---|---|---|
| ১৮। | পাতা কোকড়ানো | ঢেঁড়স, কুমড়া, টমেটো, আলু | বীজ, পতংগ, বাতাস | পাতার ফলক কিনারা থেকে মধ্য শিরার দিকে গুঠিয়ে যায়। পাতা খড়খড়ে হয়ে উঠে ও শিরাগুলি স্বচ্ছ হয়ে উঠে। স্বাভাবিক বৃদ্ধি বন্ধ হয়ে যায় | এ রোগের বাহক পতংগ দমন। আক্রান্ত গাছ উপড়িয়ে ফেলা, আগাছা নষ্ট করা |
| ১৯। | শিরা স্বচ্ছলতা (ভাইরাস) | ঢেঁড়শ | পতংগ, বাতাস | আক্রান্ত গাছের পাতার শিরাগুলি হলুদ হয়ে যায়, পাতা ছোট হয় গাছে ফুল ও ফল কম হয় | পাতা কোঁকড়ানো রোগের অনুরূপ |
| ২০। | মরিচা পড়া | মটরশুটি | শস্যের অবশিষ্টাংশ, বাতাস ১৬-২৪° সে: উষ্ণতায় রোগ বিস্তার বেশী হয় | পাতার নিচের দিক লালচে বাদামী রং ধারণ করে, পরে হলদে বাদামী হয়ে শুকিয়ে যায় ও পাতা ঝরে পড়ে | রোগ প্রতিরোধ জাতের শস্য ব্যবহার, অবশিষ্টাংশ নষ্ট করা এবং টিল্ট ২৫০ ইসি (০.০৫%) বা ক্যালিঝিন (০.১%) স্প্রে করা |
| ২১। | ডাউনি মিলডিউ | কুমড়া, শসা, তরমুজ, ফ্রুটি, পালংশাক | বাতাস, পানি ও পোকা-মাকড় অপেক্ষাকৃত ঠান্ড আবহাওয়ায় ও স্যাঁতসেঁতে স্থানে রোগ বেশী হয়। | পাতার নীচে দাগের উপর বেগুনী রঙের ছত্রাক জন্মে। আক্রান্ত পাতা প্রথমে হলদে এবং পরে বাদামী রং ধারণ করে এবং কুঁচকিয়ে যায়। | আক্রান্ত অংশ পুড়িয়ে ফেলা, রিডোমিল এমজেড-৭২ (০.২%) স্প্রে করা। |

## সবজির প্রধান প্রধান পোকা ও প্রতিকার

সারণী : বিভিন্ন সবজি পোকামাকড় এবং তাদের দমনে ব্যবহারযোগ্য কীটনাশক সমূহ।

| পোকার নাম | কীটনাশকের নাম | প্রয়োগ-মাত্রা (প্রতি লিটার পানিতে) |
|---|---|---|
| ১। ফলের মাছি পোকা | ১। সুমিথিয়ন ৫০ ইসি<br>২। ফলিথিয়ন ৫০ ইসি<br>৩। ডিপটেরেক্স ৮০ এস,পি | ২ মি: গ্রা:<br>২ মি: গ্রা:<br>১ গ্রাম |
| ২। জাবপোকা ও অন্যান্য শোষক পোকা | ১। যিথিওল ৫৭ ইসি<br>২। ফাইফানন ৫৭ ইসি<br>৩। সুমিথিয়ন ৫০ ইসি<br>৪। পারফেকথিয়ন ৪০ ইসি | ২ মি: গ্রা:<br>২ মি: গ্রা:<br>১ মি: গ্রা:<br>২ মি: গ্রা: |
| ৩। বেগুনের ডগা ও ফলের মাজরা পোকা | ১। কেনকির ২০ ইসি<br>২। ডেনিটল ১০ ইসি<br>৩। ট্রিবন ১০ ইসি<br>৪। রিপকর্ড ১০ ইসি | ০.৫ মি: লি:<br>১ মি: লি:<br>১ মি: লি:<br>১ মি: লি: |
| ৪। কাটুই পোকা | ২। ডায়াজিনন ১০ জি<br>৩। পাইরিফস ২০ ইসি<br>৪। সুমিসাইডিন ২০ ইসি<br>৫। বেথ্রয়েড ৫০ ইসি | ৩০-৩৫ কেজি (প্রতি হেক্টরে)<br>২ মি: লি:<br>০.৫ মি: লি:<br>০.৫ মি: লি: |
| ৫। বেগুনের মাইট বা মাকড় | ১। ইউনিফ্লো টি, এম, সালফার<br>২। ভেনিটল ১০ ইসি | ২ মি: লি:<br>১ মি: লি: |

# অধ্যায়-১৩
# বীজ উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও সংরক্ষণ

**কৃষিতে উন্নত বীজের ভূমিকা**

বীজই হল ফসল উৎপাদনের চাবিকাঠি। পবিত্র কোরআন এ উল্লেখ আছে "তা যেন একটি বীজ যা থেকে সাতটি শীষ জন্মালো, আর প্রত্যেক শীষে একশ করে দানা আল্লাহ যাকে খুশী খুব বেশী বাড়িয়ে দেন" (আল কোরআন, সুরা বাকারা আয়াত: ২৬১)

বাংলাদেশে প্রায় ৭০টি ফসলের চাষ করা হয়ে থাকে। এই ফসল গুলির মধ্যে স্থানীয় এবং উফশী জাতগুলো রয়েছে। এক হিসাবে দেখা যায় এসকল ফসলের জন্য প্রায় ৯ লক্ষ টন বীজের প্রয়োজন। সরকারী ও বেসরকারী ভাবে ধান, গম, পাট, আলু, সবজি, ডাল ও তৈলবীজ সমূহের মানসম্পন্ন যে পরিমান বীজ সরবরাহ করা হয় তা প্রয়োজনের তুলনায় খুবই নগন্য যেমন শতকরা ৭ ভাগ ধান, ১৬ ভাগ গম, ২ ভাগ আলু এবং অন্যান্য ফসলের ক্ষেত্রে ১ ভাগেরও কম। উপকূলীয় চরাঞ্চল এলাকার চিত্র আরো ভয়াবহ। যদিও এই এলাকায় লবণাক্ততা এবং শুষ্ক মৌসুমে সেচ যোগ্য পানির অভাবে উচ্চ ফলনশীল জাতের বীজ ব্যবহার সম্ভাবনা অত্যন্ত সীমিত। চরাঞ্চলে উন্নত বীজের দুষ্প্রাপ্যতাও এর একটি প্রধান কারণ। এমনিতে কৃষকদের জমির পরিমান খুবই কম তাই এই অল্প জমিতে ২/৩ গুন বেশী ফলন প্রাপ্তির মাধ্যমে এসকল এলাকার কৃষকদের বেশী আয়ের সম্ভাবনাকে কাজে লাগাতে হবে।

ফসল উৎপাদনের প্রাথমিক শর্ত হলো মানসম্মত বীজ বা ভাল বীজ ব্যবহার করা। উপকূলীয় চরাঞ্চলে যেখানে পরিবার প্রতি উৎপাদনযোগ্য জমি খুবই সীমিত এবং লবণাক্ততা, বন্যা, জলাবদ্ধতা, ঘুর্ণিঝড় ইত্যাদি প্রাকৃতিক প্রতিকূল পরিস্থিতি বিদ্যমান সে সকল এলাকার জমিতে অধিক উৎপাদনের জন্য সম্ভাব্য সকল আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি ব্যবহারই কৃষক পরিবারে কিছুটা আর্থিক সচ্ছলতা আসতে পারে। তাই সীমিত জমিতে উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য ভাল বীজ ব্যবহারের কোন বিকল্প নেই। কারণ আমরা জানি শুধুমাত্র ভাল বীজ ব্যবহার করে শতকরা ১৫-২০ ভাগ অধিক ফলন পাওয়া সম্ভব।

তাই এই বইতে খুবই সীমিত আকারে বীজ সংক্রান্ত কিছু প্রযুক্তিগত তথ্য প্রদানের মাধ্যমে মান সম্মত বীজ উৎপাদন ও সংরক্ষন সম্পর্কে প্রাথমিক ধারনা দেয়ার প্রচেষ্টা নেয়া হয়েছে।

আমাদের দেশের কৃষক ভাইরা বিভিন্ন ফসল যেমন ধান, গম, ভূট্টা, পাটবীজ, ডাল ও তৈলবীজ এবং কিছু কিছু সবজি বীজ নিজেরা উৎপাদন করে পরবর্তী ফসলের জন্য সংরক্ষন করতে পারেন। তবে যে ফসলের বীজই উৎপাদন করা হোক না কেন অত্যন্ত যত্নের সাথে যদি বীজ উৎপাদনের নূন্যতম উৎপাদন কৌশল এবং মান নিয়ন্ত্রন অনুসরণ করা হয় তাহলে কৃষক নিজে ও অন্যান্য কৃষকগন এতে উপকৃত হবে।

**বীজের শ্রেণী বিভাগ**

ক) মৌলবীজ (Breeder seed), খ) ভিত্তি বীজ (Foundation seed), গ) প্রত্যয়িত বীজ (Certified seed), ঘ) মান ঘোষিত বীজ (Truthfully leveled Seed)

**ভাল বীজ কি?**

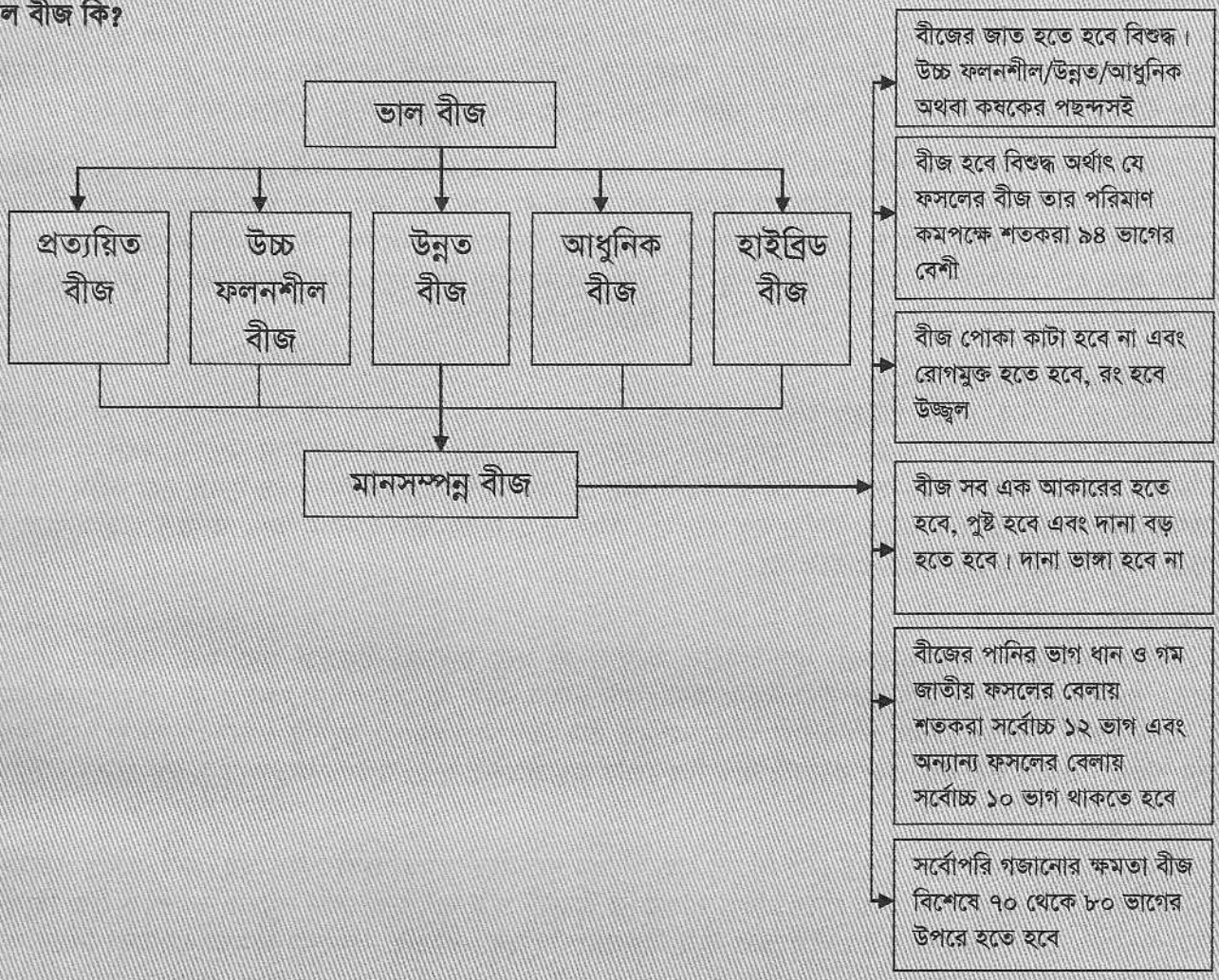


**প্রত্যয়িত বীজ**

প্রত্যয়িত বীজ মানে প্রত্যয়নপত্র বা সার্টিফিকেট দেয়া বীজ। বীজের মান পরীক্ষা করে সরকার এ সার্টিফিকেট দেয় যা বীজের প্যাকেটের গায়ে সেঁটে দেয়া থাকে। মনে করা হয় এ ধরণের সার্টিফিকেট দেয়া বীজ মানসম্পন্ন বীজ, অর্থাৎ বীজের জাত, গজানোর ক্ষমতা, বিশুদ্ধতা এসব গুণ পরীক্ষিত এবং নির্দিষ্ট মানসম্পন্ন।

**উচ্চফলনশীল বীজ**

চলতি কথায় উফশী বীজ অর্থাৎ উচ্চ এর 'উ' ফলনের 'ফ' এবং শীল এর 'শী' এই নিয়ে উফশী। এ কথা বলে বা বীজের প্যাকেটে লিখে বুঝানো হয় বীজের জাতটির ফলন উচ্চ অর্থাৎ বেশী। কিন্তু বীজের অন্যান্য গুণ যেমন গজানোর ক্ষমতা, বিশুদ্ধতা এসব সম্বন্ধে কোন তথ্য বুঝায় না।

**উন্নত বীজ**

স্থানীয় জাত বা সনাতনী জাত, তার মধ্য থেকে বেছে ভাল গুণসম্পন্ন জাত বের করে উন্নত জাত হিসেবে নাম দেয়া হয়। এ ধরনের জাতের বীজকে উন্নত জাতের বীজ বলা হয়। এ নাম থেকে বীজের জাত সম্বন্ধে তথ্য বুঝা গেলেও বীজের অন্যান্য গুণ সম্বন্ধে কোন কিছু বুঝা যায় না।

**আধুনিক বীজ**

যে জাতগুলো অতি সম্প্রতি উদ্ভাবিত হয়েছে সেগুলো আধুনিক জাত। এসব সাম্প্রতিক জাতের বীজকে আধুনিক জাতের বীজ বলে। এ নাম থেকে বীজের জাত সম্বন্ধে তথ্য জানা গেলেও বীজের অন্যান্য গুণ সম্বন্ধে কোন কিছু জানা যায় না।

**হাইব্রিড বীজ**

এমন বাপ এবং মা গাছ আছে যাদের উৎপাদিত বীজ তাদের অপেক্ষা শক্তিশালী, উৎপাদনশীল এবং ভাল গুণসম্পন্ন গাছ উৎপাদন করতে পারে। এধরনের বীজকে হাইব্রিড বীজ বলে। হাইব্রিড বললেই ভাল হবে এমন কোন নিশ্চয়তা নেই। হাইব্রিড বীজের যদি গজানোর ক্ষমতা, বিশুদ্ধতা নির্দিষ্ট মানের না হয় তাহলে কোন মতেই হাইব্রিড বীজ ভাল বীজ নয়।

আগামীতে এধরনের আরও নাম সৃষ্টি হতে পারে বা মানুষ নাম দিতে পারে। কিন্তু যে নামই দেয়া হোক অর্থাৎ প্রত্যায়িত, উচ্চফলনশীল, উন্নত, আধুনিক বা হাইব্রিড যে নামই দেয় হোক না কেন তা ভাল বীজ হতে হলে অবশ্যই নির্ধারিত মানসম্পন্ন হতে হবে। এখন তাহলে মানসম্পন্ন কথাটা বুঝে নেয়া দরকার। মানসম্পন্ন বীজ হলেই তা ভাল বীজ আবার ভাল বীজ হতে হলে অবশ্যই সে বীজকে মানসম্পন্ন হতে হবে। মানসম্পন্ন বীজ হতে হলে বীজের কি কি গুণ থাকতে হবে তা ছকের মাধ্যমে বুঝানোর চেষ্টা করা হয়েছে। যা নিম্নে আলোচনা করা হলোঃ

**জাত বিশুদ্ধতা**

ফসলের জাতের বিশুদ্ধতা বলতে বীজের বংশগত বিশুদ্ধতা বোঝায়। প্রত্যেক জাতের নির্দিষ্ট কতকগুলো বৈশিষ্ট্য থাকে যার ওপরে ফলনের পরিমাণ ও মান নির্ভর করে। যদি কোন ফসলের এক জাতের বীজের সাথে অন্য জাতের মিশ্রণ বা সংমিশ্রণ ঘটে তাহলে জাতের বিশুদ্ধতা নষ্ট হয়। বীজের এ একটি মাত্র গুণ যা পরীক্ষাগারে পরীক্ষা করে নির্ণয় করা কঠিন। এজন্য সাধারণত পরীক্ষাগারে জাত বিশুদ্ধতা নির্ণয় করা হয় না। মাঠে বীজ ফসল থাকার সময় অন্য জাতের গাছ থাকলে তা উপড়িয়ে ফেলে জাতবিশুদ্ধতা বজায় রাখতে হয়।

**বীজ বিশুদ্ধতা**

বীজ বিশুদ্ধতা বলতে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, ধুলাবালিহীন, আগাছা বা অন্য ফসলের বীজমুক্ত এবং জড় পদার্থমুক্ত বীজকে বোঝায়। অর্থাৎ বিশুদ্ধ বীজে আগাছার বীজ কিংবা অন্য কোন প্রকার ময়লা বা জড় পদার্থ থাকবে না। বীজ থেকে নমুনা নিয়ে তা তিন ভাগ করা হয়। যথা- বিশুদ্ধবীজ, অন্য ফসলের বীজ এবং জড় পদার্থ। নমুনার ওজনের শতকরা হারে বিশুদ্ধ বীজের পরিমাণ প্রকাশ করা হয়। সাধারণভাবে বীজ বিশুদ্ধতার হার শতকরা ১০০ ভাগের কাছাকাছি হওয়া ভাল।

**গজানোর ক্ষমতা**

বীজ নমুনার শতকরা কয়টি বীজ গজায় সেই হিসেব দ্বারা বীজের গজানোর ক্ষমতা প্রকাশ করা হয়। ভালবীজের গজানোর ক্ষমতা শতকরা ১০০ ভাগ পর্যন্ত হতে পারে। কিন্তু সাধারণত এমনটি ঘটে না। যদি কোন নমুনায় কমপক্ষে বীজ বিশেষে শতকরা ৭০-৮০ ভাগ গজায় তবে সে বীজ ভাল বীজ হিসেবে গণ্য হয়। বীজের গজানোর ক্ষমতা প্রধানত: নির্ভর করে তেজ, সুপ্ততা ও আর্দ্রতার ওপর।

**বীজ গজানোর ক্ষমতা পরীক্ষা**

বীজের মুখ ফাটলেই বা চারা বের হলেই বীজ গজিয়েছে বলে ধরে নেয়া যায় না। বীজ ফেটে যে চারাটি বের হলো তার কতগুলি প্রয়োজনীয় অংগ অবশ্যই থাকতে হবে যাতে অনুকূল পরিবেশে একটি সুস্থ গাছ হিসেবে বেড়ে উঠবে। পরীক্ষার জন্য যে মাধ্যম ব্যবহার করা যায় তাহলো:

ক) প্রতি ১০০ টির জন্য ২টি কাটা চটের বস্তার টুকরো
খ) মাটির থালা ইত্যাদি।
গ) ৪০০ টি বিশুদ্ধ বীজকে চারভাগে ভাগ করে অর্থাৎ ১০০টি বীজ একটি পাত্রে চোষ কাগজ পানিতে ভিজিয়ে বিছিয়ে দিতে হবে।

**পরীক্ষা পদ্ধতি**

**পদ্ধতি-১:** চটের বস্তা ভিজিয়ে ১০০ টি বীজ সারি করে সাজিয়ে দিতে হবে যাতে প্রতিটি বীজ আলাদা ভাবে লেগে থাকে এবং অপর চটের টুকরাটি পানিতে ভিজিয়ে উপর ঢেকে দিতে হবে। বস্তার খন্ডটি শুকিয়ে গেলে ভিজিয়ে দিতে হবে খেয়াল রাখতে হবে পরিমানমত পানি শুধু চটের টুকরো যেন ভিজে যায়। এভাবে কমপক্ষে ৫-৭ দিন পরে অংকুরিত চারার মুল্যায়ন করতে হবে। চারাগুলো মুল্যায়ন করার সময় সুস্থ চারা, বিকলাংগ চারা, অগজানো ভাল/ শক্ত বীজ, মৃত বীজ, আলাদা করতে হবে। আংগুলের চাপ দিলে মৃত বীজ গলে যায় এবং পচা গন্ধ পাওয়া যায়। দেখতে হবে সুস্থ চারা, শিকড়,

কান্ড এবং পাতা সমৃদ্ধ চারা গুলি সুস্থ চারা। অন্যান্য বীজ/ চারা গুলি আলাদা করে গননা করে চারটি পাত্রের সুস্থ চারার গড় করলে গজানোর বা অঙ্কুরোদগম এর হার পাওয়া যাবে।

**পদ্ধতি-২:** মাটির থালায় ভেজা বালির (চিকন দানার) উপর বীজ সাজিয়ে দিয়ে তার উপর হালকাভাবে আর একটি বালির স্তর (১ সে.মি.) ভেজা বালি দিয়ে ঢেকে দিতে হবে। বালি শুকিয়ে গেলে পরিমান মত পানি দিয়ে বালি ভিজিয়ে দিতে হবে। পরবর্তীতে উপরে বর্নিত পদ্ধতিতে চারা মুল্যায়ন করতে হবে।

**বীজের আর্দ্রতা**

বীজের মধ্যে শতকরা কত ভাগ পানি আছে তাই বীজের আর্দ্রতা। বীজের জীবন চক্রে এই আর্দ্রতার প্রভাব অনেক বেশী। বীজের আর্দ্রতা যতবেশী হবে বীজ গজানোর ক্ষমতা ও তেজ তত দ্রুত কমে যাবে। এছাড়া বীজ অতি দ্রুত সংরক্ষণ পোকার (Stored grain pests) আক্রমণ বাড়বে এবং খুব তাড়াতাড়ি বীজ মরে যেতে পারে। ধান বা গমের বীজের বেলায় আর্দ্রতা শতকরা ১২ ভাগ এবং অন্যান্য বীজের বেলায় শতকরা ১০ ভাগের নীচে থাকলে বীজ মোটামুটি ভাল থাকে।

**বীজের জীবনে আর্দ্রতার প্রভাব (দানা শস্য)**

বীজ একটি জীবন্ত উপকরণ। বীজেরও জীবন আছে। তাই বীজের জীবন রক্ষা করতে হলে পারিপার্শিক প্রতিকূল অবস্থা থেকে দূরে রাখতে হবে। বীজের আর্দ্রতা এর মধ্যে অন্যতম।

- বীজের আর্দ্রতা ১৮-৪০% বা তদূর্ধ্ব- বীজ পরিপক্ক হয়
- বীজের আর্দ্রতা ৪০-৬০% বা তদূর্ধ্ব- বীজ অংকুরোদ্গম হয়
- বীজের আর্দ্রতা ১৮-২০% বা তদূর্ধ্ব- বীজ গুমিয়ে যেতে পারে
- বীজের আর্দ্রতা ১২-১৪% বা তদূর্ধ্ব- বীজের ভিতরে ও বাহিরে ছত্রাক আক্রমণ করতে পারে
- বীজের আর্দ্রতা ১০-১২% পর্যন্ত- ৬-৮ মাস সংরক্ষণের জন্য নিরাপদ তবে পোকার আক্রমণ হতে পারে
- বীজের আর্দ্রতা ৮-১০% বা নীচে- পোকার আক্রমন নাই

**বীজের জীবনে আর্দ্রতার প্রভাব**

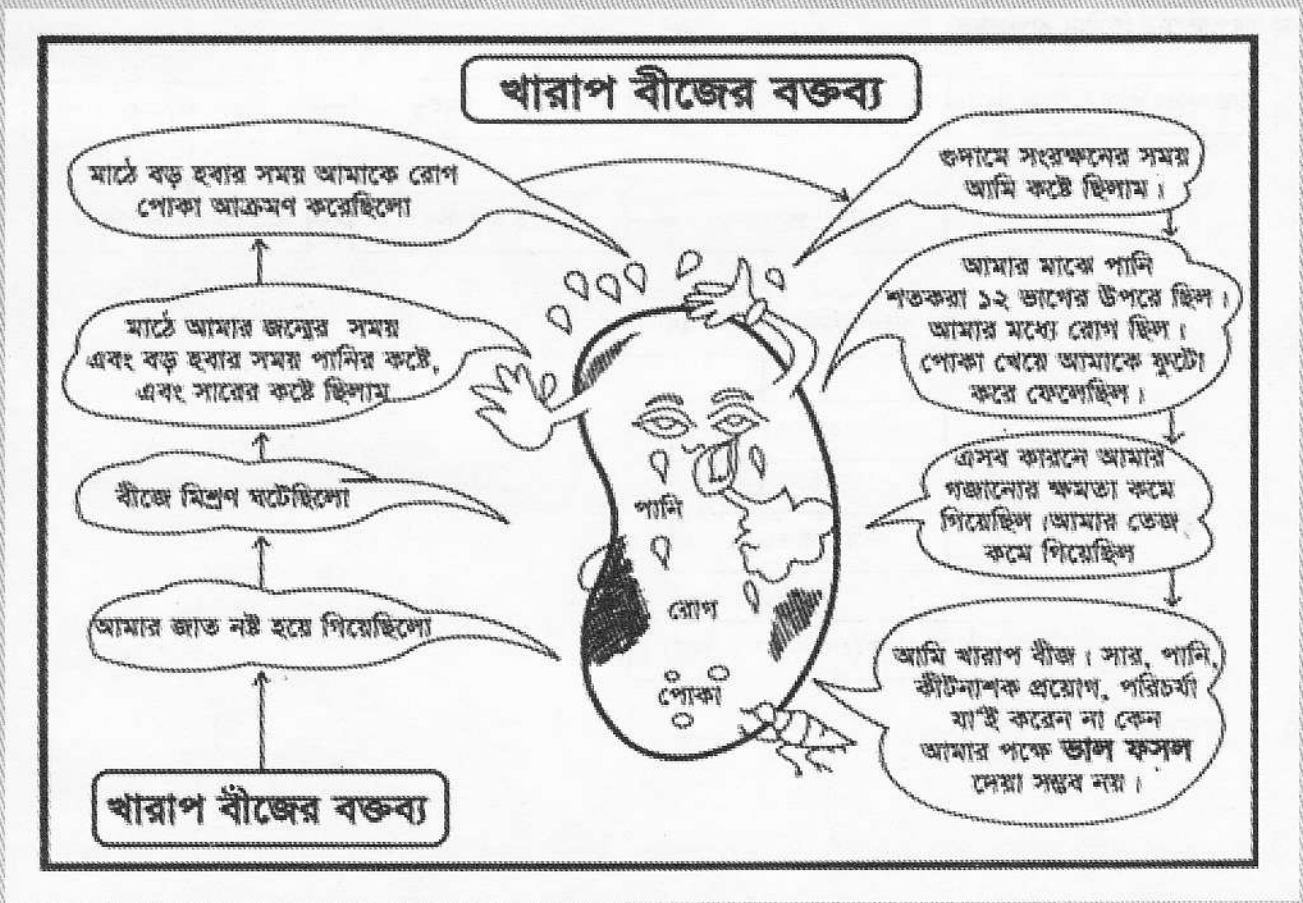

**বীজের সুস্থতা**

রোগমুক্ত এবং পোকায় না কাটা বীজকে সুস্থ বীজ বলে। বীজ ছত্রাক, ব্যাকটেরিয়া ও ভাইরাস জনিত অনেক রোগ বহন করতে পারে। আবার গুদামে সংরক্ষণকালে সংরক্ষণ-ব্যবস্থা ভাল না থাকলে পোকা ও ছত্রাক দ্বারা আক্রান্ত হতে পারে। রোগের জীবাণু বীজের ত্বকে বা ভেতরে থাকতে পারে। রোগাক্রান্ত ও পোকায় কাটা বীজ হতে চারা উৎপাদনের নিশ্চয়তা থাকে না।

**বীজের আকার**

সব বীজ আকারে এক সমান হয় না। অনেক ফসলেরই বড় আকারের বীজ হতে ভাল ফসল পাওয়া যায়। এজন্য বীজ পুষ্ট এবং বড় আকারের হলে বীজ ভাল হয়। আবার সব বীজ এক আকারের হওয়া দরকার যাতে মাঠে চারা সবই এক রকম হতে পারে। চালনি দিয়ে ছেঁকে ছোট বীজ ফেলে দিয়ে বীজ বড় এবং এক আকারের করা সম্ভব হয়।

**বীজের তেজ**

বীজের চারা যদি সতেজ ও স্বাস্থ্যবান হয় এবং প্রতিকূল অবস্থায়ও তাড়াতাড়ি বড় হয় তবে সে বীজকে তেজী বীজ বলা হয়। বীজ বপন থেকে শুরু করে ফসল কাটা পর্যন্ত বীজ, চারা ও গাছ নানা প্রতিকুল অবস্থার সম্মুখীন হয়। যে বীজের তেজ যত বেশী প্রতিকূল অবস্থায় সে বীজ ততটা সহিষ্ণু হতে পারে। গজানোর দ্রুততা বা চারার দৈর্ঘ্য মেপে বীজের তেজ নির্ণয় করা যায়।

**বীজের সুপ্ততা**

উপযুক্ত পরিবেশে কোন সজীব বীজের অঙ্কুরোদগম না হওয়াকেই বীজের সুপ্তাবস্থা বলে। প্রায় প্রত্যেকটি ফসলের বীজের নির্দিষ্ট সুপ্তিকাল আছে। বীজ উৎপাদনের পর নির্দিষ্ট সময় বীজ গজায় এবং সে সময় পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়। তা নাহলে বিশেষ উপায়ে সুপ্তাবস্থা ভাঙ্গতে হয়। অবশ্য অনেক বীজ আছে যেগুলো উৎপাদনের পর পরই এবং গাছে থাকতে গজাতে পারে।

**বীজ উৎপাদনের বিভিন্ন ধাপসমূহ:**

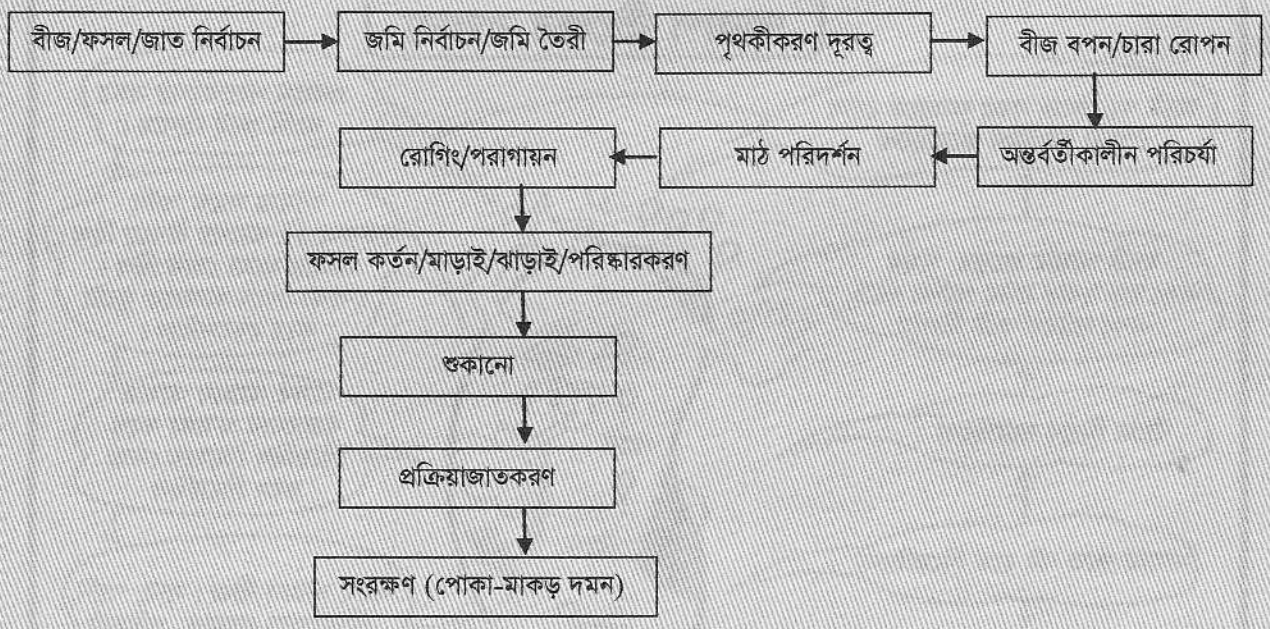

**পৃথকীকরণ দূরত্ব**

বীজ উৎপাদন পদ্ধতিতে পৃথকীকরণ একটি গুরুত্বপূর্ন শর্ত। বিভিন্ন ফসল ও জাতের বীজ উৎপাদনে যাতে কাঙ্খিত বীজের কৌলতত্ত্ব (Genetical) গুন বজায় থাকে অর্থাৎ এক জাতের সাথে অন্য জাতের পরাগায়ন না ঘটে তার জন্য পৃথকীকরন সময় দূরত্ব (Time distance) ও ভৌত দূরত্ব (Physical distance) বজায় রাখা দরকার। বিভিন্ন ফসলের স্ব-পরাগায়ন এবং পর পরাগায়ন হয় তাই এই পৃথকীকরনের প্রয়োজন হয়।

**রোগিং বা বাছাই**

গুনগত মান বা চাহিদা মোতাবেক বীজের বিশুদ্ধতা রক্ষা করতে হলে রোগিং একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। রোগিং করার উদ্দেশ্য হলো মুল জাতের বিশুদ্ধতা রক্ষা করা এবং অন্য ফসলের/ জাতের মিশ্রন থেকে রক্ষা করা। ক্ষেতে উৎপাদন পর্যায়ে কাঙ্খিত ফসলের গাছ ছাড়া ঐ ক্ষেতের অন্য যে কোন জাতের ফসলের গাছ সনাক্ত করে শিকড় সহ উঠিয়ে ফেলার নামই হল রোগিং। রোগিং এর কোন নির্দিষ্ট সময় নেই। বীজতলা থেকে শুরু করে ফসল কাটা পযন্ত রোগিং বা বাছাই করা যায়। তবে গাছের বাড়ন্ত পর্যায়ে, ফুল আসার পরে এবং দানা গঠনের পর্যায়ে অবাঞ্চিত গাছ বাছাই করার উপযুক্ত সময়। এছাড়া আগাছা, রোগবালাই ও পোকাক্রান্ত গাছ তুলে ফেলতে হবে। অর্থাৎ এক কথায় যে ফসল/ জাতের বীজ উৎপাদন করা হচ্ছে সে ফসল/ জাত ব্যতিত অন্য যে কোন ধরনের অনাকাঙ্খিত গাছ বাছাই করে তুলে ফেললে বিশুদ্ধ জাতের বীজ উৎপাদন সম্ভব।

**বীজ ফসল কাটা ও মাড়াই**

বীজ ধান কাটার উপর বীজের গুনাগুন অনেকটা নির্ভর করে। সাধারনত ফুল ফোটার ৩০-৩২ দিনের মধ্যে ধান পেকে যায়। মোটামুটি ভাবে জমির বা একটি ছড়ার শতকরা ৮০ ভাগ ধান পাকলে কাটার উপযুক্ত সময় হয়। আবহাওয়া ভাল দেখে ধান কাটা দরকার, যেন ধান কাটার পর পরই মাড়াই করা যায় এবং সাথে সাথে রোদে শুকানো যায়। তাতে বীজের রং ভাল থাকে। বীজ ধান কেটে কখনও গাদা করে অথবা পালা করে রেখে দেয়া যাবে না এবং কখনও গরু বা মহিষ দিয়ে মাড়াই করা উচিত নয়। সাধারনত ড্রাম অথবা কাঠের তক্তার উপর আটি গুলো পিটিয়ে বীজ সংগ্রহ করতে হয়। এর পর কুলার সাহায্যে ঝেড়ে পরিষ্কার করে সাথে সাথে রোদে ভাল ভাবে শুকাতে হয়।

**শুকানো বা পরিষ্কার করা**

ধান বীজ সংরক্ষণের সময় ১২% এর বেশী আর্দ্রতার মধ্যে রাখতে হয়। তা নাহলে রোগবালাই ও পোকামাকড়ের আক্রমনের সম্ভাবনা থাকে। তবে শুকানোর সময় একদিনে না শুকিয়ে ২/৩ দিন রোদে শুকানো ভাল। শুকানোর পূর্বে প্রত্যেক বারই কুলায় বীজ ঝেড়ে রোদে শুকাতে দিতে হবে। মেশিনের সাহায্যে ও ধানবীজ পরিষ্কার করা যায়। ত্রিপল বা চাটাই বা পাকা মেঝেতে বীজ শুকাতে হবে। বীজ কড়া রোদে শুকিয়ে ঠান্ডা করে গুদামজাত করতে হবে। বীজ শুকালো কিনা তা দাঁত দিয়ে চাপ দিয়ে দেখতে হবে। কট শব্দ করে বীজ ভেঙ্গে গেলে সাধারনত: ধারনা করা যায় বীজ শুকিয়েছে। তবে আর্দ্রতা মাপক যন্ত্র বা ময়েশচার মিটার দ্বারা পরীক্ষা করে আর্দ্রতা ১২% এর নীচে থাকলে মোটামুটি ভাবে নিরাপদ ধরে নেয়া যায়।

**সংরক্ষণ**

- শুকনো বীজ যে কোন ধরনের টিনের পাত্রে অথবা ড্রামে রাখলে ভাল থাকবে। এছাড়া মোটা পলিথিন এর ব্যাগে বীজ রাখলে ভাল থাকে। অর্থাৎ বীজ রাখার পাত্র অবশ্যই বায়ু রোধক হতে হবে যাতে বাইরের বাতাস/ জলীয় বাষ্প যেন ভিতরে না ঢুকে। মাটির মটকা বা কলসে বীজ রাখলে গায়ে দু'বার আলকাতরার প্রলেপ দিয়ে শুকিয়ে নিতে হবে।
- আর্দ্রতা রোধক মোটা পলিথিনেও বীজ মজুদ করা যেতে পারে।
- রোদে শুকানো বীজ ঠান্ডা করে পত্রে ভরতে হবে। পুরো পাত্রটি বীজ দিয়ে ভরে রাখতে হবে। যদি বীজে পাত্র না ভরে তাহলে বীজের উপর কাগজ বিছিয়ে তার উপর শুকনো বালি দিয়ে পাত্র পরিপূর্ণ করতে হবে।
- পাত্রের মুখ ভালভাবে বন্ধ করতে হবে যেন বাতাস ঢুকতে না পারে। এবার এমন জায়গায় রাখতে হবে যেন পাত্রের তলা মাটির সংস্পর্শে না আসে।
- টন প্রতি ধানে ৩.২৫ কেজি নিম, নিশিন্দা বা বিষকাটালি পাতার গুঁড়া মিশিয়ে গোলাজাত করলে পোকার আক্রমন হয় না।

**সংরক্ষণকালীন পরিচর্যা**

সংরক্ষিত বীজ মাঝে মাঝে খুলে দেখতে হবে পোকার আক্রমন হয়েছে কিনা অথবা বীজের মধ্যে হাত দিয়ে দেখতে হবে গরম লাগে কিনা। এমন হলে বীজ পূর্ব বর্নিত পদ্ধতিতে শুকাতে হবে। যদি পোকা লাগে তাহলে চেলে পোকা মুক্ত করতে হবে। প্রয়োজনেবোধে ফসস্টকসিন, সেলফস জাতীয় টেবলেট বায়ুরোধক শীট দ্বারা ঢেকে কমপক্ষে ৫-৭ দিন ঢেকে রাখতে হবে। তবে এপদ্ধতি সম্পর্কে যিনি ভালভাবে জানেন তাকে দিয়েই একাজ করতে হবে। সাধারনত: যারা বীজের ব্যবসা করেন এবং অধিক পরিমান বীজের সংরক্ষণ বা প্রক্রিয়াজাত করেন তারাই এ পদ্ধতি গ্রহন করে থাকেন।

**গুদামজাত বীজের কীটপতঙ্গ ও প্রতিকার**

তাপ ও আর্দ্রতাযুক্ত গুদামে পোকার আক্রমন যদি রোধ বা দমন করা না যায় তবে শুধু পোকার আক্রমনেই সংরক্ষিত বীজ ধ্বংস হয়ে যেতে পারে। বাংলাদেশে খাদ্য শস্যের প্রায় শতকরা ৩০ ভাগ পোকার আক্রমনে নষ্ট হয়।

**কীট পতঙ্গ**

পৃথিবীর প্রাণীকুলের প্রায় ৮৫% কীট পতঙ্গ। মাঠ ফসলের পোকা থেকে গুদামজাত বীজের পোকা ভিন্নতর। প্রায় ৫০টি প্রজাতির কীট প্রতঙ্গ গুদামজাত বীজ/শস্যের আক্রমন করে। তন্মধ্যে ১২ প্রধান অনিষ্টকারী পোকা। এখানে প্রধান প্রধান অনিষ্টকারী পোকার ছবিসহ নাম দেয়া হল:

দানা শস্যের বড় মথ

ভূট্টার কেড়ি পোকা

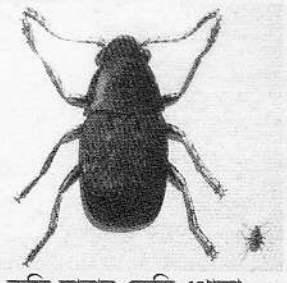
কফি দানার কেড়ি পোকা

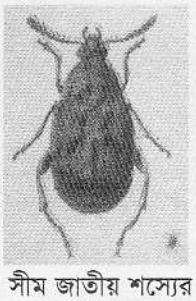
সীম জাতীয় শস্যের কেড়ি পোকা

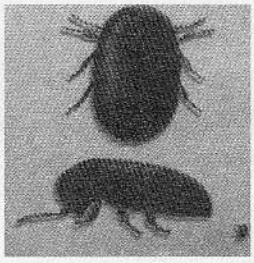
তামাকের বিটল

কোপরা বিটল

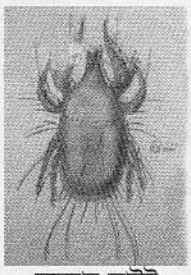
ময়দার মাইট

খাপরা বিটল

তামাকের মথ

চকলেট মথ

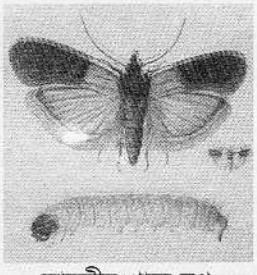
ভারতীয় খাদ্য মথ

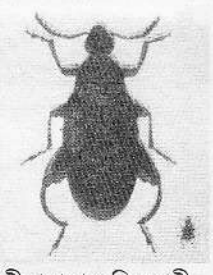
চীনাবাদাম ছিদ্রকারী পোকা

ডালের বীটল

করাতী পোকা

গমের বীটল

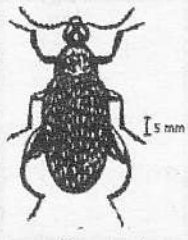
কেড়ি পোকা

**বীজ গুদামের পোকা-মাকড় দমন**

গুদামজাত বীজের/শস্যের পোকা মাকড়/কীট পতঙ্গের আক্রমনকে দুভাগে নিয়ন্ত্রন করা যায়।

১) প্রতিরোধ ব্যবস্থা : গুদামে বা গুদামজাত শস্যের যাতে পোকার আক্রমন না হয় তার ব্যবস্থা নেয়া।

২) প্রতিকার ব্যবস্থা : পোকা আক্রমন করলে কিভাবে তা দমন করা যায়।

প্রথমে বলে নেয়া দরকার প্রতিকারের চাইতে প্রতিরোধ ব্যবস্থাই সবচেয়ে ভাল। কারণ পোকার আক্রমন হলে বীজের অঙ্কুরোদগম নষ্ট হওয়ার ঝুঁকি থাকে এবং প্রচুর টাকা খরচ হয়। কিভাবে প্রতিরোধ করা যায় তার বিবরন নিম্নে দেয়া হলোঃ

## প্রতিরোধ ব্যবস্থা

**বীজ পরিষ্কার করা:** বীজ গুদাম জাত করার পূর্বে অবশ্যই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে নিতে হবে যাতে কোন ধূলাবালি, ময়লা আবর্জনা, খোসা চিটা পাথর, মাটির টুকরা ইত্যাদি না থাকে, যে বস্তা, পাত্র, ডোল, ড্রামে গুদামজাত করা হবে তা যেন পোকামুক্ত থাকে। গুদাম পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা।

**সংরক্ষণ পরিবেশ পরিষ্কার রাখা:** গুদাম বা সংরক্ষনের স্থান, সংরক্ষণের জন্য ব্যবহৃত দ্রব্যাদি, যন্ত্রপাতি ইত্যাদি ভাল ভাবে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে তারপর সংরক্ষণ করতে হবে।

**কীটনাশক স্প্রে করা:** সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসাবে ম্যালাথিয়ন জাতীয় কীটনাশক দিয়ে স্প্রে করা ভাল যাতে পোকামাকড় অকালে মারা যায়।

**আর্দ্রতা নিয়ন্ত্রণ:** গুদামে বীজ বা শস্যের আর্দ্রতা নিয়ন্ত্রনে রাখা পোকামাকড় হতে রক্ষা করার একটি কৌশল। বীজের বেলায় ১২% এবং খাদ্যশস্যের বেলায় ১৪% এর নিম্নে আর্দ্রতা রাখতে হবে। প্রয়োজন বোধে বর্ষাকালে পুনরায় শুকিয়ে নিতে হবে যাতে এই আর্দ্রতায় দীর্ঘদিন সংরক্ষণ করা যায়।

**স্থানীয়ভাবে নিয়ন্ত্রন ব্যবস্থা:** স্থানীয় নিম গাছের পাতা শুকিয়ে বীজ পাত্রের উপর দিয়ে রাখলে সাধারনত: পোকার আক্রমন হয় না। এছাড়া বিষকাটালী এবং নিশিন্দা পাতা প্রতিরোধক হিসেবে ব্যবহার করা যায়।

## প্রতিকার ব্যবস্থা

**কীটনাশক ঔষধ:** গুদামজাত বীজ/শস্যের জন্য কীটনাশক ঔষধ ব্যবহার করার সময় অত্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। নির্দিষ্ট পোকা মারার জন্য নির্দিষ্ট কীটনাশক সঠিক মাত্রায় প্রয়োগ করা হলে তবেই ফল পাওয়া সম্ভব।

**প্রচলিত কীটনাশক:** গুদামজাত শস্যের জন্য সাধারণভাবে ম্যালাথিয়ন, লিনডেন, পাইরেথাস, সুমিথিয়ন, একটেলিক এজোড্রিন ইত্যাদি ঔষধ সুপারিশকৃত মাত্রায় প্রয়োগ করতে হবে।

**ফিউমিগ্যান্টস্:** ফিউমিগ্যান্টস্ জাতীয় ঔষধ শুধু বেশী পরিমানে অথবা ব্যবসয়িক ভাবে বীজ/শস্য সংরক্ষণে ব্যবহার করা হয়। ট্যাবলেট আকারে যেসমস্ত ঔষধ বাজারে পাওয়া যায় তার মধ্যে ফস্টকসিন, সেলফস, কুইকফিউম ইত্যাদি গুদামজাত শস্যের জন্য কার্যকরী বলে প্রতিয়মান হয়েছে।

এসকল ফিউমিগ্যান্টস্ ব্যবহারে সময় বীজের অঙ্কুরোদগম ও জীবনী শক্তির যাতে কোন ক্ষতি না হয় সে জন্য নিম্ন বিষয়গুলির প্রতি অবশ্যই নজর দেয়া প্রয়োজন:

ক) নির্ধারিত মাত্রা এবং প্রয়োগকাল সঠিকভাবে মেনে চলা।
খ) আর্দ্রতা বীজের ক্ষেত্রে ১২% এবং খাদ্যশস্যের ক্ষেত্রে ১৪% এর নীচে থাকতে হবে।
গ) বীজের লট অথবা বীজ গুদাম বাষ্প নিরোধক (air tight) থাকতে হবে।

## সুপারিশ মাত্রা

ক) ফসটক্সিন: প্রতি মেট্রিকটন বীজের জন্য ৩টি ট্যাবলেট সর্বনিম্ন ৫-৭ দিন। বাতাস প্রতিরোধক (air tight) শীট দিয়ে ঢেকে রাখতে হবে।
খ) সেলফস/কুইক ফিউম: প্রতি টন বীজের জন্য ৫-৬টি ট্যাবলেট একইভাবে বায়ু প্রতিরোধক শীট দিয়ে ঢেকে রাখতে হবে।
গ) সতর্কতা মূলক ব্যবস্থা: বাতাস প্রতিরোধক শীট দিয়ে ঢেকে রাখার পর নির্দিষ্ট দিনের পূর্বে কোন ক্রমেই শীট উঠানো যাবে না। কারণ এগুলি খুবই বিষাক্ত গ্যাস তাই যে কোন সময় দূর্ঘটনা হতে পারে। এছাড়া ট্যাবলেট ব্যবহারের সময় মুখে মাস্ক ব্যবহার করতে হবে।

# অধ্যায়-১৪
# চরাঞ্চলে কৃষি পণ্য বাজারজাতকরণ

**চরাঞ্চলে কৃষি পণ্য বিপনন**

অত্যন্ত আশার কথা যে চরাঞ্চলে ইতিমধ্যে উৎপাদিত কৃষি পণ্যের বাজারজাতকরন উন্নয়নের একটি যোগসুত্র সৃষ্টি হয়েছে, যা এলাকার কৃষকদের উৎপাদিত শস্যের বিপননের নিশ্চয়তা পাওয়া যাচ্ছে। নোয়াখালী অঞ্চলের সদর উপজেলা, সুবর্ণচর, হাতিয়া, রামগতি কবিরহাট, কোম্পানীগঞ্জ ইত্যাদি এলাকার উৎপাদিত কৃষিজাত পণ্য ঢাকা, চট্রগ্রামসহ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বাজারজাত করণ শুরু হয়েছে।

যে সকল শস্য উৎপাদন পূর্ব সময়ে বিভিন্ন অঞ্চলের আড়তদারদের মাধ্যমে চুক্তি করে উৎপাদতি পণ্য বাজারজাত করা হচ্ছে তার মধ্যে সীমের বিচি, ঢেঁড়শ, শসা, তরমুজ, কলা, সয়াবীন, ঝিঙ্গা, বনতিল (তালমাখনা), চিচিঙ্গা ও অন্যান্য সব্জি। নিম্নে এতদঅঞ্চলের বিভিন্ন কৃষিপন্য বিপননের পদ্ধতি সমূহ উল্লেখ করা হল:

**ঢেঁড়শ**

বৃহত্তর নোয়াখালী অঞ্চলের সুবর্ণচর উপজেলার বিভিন্ন চর ও তৎসংলগ্ন এলাকায় শীতকালীন এবং গ্রীষ্মকালীন মৌসুমে উল্লেখযোগ্য পরিমানে ঢেঁড়শ উৎপাদিত হয়। অত্যন্ত আশার কথা এই যে এ ফসল উৎপাদন মৌসুমের পূর্বেই ঢাকার বিভিন্ন পাইকারী বাজারের আড়তদার বিশেষত: কাওরান বাজার পাইকারী ব্যবসায়ীরা দাদন প্রদানের মাধ্যমে কৃষকদেরকে উৎসাহমূলক উৎপাদন সহায়তা দিয়ে থাকে। উৎপাদন মৌসুমের পূর্বে তাদের উভয়ের মধ্যে চুক্তি অনুযায়ী দাদনের টাকা উৎপাদিত পণ্যে বিক্রয় মুল্যের সাথে সমন্বয় করে অবশিষ্ট টাকা সংশ্লিষ্ট কৃষককে পরিশোধ করে। এতে একদিকে যেমন অসচ্ছল কৃষক সময়মত প্রয়োজনীয় উপকরন প্রয়োগের মাধ্যমে তার ফসল উৎপাদন করতে পারে অন্যদিকে তার উৎপাদিত কাঁচামাল কৃষি পণ্য বিপননের একটি নিশ্চয়তা পায়। সচ্ছল কৃষকগণ নিজ অর্থ ব্যয়ে ঢেঁড়শ উৎপাদন এবং বাজারজাত করনের সুযোগ নেয়। এই সময়ে দেখা যায় তাদের স্থাপিত বাজার হতে কৃষিজাত পণ্য সমূহ বহুল সংখ্যক ট্রাক ও সোনাপুর/মাইজদি হতে ট্রেনেও এই পরিবহন ব্যবস্থা চালু আছে।

**সয়াবীন**

নোয়াখালী, লক্ষ্মীপুর, ফেনী ও চাঁদপুর এর চরাঞ্চলে ব্যাপকভাবে সয়াবীনের চাষ হয়। বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন সয়াবীন বীজ উৎপাদনের বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। বাংলাদেশে মুরগী ও মৎস্য খামার বৃদ্ধি পাওয়াতে মুরগী ও মাছের খাবার হিসেবে সয়াবিনের চাহিদা ব্যাপক হারে বেড়েছে। অন্যদিকে বাংলাদেশের চরাঞ্চলে রয়েছে ৫-৬ লক্ষ হেক্টর অনাবাদি জমি, সেই জমির অন্তত: ৩-৪ লক্ষ হেক্টর জমিতে সয়াবিন আবাদ বৃদ্ধির সুযোগ রয়েছে। দেশের অন্তত: ৩৩টি জেলার ৭২টি উপজেলায় ৩-৪ লক্ষ হেক্টর জমিতে বছরে ১০ লক্ষ মে. টন সয়াবিন উৎপাদন করে আমদানী নির্ভরতা কমানো, পোল্ট্রি ও ফিস ফিড তৈরি, সয়ামিল্ক, সয়ামিট, সয়াবিস্কুটসহ অন্যান্য পুষ্টি সমৃদ্ধ খাবার তৈরি করে বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয়সহ দেশের পুষ্টি সমস্যার সহজ সমাধান, জমির উর্ববরতা বাড়ানো, দারিদ্র দূরীকরণ এবং কর্মসংস্থান বৃদ্ধি করা সম্ভব। এক্ষেত্রে সয়াবিনের আবাদ ও উৎপাদন বৃদ্ধি কল্পে সয়াবিন চাষীদের সহায়ক কারিগরী ও আর্থিক বিনিয়োগে বেসরকারি প্রতিষ্ঠান হিসেবে কাজ করবে।

যে সমস্ত এলাকায় সয়াবিন চাষ সম্প্রসারিত করা যায় তা হলো-

- হাতিয়া উপজেলার চরাঞ্চল
- রামগতি সংলগ্ন বয়ার চরের দক্ষিণাঞ্চল
- চাঁদপুরের হাইমচর
- সোনাগাজীর চর এলাকা

**তরমুজ**

অতি সাম্প্রতিককালে সিডিএসপি বাস্তবায়নাধীন এবং পার্শ্ববর্তী এলাকা সমুহে প্রচুর পরিমান তরমুজ উৎপাদন করা হচ্ছে। বিশেষ করে অগ্রহায়ন- পৌষ মাস হতে চৈত্র-বৈশাখ মাস পর্যন্ত এসকল এলাকায় বিশেষ কোন ফসল ছিল না বলে লাগসই প্রযুক্তি প্রয়োগের ফলে তরমুজ চাষের প্রচুর সম্ভাবনাকে কাজে লাগিয়ে এলাকার কৃষকগন এই ফসল চাষে এগিয়ে আসে।

যেহেতু তরমুজ চাষে উৎপাদন খরচ তুলনামূলক ভাবে বেশী এই সুযোগে ঢাকার পাইকারী আড়তদার/দাদন ব্যবসায়ীরা কৃষকদেরকে সহায়তা করতে এগিয়ে আসে। ঢেঁড়শ চাষের মত উৎপাদন মৌসুমের পূর্বে অর্থ সহায়তা করে বাজারজাতকরনের সময় তার লগ্নিকৃত অর্থ সমন্বয় করে। এতে কৃষকদের জন্য অত্র এলাকায় তরমুজ একটি অর্থকরী ফসল হিসেবে কৃষকদের আয় বৃদ্ধির নিশ্চয়তা সৃষ্টি হয়েছে অন্যদিকে পাইকারদের উৎপাদিত পণ্য প্রাপ্তির নিশ্চয়তা বিধান হয়েছে।

### কলা

সাম্প্রতিক একটি সমীক্ষায় দেখা গেছে চরাঞ্চলের প্রত্যেক কৃষকের সবচেয়ে বেশি সংখ্যক কলা গাছ আছে যার দ্বারা তার সংসারের চাকা দারিদ্রতার মধ্যেও চালু রেখেছে। যদিও আধুনিক চাষ পদ্ধতি এই কলাচাষে সম্পূর্ণ অনুপস্থিত তবু যত্রযত্র কলাগাছ (বাংলা কলা) লক্ষ্য করা যায়। যার উৎপাদন খরচ নেই বললেই চলে। এই এলাকা সমূহে বিপুল পরিমান কলা উৎপাদন হয় যদিও সামান্য পরিচর্যার মাধ্যমে এর উৎপাদন প্রায় দ্বিগুন করা সম্ভব। তবু উৎপাদিত এই বিপুল পরিমান কলা স্থানীয় চাহিদা মিটিয়ে প্রতি দিন বিভিন্ন পরিবহন মাধ্যমে চট্টগ্রাম, কুমিল্লা, ঢাকা সহ বিভিন্ন স্থানে এই কলার বাজারজাতকরন সম্প্রসারণ হচ্ছে।

### অন্যান্য সবজি

বিগত ১৫ বছর পূর্বেও লক্ষ্য করা গেছে নোয়াখালীর চরাঞ্চলে প্রতিদিনের চাহিদাকৃত সব্জি কুমিল্লা ও চট্টগ্রামের বিভিন্ন এলাকা হতে এলাকার চাহিদা পুরন করা হতো। কিন্তু ইদানিং কালে সিডিএসপি এবং কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগের উদ্যোগের ফলে এলাকায় বিভিন্ন জাতের সব্জি উৎপাদন আশাব্যঞ্জক হারে বেড়ে গেছে। ফলে শসা, ঝিঙ্গা, চিচিঙ্গা সহ অন্যান্য জাতের সব্জি দেশের অন্যান্য অঞ্চলে বাজারজাত করার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

### বনতিল / তালমাখনা

বনতিল বা তালমাখনা এমন একটি ফসল যা অন্য এলাকায় সচরাচর দেখা যায় না। এই ফসলটি চর নাঙ্গুলিয়া এলাকায় যা হাতিয়া ও সুবর্ণচরের উপজেলার অংশে এই বনতিল চাষ করা হয়। এই চরনাঙ্গুলিয়া বিগত ১২-১৫ বছরের মধ্যে বসতি স্থাপন শুরু হয়। যখন এই এলাকায় বসতি শুরু হয় এর পূর্বে বন/জঙ্গল পরিষ্কার করার সময় এই বনতিল তীব্র লবণাক্ততা সহিষ্ণু ফসল হিসাবে কৃষকদের নিকট প্রমানিত হয়। পরবর্তীতে অন্যান্য এলাকার স্থানীয় জাতের আমন ধান যেমন রাজাশাইল, কাজলশাইল ইত্যাদি চাষ হলেও নীচু এলাকা সমুহে যেখানে প্রায়ই জোয়ারের লবণাক্ত পানি এবং প্রলম্বিত জলাবদ্ধতা বিদ্যমান সে সমস্ত এলাকায় সারা বছরের একমাত্র ফসল বনতিল চাষ করা হয়ে থাকে। চর নাঙ্গুলিয়ার কালাদুর, সেলিম বাজার, দুইশোদাগ, চল্লিশদাগ, বেকেরবাজার তোবাকাটি, তারামার্কেট, নবির পুকুর ইত্যাদি স্থানে এই বনতিল সীমিত আকারে সনাতন পদ্ধতিতে চাষ করা হয়ে থাকে। এক সমীক্ষায় প্রায় ১০০০ একর জমিতে এর চাষ করা হয়ে থাকে বলে তথ্য পাওয়া যায়। এই বনতিল কবিরাজী বা আয়ুর্বেদীয় ঔষধে ব্যবহৃত হয়। তাই এই ফসল বাজারজাত করনের একটি উৎস পাওয়া যায়। এর একর প্রতি অত্যন্ত কম হলেও প্রতি কেজি বনতিল ২৫০-৩০০ টাকায় পাইকারদের কাছে বিক্রি হয় বলে কৃষকদের নিকট তথ্য পাওয়া যায়। যদিও এই বাজার দর বছর ভেদে কম/বেশী হয়ে থাকে। জানা যায় এই বনতিল বিদেশে বিশেষত কোরিয়া, চীন দেশ সমূহে চাহিদা আছে।

**সীমের বীচিঃ** চরাঞ্চলে প্রচুর সীম উৎপন্ন হয়ে থাকে। এই সীম এবং সীমের বীচির একটি সম্ভাবনাময় বাজার সৃষ্টি হয়েছে। দেশের বিভিন্ন এলাকায় এই সীম ও সীমের বীচির চাহিদা রয়েছে। বিশেষ করে সীমের বীচির শিল্পের কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে।

### অন্যান্য বিপনন ব্যবস্থা

বলা হয় চাহিদার ভিত্তিতে বিপনন ব্যবস্থা আপন গতি লাভ করে এবং বাজারজাত করনের সুযোগ সৃষ্টি হয়। তারপরও সিডিএসপি কর্তৃক মনোনীত বেসরকারী সংস্থা সমূহ (এনজিও) কৃষিজাত পন্যের বাজারজাত করনের সুযোগ সৃষ্টিতে কাজ করে যাচ্ছে। আশা করা যায় এই প্রকল্পের মাধ্যমে কৃষকদেরকে তাদের উৎপাদিত ফসল বিপননের সহায়তা আগামীতে আরো নতুন নতুন পন্থা উদ্ভাবনের সুযোগ সৃষ্টি হবে।

# অধ্যায়-১৫
# কৃষি যন্ত্রপাতি

**ব্রি গুটি ইউরিয়া প্রয়োগ যন্ত্র**

বাংলাদেশ ধান গবেষনা ইন্সটিটিউট কৃর্তক উদ্ভাবিত একটি গুটি ইউরিয়া প্রয়োগ করার যন্ত্র। এই যন্ত্রের সাহায্যে এক ঘন্টায় এক বিঘা জমিতে একজন শ্রমিক দ্বারা প্রয়োগ করা সম্ভব যেখানে প্রচলিত পদ্ধতিতে একজন শ্রমিক সারাদিনে সর্বাধিক ৩০ শতাংশ জমিতে গুটি ইউরিয়া প্রয়োগ করতে পারে। গুটি ইউরিয়া এক সারি পর পর নির্দিষ্ট দূরত্বে প্রয়োগ করতে হয় বিধায় সারি থেকে সারির দূরত্ব ১৮ সে.মি./২০ সে.মি./২২ সে.মি. (চারা থেকে চারার দূরত্ব ২০ সে.মি. হলে এই যন্ত্রটি চালানো যাবে)। খেয়াল রাখতে হবে জমির মাটি যেন শক্ত হয়ে না যায়। গুটি ইউরিয়া প্রয়োগের সময় ছিপছিপে (০.৫ সে.মি. অর্থাৎ ১/২ ইঞ্চি) পানি থাকতে হবে। যন্ত্রটি চালানোর সময় গুটি প্রয়োগ করা সারিতে রাখা যাবেনা। ৪০০০.০০-৫০০০.০০ টাকা মূল্যে যন্ত্রটি পাওয়া যেতে পারে।

**ব্রি স্বচালিত ধান-গম কাটার যন্ত্র (Harvestor)**

ব্রি উদ্ভাবিত একটি ধান-গম কাটার যন্ত্র। আকার ছোট ফলে সহজেই চালানো যায়। যন্ত্রটি দিয়ে এক হেক্টর (৩০ গন্ডা) জমির ধান কাটতে ৪-৫ ঘন্টা সময় লাগে। জ্বালানী খরচ ০.৫-০.৭ লিটার (প্রতি ঘন্টায়)।

**ব্রি পাওয়ার টিলার চালিত ধান-গম কাটার যন্ত্র (Power tiller harvester)**

এই যন্ত্রটি পাওয়ার টিলারের সাথে সংযোগ করে প্রতি ঘন্টায় ১.৫ বিঘা জমির ধান বা গম কাটা যায়। শুকনো জমিতে খাড়া অবস্থায় থাকা ধান বা গম কাটা সম্ভব। দেখা যায় হেক্টর প্রতি ১২০০.০০ টাকা সনাতন পদ্ধতির চেয়ে সাশ্রয় হয়।

**ব্রি ওপেন ড্রাম পাওয়ার থ্রেসার (Open drum power thresher)**

এই ধান মাড়াইয়ের যন্ত্র হাতে মাড়াইয়ের ফলে খড় অক্ষত থাকে। এর মাধ্যমে তিন জন শ্রমিক পরুষ/মহিলা একসাথে ধান মাড়াই করতে পারে। এই যন্ত্র ব্যবহারে প্রতি হেক্টরে (৩০ গন্ডা) ৯০০.০০ টাকা সাশ্রয় হয়।

**ব্রি ধান ও গম পাওয়ার থ্রেসার (Power thresher)**

এটি ধান ও গম মাড়াই যন্ত্র। এ যন্ত্রের দুটি মডেল আছে যেমন টিএইচ-৭ এবং টিএইচ-৮। টিএইচ-৭ যন্ত্র দিয়ে ঘন্টায় ১৮ মন ধান এবং ১০ মন গম মাড়াই করা যায়। আপরদিকে টিএইচ-৮ দিয়ে ২৫ মন ধান এবং ১৫ মন গম মাড়াই করা যায়। এই যন্ত্রের আরো একটি বাড়তি সুবিধা হলো শ্যালো টিউবওয়েল অথবা পাওয়ার টিলার যন্ত্রের ইঞ্জিন/বৈদ্যুতিক মটর দিয়ে চালানো যায় এবং মাড়াই ও ঝাড়াই একসাথে সম্পন্ন করা যায়।

**ব্রি পাওয়ার উইনোয়ার (BRRI power winnowar)**

এটি শস্য মাড়াই যন্ত্র। যন্ত্রটি চালাতে দুজন শ্রমিকের প্রয়োজন হয়। এটি ০.৫ অশ্ব ক্ষমতা সম্পন্ন মটর দিয়ে চালানো হয়। কুলায় ঝাড়ার পদ্ধতির পরিবর্তে প্রায় ১০ গুন বেশী ধান ঝাড়াই করা যায়।

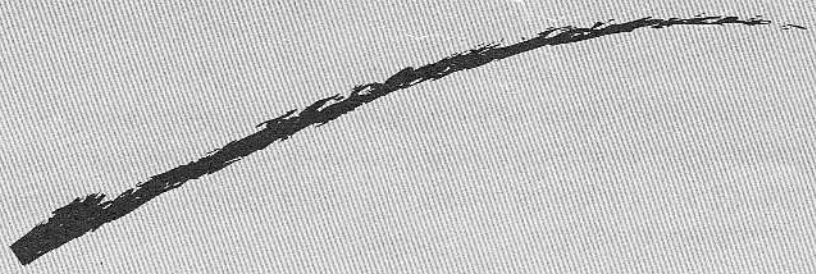

**ওজন**

১ মেট্রিক টন = ১,০০০ কেজি = ২৬ মন ৩১ সের ১ ছটাক = ২২০৫ পাউন্ড
১ কুইন্টাল = ১০০ কেজি = ২.৬৮ মণ
১ বুশেল = ০.৭৩ মন = ২৯.১৭ সের
১ মণ = ৪০ সের = ৩৭.৩২৪১৭২ কেজি = ০.৩৭৩২৪২ মেট্রিক টন
১ সের = ০.৯৩৩১০৪ কেজি
১ কেজি = ১০০০ গ্রাম = ১.০৭১৬৩৬ সের = ২.২০৪৬২৩ পাউন্ড
১ ছটাক = ৫ তোলা = ৫৮.৩১৯ গ্রাম
১ তোলা = ১১.৬৬ গ্রাম (প্রায়)
১ বেল তুলা = ৩৯২ পাউন্ড = ১৭৭৮১ কেজি
১ বেল পাট = ৪০০ পাউন্ড = ১৮১.৪৭ কেজি = ৫ মণ
১ আউন্স = ২.৪৩ তোলা = ২৮.৩৫ গ্রাম

**আয়তক্ষেত্র**

১ হেক্টর = ২.৪৭ একর = ০.০০৩৮৬১ বর্গমাইল = ১০,০০০ বর্গমিটার
১ একর = ৩.০২৫ বিঘা = ০.৪০৫ হেক্টর = ৪৮৪০ বর্গগজ = ৪৩৬৫০ বর্গফুট = ৪০৪৭ বর্গমাইল
১ বর্গমাইল = ৬৪০ একর = ২৫৯ হেক্টর ১ বর্গ কিমি. = ১০০০ হেক্টর = ০.৩৮৬ বর্গমাইল
১ কাঠা = ৬৬.৬৭ বর্গমিটার (প্রায়) = ১.৬৫ শতক = ৮০ বর্গগজ
১ বিঘা = ০.৩৩০৬ শতক = ০.১৩৭৮ হেক্টর
১ বর্গগজ = ০.৮৩৬ বর্গমিটার = ৮৩৬১ বর্গসেন্টিমিটার
১ বর্গফুট = ০.০৯৩ বর্গমিটার = ৯২৯ বর্গসেন্টিমিটার
১ বর্গইঞ্চি = ৬.৪৫ বর্গসেন্টিমিটার

**ঘনত্বের মাপ**

১ ঘনফুট = ৭.৪ গ্যালন (USA) = ৬.২৩ গ্যালন (UK) = ০.০২৮৩ ঘনমিটার
১ ঘনমিটার = ৩৫.৩১৫ ঘনফুট = ১০০০ লিটার

**তরল পদার্থের মাপ**

১ গ্যালন (UK) = ১.২০ গ্যালন (USA) = ৮.৫৪২৫ লিটার
১ লিটার = ১০০০.০২৮ কিউবিক সে. মি. = ০.০৩৫ ঘনফুট = ০.২২০ গ্যালন (ব্রিটিশ)
১ ব্যারেল (পেট্রোলজাত) = ০.১৫৯ কিউ মি. = ৩৪.৯৭ গ্যালন (ব্রিটিশ) = ৮২ গ্যালন (USA)

**তাপ**

ফা. (ফারেনহাইট); সে. সেন্টিগ্রেড/সেলসিয়াস)

ফা. = সে. x ১.৮) + ৩২

$$\text{সে.} = \frac{\text{ফা.} - ৩২}{১.৮}$$

## সহায়ক গ্রন্থাবলী


১) আধুনিক ধানের চাষ, ২০১১ বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট, গাজীপুর।

২) কৃষি উৎপাদন হাতবই, ২০০৫, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

৩) উপকূলীয় চরাঞ্চলের কৃষি প্রযুক্তি সহায়িকা: কৃষি সম্প্রসারন অধিদপ্তর এবং সিডিএসপি-৩- জুন ২০০৯

৪) Key note paper- Crop production under unfavorable ecosystem BAS-2011 by Rafiqul Islam Mondal, D.G.- BARI

৫) বীজ উৎপাদন সংরক্ষণ ও বিপনন প্রযুক্তি: ড. মীর মোশাররফ হোসেন, দ্বিতীয় পরিবর্ধিত সংস্করন-০০৫।

৬) কৃষি প্রযুক্তি হাতবই খন্ড-১। বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট।

৭) কৃষি প্রযুক্তি হাতবই খন্ড-২। বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট।

৮) প্রাথমিক বীজ প্রযুক্তি: ড. মো: নাজমুল হুদা, বীজ শিল্প উন্নয়ন সংস্থা/ডানিডা।

৯) কৃষি ডাইরি, ২০১১ ও ২০১২: কৃষি তথ্য সার্ভিস, ঢাকা।

১০) ডকুমেন্টস অব বাংলাদেশ সয়াবিন ফাউন্ডেশন

১১) Training Manual & Module published by CBACC-CF Project, Forest Component, UNDP, December, 2011

১২) জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক তথ্য সহায়িকা, আই ইউ সি এন ২০০৯।

13) Moving Cost Line Edited by Koen de Wielde, Chief Technical Adviser, CDSP-III, Noakhali.

১৪) ধান চাষীর বন্ধু উপকারী পোকা, মাকড়সা এবং রোগজীবানু ১৯৯১, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনষ্টিটিউট।

১৫) দৈনিক প্রথম আলো: ১লা অক্টোবর ২০১১।

১৬) আমাদের প্রিয় ফল, প্রকাশনায়: কৃষি তথ্য সার্ভিস, ঢাকা।


## মেট্রিক পদ্ধতির ওজন ও মাপের সাথে প্রচলিত পদ্ধতির সম্পর্ক

### দৈর্ঘ্য

১ ইঞ্চি = ২৫.৪ মিলিমিটার = ২.৫৪ সেন্টিমিটার = ০.০২৫৪ মিটার
১ ফুট = ৩০৪.৮ মিলিমিটার = ৩০.৪৮ সেন্টিমিটার = ০.৩০৪৮ মিটার = ১২ ইঞ্চি
১ গজ = ৯১৮.৮ মিলিমিটার = ৯১.৪৪ সেন্টিমিটার = ০.৯১৪৪ মিটার = ৩ ফুট
১ মাইল = ১৬০৯.৩৪৪ মি. = ১.৬০৯ কিলোমিটার = ১৭৬০ গজ
১ নটিক্যাল মাইল (ব্রিটিশ) = ১৮৫৩.১৮ মিটার
১ সেন্টিমিটার = ১০ মিলিমিটার = ০.৩৯৩৭ ইঞ্চি (প্রায়)
১ মিটার = ১০০ সেন্টিমিটার = ১.০৯ গজ = ৩.২৮১ ফুট = ৩৯.৩৭ ইঞ্চি
১ কিলোমিটার = ১০০০ মিটার = ০.৬২১৪ মাইল

## বিবিধ

১ অশ্বশক্তি = ৫৫০ ফুট পাউন্ড/সেকেন্ড = ৭৪৫.৭০ ওয়াট (Watt)

১ একর ইঞ্চি পানি = $^{৩}/_{৪}$ কিউসেক পাম্পের ১ ঘন্টা ১৫ মিনিটের সরবরাহ

= ১ কিউসেক পাম্পের ১ ঘন্টার সরবরাহ

= ২ কিউসেক পাম্পের $^{১}/_{২}$ ঘন্টার সরবরাহ

১ ফ্যাদম = ৬ ফুট = ১.৮৩ মিটার

১ ডিগ্রি অক্ষাংশ = ৬৯ মাইল = ১১১.০৪ কিলোমিটার

১ চেইন = ৬৬ ফুট; ৮০ চেইন = ১ মাইল = ১.৬ কিলোমিটার

১ বেল পাট = ০.১৮৬৬২০৫ মেট্রিক টন = ৫ মণ = ৪১১.৪৫ পাউন্ড।

বর্গমাইল x ২.৫৮৯ = বর্গ কিলোমিটার

বর্গমাইল x ২৫৮.৯৯৯ = হেক্টর

বর্গ কি. মি. x ০.৩৮৬১ = বর্গমাইল

বর্গ কি. মি. x ২৪৭.১০৫ = একর

একর x ৪০৪৬.৮৫৬ = বর্গমিটার

একর x ০.৪০৪৬ = হেক্টর

মাইল/ঘন্টা x ১.৬০৯৩৪৪ = কিলোমিটার/ঘন্টা

হর্সপাওয়ার x ০.৭৪৫৭ = কিলোওয়াট

কিলোওয়াট x ১.৩৪১ = হর্সপাওয়ার

$^{১}/_{৪}$ কিউসেক = ৭ লিটার/সেকেন্ড

$^{১}/_{২}$ কিউসেক = ১৪ লিটার/সেকেন্ড

১ কিউসেক = ২৮ লিটার/সেকেন্ড

২ কিউসেক = ৫৬ লিটার/সেকেন্ড

## ইংরেজি ও বাংলা মাসের হিসাব

| | | |
|---|---|---|
| জানুয়ারী | = | ১৫ পৌষ থেকে ১৪ মাঘ |
| ফেব্রুয়ারী | = | ১৫ মাঘ থেকে ১৪ ফাল্গুন |
| মার্চ | = | ১৫ ফাল্গুন থেকে ১৪ চৈত্র |
| এপ্রিল | = | ১৫ চৈত্র থেকে ১৪ বৈশাখ |
| মে | = | ১৫ বৈশাখ থেকে ১৪ জৈষ্ঠ্য |
| জুন | = | ১৫ জৈষ্ঠ্য থেকে ১৪ আষাঢ় |
| জুলাই | = | ১৫ আষাঢ় থেকে ১৪ শ্রাবন |
| আগষ্ট | = | ১৫ শ্রাবন থেকে ১৪ ভাদ্র |
| সেপ্টেম্বর | = | ১৫ ভাদ্র থেকে ১৪ আশ্বিণ |
| অক্টোবর | = | ১৫ আশ্বিণ থেকে ১৪ কার্তিক |
| নভেম্বর | = | ১৫ কার্তিক থেকে ১৪ অগ্রহায়ণ |
| ডিসেম্বর | = | ১৫ অগ্রহায়ণ থেকে ১৪ পৌষ |